প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই পাঠক্রমটি মেয়েদের সচেতনতা বাড়ানোর কথা ভেবে তৈরি করা হয়েছে। যাতে মেয়েরা তাঁদের নিজেদের স্বকীয়তা প্রমাণ করে সমাজে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন ও যে কো কর্মসংস্থান বা স্বনিযুক্তির জন্য নিজেকে উপযোগী করে তুলতে পারেন তাই এই পাঠক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপিকা (ড.) মণিমালা দাস
উপাচার্য

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, 2011

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় ঃ মানবীবিদ্যা চর্চা

পাঠক্রম ঃ আমরা পারি
গার্হস্থ্য রসায়ন

রচনা

একক 1 শ্রী সত্যব্রত চৌধুরি
একক 2 ও 3 শ্রী সঞ্জীব কুমার দাস
একক 4 ও 5 ড. পার্থ সারথি ঘোষ
একক 6 ও 7 ড. মুকুল চন্দ্র দাস

সম্পাদনা

শ্রীমতী শর্বাণী গোস্বামী

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ

রচনা

ড. বিধান রঞ্জন রায়
শ্রী শুভজিৎ রায়।
শ্রী শুভজিৎ রায়, ড. অঞ্জু পাল,
ড. উমা ঘোষ এবং ড. বিধান রঞ্জন রায়

সম্পাদনা

ড. পুষ্পা মিশ্র

টেলারিং

বৃত্তিমূলক পাঠক্রম থেকে সংকলিত

ঘোষণা

এই পাঠ সকল হতে সংকলেনর সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) বিকাশ ঘোষ
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

মানবীবিদ্যা—আমরা পারি

গার্হস্থ্য রসায়ন [চতুর্থ পত্র - ক]

একক 1	জ্বালানি	**7 - 14**
একক 2	জলদূষণ	**15 - 22**
একক 3	বায়ুদূষণ	**23 - 34**
একক 4	প্রসাধন সামগ্রী এবং রঞ্জক পদার্থ	**35 - 47**
একক 5	সাবান, পরিষ্কারক ও জল	**48 - 60**
একক 6	ওষুধ ও জীবাণুনাশকের রসায়ন	**61 - 66**
একক 7	চর্বি তেল	**67 - 70**

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ [চতুর্থ পত্র - খ]

একক 1	খাদ্য রসায়ন	**72 - 81**
একক 2	পুষ্টিবিজ্ঞান	**82 - 94**
একক 3	খাদ্যের বিষ-বিষয়ক বিজ্ঞান (টক্সিকোলজী)	**95 -101**
একক 4	খাদ্যের মান ও প্রবিধান (রেগুলেশন)	**102 - 112**
একক 5	খাদ্যে জীবাণুঘটিত বিষক্রিয়া (ফুট মাইক্রোবায়লজী)	**113 - 119**
একক 6	বীজাণুঘটিত পচন (পিউট্রিফেকশন) ও ফার্মেন্টেশন	**120 -132**
একক 7	খাদ্য প্রযুক্তি	**133 - 172**
টেলারিং [চতুর্থ পত্র - গ]		**173 - 212**

চতুর্থ পত্র - ক

গার্হস্থ্য রসায়ন

একক 1 ❑ জ্বালানী (Fuels)

গঠন

1.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

1.1 জ্বালানীর শ্রেণীবিভাগ

1.2 তাপন মূল্য

1.3 কঠিন জ্বালানী

1.3.1 কয়লা -- উৎপত্তি ও রাসায়নিক প্রকৃতি

1.3.2 কয়লার শ্রেণীবিভাগ

1.3.3 চুর্ণীকৃত কয়লা

1.4 তরল জ্বালানী

1.4.1 পেট্রোলিয়াম

1.4.2 কঠিন জ্বালানী অপেক্ষা তরল জ্বালানী ব্যবহারের সুবিধা

1.5 গ্যাসীয় জ্বালানী

1.5.1 প্রোডিউসার গ্যাস

1.5.2 ওয়াটার গ্যাস

1.6 শক্তির বিকল্প উৎস

1.6.1 জৈব গ্যাস

1.6.2 এল্. পি.জি. বা তরলীকৃত খনিজ তেল

1.6.3 গোবর গ্যাস

1.6.4 বায়শক্তি

1.6.5 সৌরশক্তি

1.6.5.1 সৌরজল উত্তাপক

1.6.5.2 সৌর পাচক

1.7 সারাংশ

1.0 প্রস্তাবনা

সভ্যতার প্রথম সোপান হল মানুষের আগুন জ্বালাতে শেখা। প্রস্তর যুগের (Stone age) মানুষ কিভাবে প্রথম আগুন জ্বলতে শিখল তা অবশ্য বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে জানা যায় না। আদিম যুগের মানুষ তিন ভাবে আগুনকে ব্যবহার করত; জল গরম করা, মাংস ঝলসান ও বন্য জীবজন্তুকে ভয় দেখান।

এই আগুন মানুষকে প্রথমে দেয় অন্ধকারে আলো। সেই আলোই হয়ে ওঠে জ্ঞানের আলো। এই আগুন হল শক্তির প্রতীক এবং এর উৎস হল জ্বালানী। যে সমস্ত পদার্থ বাতাসের অক্সিজেনের সম্পূর্ণ দহনের ফলে প্রচুর তাপ ও আলো দেয়, যা গৃহস্থালী ও শিল্প উভয়ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় তাদেরকে জ্বালানী বলে। সাধারণতঃ এই সমস্ত পদার্থে কার্বন প্রধান উপাদান হিসাবে থাকে। যেমন– কাঠ, কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন, কোল গ্যাস, গোবর গ্যাস ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি জ্বালানীর উদাহরণ= নিউক্লিয় শক্তিও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করে জ্বালানী সম্বন্ধে আপনার স্বচ্ছ ধারণা জন্মাবে। আপনি জানতে পারেন–

- জ্বালানী তিন প্রকার যেমন– কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়
- তাপন মূল্যের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাপন মূল্যের একক
- কঠিন জ্বালানী কয়লার শ্রেণীবিভাগ ও অঙ্গারীকরণ প্রক্রিয়া
- তরল জ্বালানী প্রাকৃতিক পেট্রোলিয়াম কিভাবে শোধন করা হয় এভং বিভিন্ন তাপমাত্রায় প্রাপ্ত পাতিত অংশের ব্যবহার
- প্রডিউসার গ্যাস হল কার্বন মনোক্সাইড (CO) ও নাইট্রোজেনের (N_2) মিশ্রণ এবং ওয়াটার গ্যাস হল কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেনের (H_2) মিশ্রণ। কঠিন জ্বালানী উত্তপ্ত কোকের সঙ্গে বায়ুর বিক্রিয়ায় প্রডিউসার গ্যাস এবং উত্তপ্ত কোকের সঙ্গে জলীয় বাষ্পের বিক্রিয়ায় ওয়াটার গ্যাস প্রস্তুত করা হয়।
- তরল জ্বালানী ব্যবহারের সুবিধা
- অচিরাচরিত শক্তির উৎস যেমন– সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, গোবর গ্যাস ইত্যাদি
- সৌরশক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ যেমন– সৌর জল উত্তাপক ও সৌরপাচক

1.1 জ্বালানীর শ্রেণীবিভাগ

জ্বালানী প্রধানত ঃ দুইভাগে বিভক্ত। প্রাইমারী বা প্রাকৃতিক জ্বালানী ও সেকেন্ডারী বা কৃত্রিম জ্বালানী। যে সমস্ত জ্বালানী প্রকৃতিতে সরাসরি পাওয়া যায় তাদের প্রাকৃতিক ও যে সমস্ত জ্বালানী প্রাকৃতিক জ্বালানী থেকে প্রস্তুত করে নেওয়া হয় তাদের কৃত্রিম জ্বালানী বলে। ভৌত অবস্থা অনুসারে এদের প্রত্যেককে আবার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যেমন– কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। নিম্নে উদাহরণ সহকারে জ্বালানীর শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হল।

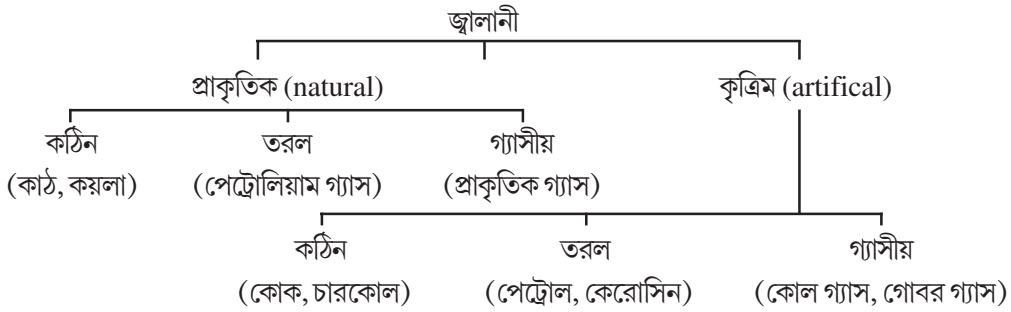

1.2 তাপন মূল্য

জ্বালানীর উৎকর্ষতাকে তাপন মূল্য দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

কঠিন ও তরল জ্বালানীর ক্ষেত্রে একক ভর এবং গ্যাসীয় জ্বালানীর ক্ষেত্রে একক আয়তন কোন জ্বালানীর বাতাসের অক্সিজেনে সম্পূর্ণ দহনের ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাকে ওই জ্বালানীর তাপন মূল্য বলে।

1.3 কঠিন জ্বালানী

প্রাকৃতিক কঠিন জ্বালানী বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন– কাঠ, কয়লা ইত্যাদি। এছাড়া শুকনো পাতা, আখের ছিবড়েও (চিনির কারখানা থেকে পাওয়া যায়) জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে কয়লা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব।

1.3.1 কয়লা— উৎপত্তি ও রাসায়নিক প্রকৃতি ঃ

উৎপত্তি ঃ কোটি কোটি বছর পূর্বে ফার্ণ, বড় গাছ, গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ জন্মাত ও মৃত্যুর পর জলাভূমির তলদেশে বিভিন্ন স্তরে জমে থাকত, বাতাস বা অক্সিজেন নির্ভরশীল ব্যাকটেরিয়া দ্বারা গাছের পচনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন এবং অন্যান্য গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন যৌগে পরিবর্তিত হয়, যতক্ষণ বাতাসের সংস্পর্শে গাছপালা থাকে। তার ওপর মাটি, বালি ঢাকা পড়ার পর বাতাসের সংযোগ না থাকায় ব্যাকটেরিয়ার কাজ বন্ধ হত। এভাবে বহু বছর থাকার ফলে আংশিক বিযোজিত কাঠ, যা সিক্ত, খুব শক্ত নয়, এমন পদার্থে পরিবর্তিত হল–যাকে পিট (Peat) বলে। একটি স্তরের উপর আরেকটি গাছের স্তর, মাটির স্তর ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে থাকার ফলে আরো অনেক বছর পরে পিট আরো শক্ত, কালো পদার্থে পরিণত হয়, যাকে কয়লা বলে।

কয়লা কঠিন জ্বালানীর অন্যতম। বিশ্বব্যাপী বর্তমানে প্রতি বছর 4×10^9 টন কয়লা খরচ হয়। তার মধ্যে শুধু ইউ.এস.এ. খরচ করে বছরে 7×10^8 টন।

রাসায়নিক প্রকৃতি ঃ কয়লা অনিয়তকার মৌল কার্বন, বিভিন্ন পরিমাণ হাইড্রোকার্বন, জটিল জৈব যৌগ এবং অজৈব যৌগ সমন্বিত প্রাকৃতিক দাহ্য পদার্থ।

1.3.2 কয়লার শ্রেণীবিভাগ ঃ

রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও তাপন মূল্যের (calorific value) ওপর ভিত্তি করে কয়লার মান নির্ধারণ করে বিভিন্ন ধাপকে চিহ্নিত করা হয়। নিম্নমান থেকে উচ্চমানের শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ ঃ

(i) পিট কয়লা

(ii) লিগনাইট কয়লা

(iii) বিটুমিনাস কয়লা

(iv) অ্যানথ্রাসাইট কয়লা

এটি গৃহস্থালীর জ্বালানী এবং শিল্পক্ষেত্রে বয়লারে স্টীম উৎপাদনে ও প্রোডিউসার গ্যাসের শিল্পোৎপাদনে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অ্যানথ্রাসাইট কয়লা ঃ এটি সমস্ত প্রকার কয়লার মধ্যে কঠিনতম।

1.3.3 চুর্ণীকৃত কয়লা ঃ

অক্সিজেনের সঙ্গে সার্বিক সংস্পর্শের অভাবে কয়লা তথা যে কোন কঠিন জ্বালানীর দহনের গতি কম হয়। দহনের গতি বাড়ানোর জন্য কয়লাকে সূক্ষ্ম গুঁড়োয় পরিণত করা হয়, সূক্ষ্ম গুঁড়োয় পরিণত করলে কয়লার মুক্ত তলের পরিমাণ বেড়ে যায়, কয়লার গুঁড়ো সহজেই বাতাসের সংস্পর্শে আসে, কয়লাতে উপস্থিত উদ্বায়ী পদার্থগুলি দ্রুত নির্গত হয় এবং স্থিরীকৃত (fixed) কার্বনের দহন দ্রুত হয়। এই সূক্ষ্ম গুঁড়োয় পরিণত কয়লাকে চুর্ণীকৃত (Pulverised) কয়লা বলে।

কয়লা চুর্ণীকরণেরসুবিধাগুলি হল ঃ

(a) একে সহজেই স্ক্রু কনভেয়র বা বাতাসের প্রবাহের সাহায্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা যায়।

(b) কয়লা গুঁড়োর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে দহনের গতি নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

(c) চুর্ণীকৃত কয়লার দহন প্রয়োজন অনুযায়ী শুরু বা বন্ধ করা যায়।

(d) উচ্চ ছাইযুক্ত নিম্নমানের কয়লাও সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করা যায়।

(e) উচ্চ উষ্ণতার সৃষ্টি হয়।

1.4 তরল জ্বালানী

বিভিন্ন ধরনের তরল জ্বালানী ব্যবহৃত হয়। যেমন, অ্যালকোহল (power alcohol) পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি। এখানে আমরা পেট্রোলিয়াম সম্বন্ধে আলোচনা করব।

1.4.1 পেট্রোলিয়াম ঃ

পেট্রোলিয়াম হল অশুদ্ধ খনিজ তেল। প্রাণীজ তেল ও চর্বি দীর্ঘদিন মাটির তলায় চাপা পড়ে থেকে উচ্চ চাপ ও

তাপের প্রভাবে নানারূপ রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এর সৃষ্টি হয়। এটি গাঢ় সবুজাভ বাদামী বর্ণের উচ্চ সান্দ্রতা বিশিষ্ট (viscous) তরল। এতে বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন (কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ) এবং কিছু পরিমাণে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার যুক্ত জৈব যৌগ, যেমন পেট্রোল, কোরাসিন, ডিজেল ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদান বর্তমান। এতে খুব সামান্য পরিমাণে ভ্যানাডিয়াম (V), ক্যালসিয়াম (Ca) নিকেল (Ni), আয়রণ (Fe) ইত্যাদি ধাতুর জৈব ধাতুর যৌগও (Organometalic) বর্তমান থাকে।

1.4.2 কঠিন জ্বালানী অপেক্ষা তরল জ্বালানী ব্যবহারের সুবিধা ঃ

(i) তরল জ্বালানীর তাপন মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী।

(ii) তরল জ্বালানীর দহনের সময় কোন ছাই গঠন করে না।

(iii) এর প্রজ্বলন ও নির্বাপণ অনেক সহজ এবং দহন অনেক দ্রুত গতি সম্পন্ন।

(iv) জ্বালানীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে প্রজ্বলিত শিখাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(v) পাইপের মাধ্যমে এর পরিবহন অনেক সহজ।

(vi) এটি ব্যবহারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সহজ।

(vii) তরল জ্বালানীর দহনের জন্য অনেক কম পরিমাণ বাতাস প্রয়োজন।

(viii) এটি ব্যবহারে শ্রমিক খরচ অনেক কম হয়।

1.5 গ্যাসীয় জ্বালানী

কয়লার অন্তর্ধূম পাতনের সাহায্যে কোল গ্যাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোল গ্যাস শিল্পে, পরীক্ষাগারে এবং গৃহস্থালীতে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আলোক উৎপাদকরূপেও এই গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

1.5.1 প্রডিউসার গ্যাস

শ্বেত-তপ্ত কোকের মধ্যে 1000^0C উষ্ণতায় পরিমিত পরিমাণে বাতাস চালনা করা হলে তাপ উৎপাদক বিক্রিয়ায় প্রোডিউসার গ্যাস উৎপন্ন হয়।

1.5.2 ওয়াটার গ্যাস

শ্বেত-তপ্ত (1000^0C) কোকের মধ্যে দিয়ে স্টীম পাঠালে, তাপশোষক বিক্রিয়ায়, হাইড্রোজেন ও কার্বন মনোক্সাইডের মিশ্রণ উৎপন্ন হয় যাকে ওয়াটার গ্যাস বলে।

1.6 শক্তির বিকল্প উৎস

(i) জৈব দাহ্য পদার্থ (Biomass) : কাঠ, আখের ছিবড়ে এই ধরণের জৈব দাহ্য পদার্থ সেই পুরাকাল থেকে গার্হস্থ্য জালানী হিসাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। কিছু কিছু শিল্প প্রক্রিয়ায় কাঠ এবং কাঠের বর্জ্য পদার্থ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই জ্বালানীর মূল অসুবিধা হল দহনজনিত দূষণ।

(ii) জ্বালানী কোষ (Fuel Cell) : কোন যন্ত্র অনড় অবস্থায় বিদ্যুৎ সৃষ্টি করলে সেটি শক্তি উৎপাদনের একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত হবে। জ্বালানী কোষ এরকম একটি যন্ত্র। হাইড্রোজেন, প্রাকৃতিক গ্যাস, মিথাইল, প্রোপেন ইত্যাদি শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করে এই কোষে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। কোষের তাত্ত্বিক দক্ষতা 82.9% ।

(ii) কঠিন আবর্জনা (Solid Waste) : বর্তমানে বহু শহরে কঠিন আবর্জনা পুড়িয়ে স্টীম এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। অবশ্য এক্ষেত্রে বায়ুদূষণের ওপর সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(iv) সৌরশক্তি (Solar Energy) : দক্ষিণমুখী জানালার দ্বারা সৌরতাপ দক্ষভাবে সংগ্রহ করে কাজে লাগানো যায়। সৌরতাপ দ্বারা বয়লার চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। দর্পণ ব্যবহার করে বৃহৎ সৌরচুল্লী তৈরী করে তার দ্বারা উচ্চ উষ্ণতা পাওয়া সম্ভব। সৌরউনান গ্রীষ্ম প্রধান দেশে লাভজনক হলেও পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয়নি।

1.6.1 জৈব গ্যাস (Bio gas) :

দূষিত জল বা দূষিত জল বিশোধনের সময়ে প্রাপ্ত আবর্জনার অবায়বীয় জীর্ণকরণ উদ্ভুত গ্যাসকে জৈব গ্যাস বা বায়োগ্যাস বলা যায়। এটা সম্পূর্ণ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মূলত ঃ অবায়বীয় জীর্ণকরণ বিক্রিয়ায় CH^4 উৎপন্ন হয় বলে ঘটনাটিকে জৈব মিথেন উৎপাদন নামে অভিহিত করা হয়।

1.6.2 এল. পি. জি. বা তরলীকৃত খনিজ তেল ঃ

এর পুরো নাম লিক্যুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস। এল.পি.জি.-তে এমন কিছু উদ্বায়ী হাইড্রোকার্বন থাকে যে উহারা স্বাভাবিক বায়ুমন্ডলীয় চাপে গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে, কিন্তু উপযুক্ত চাপের প্রভাবে উহারা তরলে পরিণত হয়। ইহার প্রধান উপাদানগুলি হল, n-বিউটেন, আইসোবিউটেন, বিউটেন ও প্রোপেন।

ইহাকে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে বা ভারী তেলের ভাঙ্গানের সময় উপজাত পদার্থ হিসাবে পাওযা যায়।

কোন ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে ইহার নিঃসরণ (leak) সনাক্ত করার জন্য এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য ইহার সঙ্গে খুব সামান্য পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত জৈব সালফাইড (বিটা-মারক্যাপটান) যুক্ত করা হয়।

এই গ্যাস স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক নয়, কারণ ইহাতে কোন কার্বন মনোক্সাইড থাকে না।

ইহা গৃহস্থালীতে ও অনান্য কিছু যানবাহনের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

1.6.3 গোবর গ্যাস ঃ

এই গ্যাসের উপাদানগুলির গড় আয়তনিক সংযুক্তি হল ঃ মিথেন = 55 %, হাইড্রোজেন = 7.4 %, কার্বন ডাই-অক্সাইড = 35 %, নাইট্রোজেন = 2.6 % এবং খুব সামান্য পরিমাণ হাইড্রোজেন সালফাইড।

ইহাকে রান্না করার কাজে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

যদি শুষ্ক গোবর (ঘুঁটে) কে সরাসরি জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয় তবে আবহাওয়া দূষিত হয় এবং উহার দহনের ফলে উত্তাপও অনেক কম পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু গোবর থেকে যদি গ্যাস তৈরী করা যায় তবে উহা থেকে অনেক বেশী পরিমাণে তাপ পাওয়া যায় এবং একই সঙ্গে উপজাত পদার্থ হিসাবে নাইট্রোজেন যুক্ত সার তৈরী হয়।

1.6.4 বায়ুশক্তি ঃ

বায়ুশক্তি একটি নবীভবনযোগ্য উৎস। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী সমুদ্রতট ও তৎসলগ্ন অঞ্চলে দিনে বাতাসের বার্ষিক গড় ঘনত্ব 3 kWh/m^2 অর্থাৎ 3 কিলোওয়াট ঘন্টা প্রতি বর্গমিটার প্রতিদিন। কোন কোন স্থানে এই গড় 10kWh/m^2/day এবং বছরে 5-7 মাস অন্তত 4 kWh/m^2/day এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে ভুগর্ভ থেকে জল তোলা হয় এবং টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটর দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। লাদাখে বায়ুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। যে সমস্ত স্থানের বায়ুর গতিশক্তি সন্তোষজনক সেখানে ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় অনেক বায়ুকল লাগানো হচ্ছে। আশা করা যায় এই শতাব্দীতে 20% শক্তির ভান্ডার পূর্ণ হবে বায়ুশক্তির উৎস থেকে।

প্রাচীনকালে যখন বিদ্যুৎ অধরা ছিল তখন বায়ুশক্তির ব্যবহার ছিল। সমুদ্রে বাণিজ্য ও রণতরীর সঞ্চালন, কাঠ-চেরাই এবং শস্য ভাঙ্গানোর কাজে এই শক্তির ব্যবহার ছিল। বর্তমানে যখন অন্যান্য শক্তি অপ্রতুল হয়ে উঠছে তখন বায়ুকল আবার ব্যবহার হচ্ছে। সুইজারল্যান্ডের তিন শাখা বিশিষ্ট বায়ুকল সেকেন্ডে 10 মিটার হওয়ার গতিবেগে 5000 ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে।

আমেরিকায় সাইকেল চাকার টারবাইন বেশী ব্যবহার হয়। বর্তমানে বিশ্বের উন্নত দেশ এবং বিকাশশীল দেশগুলি বায়ুকলের গবেষণায় রত।

ভারতের দক্ষিণে এবং উড়িষ্যার উইন্ড ফার্ম আছে এবং প্রায় 6000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এগুলি থেকে উৎপাদন হয়। ভারতে এই শক্তি থেকে 2000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব।

1.6.5 সৌর শক্তি ঃ

শক্তির সংকট আসলে সভ্যতার সংকট। তাই সভ্যতা যখন বিপন্ন তখন বিকল্পশক্তি বা অপ্রচলিত শক্তির দিকে আমরা তাকাই। বিকল্প শক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্যের বিপুল শক্তির ভান্ডারের দিকে হাত বাড়াতেই হয়। সূর্যরশ্মির সাহায্যে সরাসরি পৃথিবীতে যে বিপুল আলো ও তাপ আসে তার প্রত্যক্ষ ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই। পৃথিবীর প্রতি বর্গমিটার স্থানে যে পরিমাণ সৌরশক্তি পাওয়া যায় তার পরিমাণ প্রায় 1.3 কিলোওয়াট বিদ্যুতের সমান। যদি আমরা পতিত সূর্যরশ্মির একটা বড় অংশ চিরাচরিত শক্তিতে রূপান্তর করতে পারি তবে শক্তির সংকট থাকবে না। যেহেতু সৌর বিকিরণে পাওয়া সৌরশক্তিকে ব্যবহারের উপযুক্ত করার সঠিক প্রযুক্তি নেই এবং এই শক্তিকে সরাসরি অন্য শক্তি যেমন বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় না, তা না হলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মোট প্রয়োজনীয় শক্তি 32 মিনিটের সৌর বিকিরণেই পাওয়া যেত।

সৌরশক্তি অনিয়মিত এবং নিয়ন্ত্রণাধীন নয় ফলে রাতের বেলা বা মেঘলা আকাশে একে পাওয়া যায় না। যদিও শক্তির উৎস হিসাবে সূর্যরশ্মির ক্ষমতা অসীম কিন্তু এর ব্যবহার ও প্রয়োগের সীমাবদ্ধতাই সৌরশক্তি উৎসের প্রধান অন্তরায়। অতএব আধুনিক বিজ্ঞানের একমাত্র চিন্তা সৌরশক্তির ব্যবহারে নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার। এ পথেই মিলবে শক্তির সংকটের থেকে উদ্ধার হওয়ার চাবিকাঠি। তাছাড়া সৌরশক্তি পরিবেশমিত্র বলে পরিবেশ দূষণের কোন সম্ভাবনা নেই।

1.6.5.1 সৌরজল উত্তাপক (Solar Water Heater)

তাপশোষককারী চ্যাপ্টা ধাতুর পাত সৌরশক্তি সংগ্রাহক হিসাবে কাজ করে। এই ধাতুর এক প্রান্ত তাপের কুপরিবাহী পদার্থ দিয়ে মোড়া থাকে, ফলে সম্মুখের অংশ সৌরতাপ শোষণ ও বিকিরণ করে। তাপ নিরোধক প্রাচীরে মোড়া

জলাশয়ের সঞ্চিত জলে তাপ সংরক্ষিত থাকে। জলাধার থেকে জল একটি নল দিয়ে সংগ্রাহকে যায় এবং আবার জলাশয়ে ফিরে আসে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে জলের পরিমাণ, গতি এবং সংগ্রাহকের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে। 2.3 বর্গমিটার সংগ্রাহকে প্রতিদিন 100 লিটার গরম জল (60 - 80^{0}C) পাওয়া যেতে পারে।

1.6.5.2 সৌরপাচক (Solar Cooker)

সৌরপাচক এক প্রকার বাক্স। যার মধ্যে সূর্যকিরণ থেকে সংগৃহীত তাপ ব্যবহার করে রান্না করা হয়। ফলে কোন প্রচলিত জ্বালানীর প্রয়োজন হয় না। সৌরপাচকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নিম্নলিখিত ঃ

সুবিধা

(i) জ্বালানী সাশ্রয় ও দূষণ প্রতিরোধ।

(ii) কম তাপমাত্রার ফলে খাদ্যগুণ বজায় থাকা।

(iii) শ্রমের সাশ্রয় হয়।

(iv) দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নেই।

(v) রান্না 4-5 ঘন্টা গরম থাকে,

অসুবিধা ঃ

(i) রাত্রে, মেঘলা বা বৃষ্টির দিনে রান্না সম্ভব নয়।

(ii) রুটি বা ভাজা করা যায় না।

(iii) আর্থিক দিক দিয়ে সৌরপাচক দামী।

1.7 সারাংশ

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি যা যা জানতে পেরেছেন সেগুলি হল–

জ্বালানীর সংজ্ঞা ও জ্বালানীর শ্রেণীবিভাগ

কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানীর উদাহরণ

তাপনমূল্যের সংজ্ঞা

প্রকৃতিতে কয়লা কিভাবে উৎপন্ন হয়; বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লা

তরল জ্বালানীর সুবিধা

কোল গ্যাস, প্রোডিউসার গ্যাস ও ওয়াটার গ্যাস কি কি গ্যাসের মিশ্রণে তৈরী।

অচিরাচরিত শক্তির কয়েকটি উৎস

সৌরশক্তির ব্যবহার

একক 2 ❑ জলদূষণ (Water Pollution)

গঠন

2.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

2.1 জলের প্রাকৃতিক উৎস

2.1.1 জলদূষণের উৎসসমূহ

2.1.2 জলদূষণের শ্রেণীবিভাগ

2.2 জলদূষণের কয়েকটি ঘটনা

2.3 জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ

2.4 জলের দূষণ মুক্তকরণ

2.4.1 জলের প্রাথমিক পরিশোধন

2.4.2 জলের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিশোধন

2.4.3 জলের তৃতীয় পর্যায়ের পরিশোধন

2.5 জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন

2.6 জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা

2.7 জলে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ

2.8 জলের খরতা

2.9 সারাংশ

2.0 প্রস্তাবনা

জীবনধারণের জন্য জলের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। পৃথিবীর মোট জলসম্পদের 97% সমুদ্রে থাকে, 2% জল মেরু অঞ্চলে বরফ ও হিমবাহ হিসাবে থাকে এবং মাত্র 1% জল নদী, হ্রদ বা পুকুরে থাকে যা মানুষের ব্যবহারযোগ্য। পৃথিবীর মধ্যে জল হচ্ছে একমাত্র পদার্থ যা তরল, কঠিন ও বাষ্পীয় অবস্থায় অবস্থান করে। সূর্যের তাপে নদী/সমুদ্রের জল বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমন্ডলে মেঘের সৃষ্টি করে, যা বৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে। এইভাবে পৃথিবীর মোট জল স্থির থাকে এবং জলচক্র নিয়ন্ত্রিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিল্পের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে জলের প্রতি মানুষের চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু মানুষের ব্যবহারযোগ্য এই জল প্রতিনিয়ত কোনো কৃত্রিম বা পরিবেশগত কারণে ভৌত, রাসায়নিক বা জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে ব্যবহারের অযোগ্যে পরিণত হচ্ছে। ইহাকেই জলদূষণ বলা হয়।

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন–

জলদূষণ বলতে কি বোঝায়

জলদূষণের কারণগুলি কি কি? এই কারণগুলির মধ্যে যেমন প্রাকৃতিক কারণ আছে তেমনি সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির উপর মানুষের হস্তক্ষেপে বিভিন্ন উৎসে জল দূষিত হচ্ছে। যেমন মানুষের তৈরী কলকারখানা থেকে বর্জ্য পদার্থ ফলন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার প্রয়োগ অথবা পোকা বিনষ্ট করতে কীটনাশক পদার্থের ব্যবহার–এগুলি সবই বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদী এবং সমুদ্রে পতিত হয় এবং এর ফলে জল দূষিত হয়।

কিভাবে জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়

পানীয় জলের আন্তর্জাতিক প্রমাণমাত্রা বলতে কি বোঝায়

রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা কি এবং কিভাবে নির্ণয় করা যায়।

জলে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ এবং জলের খরতা নির্ণয়ের পদ্ধতি।

2.1 জলের প্রাকৃতিক উৎস

বৃষ্টির জল ঃ প্রাকৃতিক উৎসগুলির মধ্যে একমাত্র বৃষ্টির জলই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। কিন্তু কলকারখানার নিকটবর্তী বায়ুমন্ডলে উপস্থিত কার্বন, নাইট্রোজেন ও সালফার ডাইঅক্সাইডসমূহ বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হয়ে অম্লবৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসে।

নদীর জল ঃ বৃষ্টির জল পৃথিবীর মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদীতে প্রবেশ করে। মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় মাটির মধ্যে উপস্থিত Na, K, Mg প্রভৃতি ধাতুর সালফেট, ক্লোরাইড ইত্যাদি লবণ জলের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যায়। জমিতে অতিরিক্ত সার, কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত অথবা প্রলম্বিত অবস্থায় নদীর জলে মিশে জল দূষিত করে। এছাড়া কলকারখানার বর্জ্য পদার্থও নদীর জলকে দূষিত করে।

ঝরনার জল ঃ বৃষ্টির জল মাটির মধ্যে দিয়ে ভূগর্ভস্থস্তরে জমা হয়। পাহাড়ের বৃষ্টির জল ঝরনার আকারে বের হয়ে আসে।

সমুদ্রের জল ঃ নদীর জল সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সমুদ্রের জলে অধিক পরিমাণে খনিজ লবণ জৈব, পদার্থ ও বর্জ্য পদার্থ মিশে থাকার জন্য মানুষ এই জল ব্যবহার করতে পারে না। এই জল লবণাক্ত। প্রাকৃতিক জলের মধ্যে সমুদ্রের জল সবচেয়ে দূষিত।

2.1.1 জলদূষণের উৎসসমূহ ঃ

প্রাকৃতিক উৎসসমূহ ঃ জীবজন্তু ও গাছপালার মৃত্যুজনিত পদার্থর আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে উদ্ভুত পদার্থর পাহাড় ও ভূমির ক্ষয়ে উৎপন্ন পদার্থসমূহ জলাবহিত হয়ে নদীতে এসে পড়ে এবং নদীর জল দূষিত হয়। নদীর জল দূষিত হবার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ আগেই বলা হয়েছে।

কৃত্রিম উৎসসমূহ ঃ কলকারখানা, শিল্পাঞ্চল থেকে নির্গত পদার্থ, মানুষের মলমূত্র, গৃহপালিত পশুর খাবার অবশেষ নদীর জলে মিশে ইহাকে দূষিত করে।

2.1.2 জলদূষণের শ্রেণীবিভাগ ঃ

(i) জৈবদূষক পদার্থসমূহ ঃ জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ 4-6 ppm হওয়া উচিত। গৃহস্থ বাড়ীর ফেলে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় পদার্থ মানুষ ও গৃহপালিত পশুর মলমূত্র, কৃষিকাজে ব্যবহৃত পদার্থসমূহ জলে মিশে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। এর ফলে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জামাকাপড় ও শরীর পরিস্কার করার জন্য যথাক্রমে কৃত্রিম ডিটারজেন্ট ও সাবান ব্যবহার করা হয়। ডিটারজেন্টের মধ্যে নানারকমের উৎসেচক থাকে, যা অতি কম পরিমাণে থেকে ফেনার সৃষ্টি করে। এর ফলে জল বাতাস শোষণ করতে পারে না, তাই জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। গৃহপালিত পশু, মানুষের মলমূত্র পুকুর ও নদীর জলে মেশার ফলে, বিভিন্ন প্রকার রোজ জীবাণু দ্বারা জল দূষিত হয়। জলবাহিত উল্লেখযোগ্য রোগসমূহ হল আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস, জন্ডিস ইত্যাদি।

মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জৈব রাসায়নিক পদার্থ যেমন প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ, ডিটারজেন্ট, জীবাণুনাশক পদার্থ ইত্যাদি প্রস্তুতির সময় কিছুটা বিভিন্নভাবে মাটিতে পড়ে যায়, যাহার বেশীর ভাগই জলে মিশে উদ্ভিদ, জীব ও মানুষের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। এই সকল পদার্থের বেশীর ভাগই জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা সহজে বিয়োজিত হয় না। ইহারা জলের গুণ নষ্ট করে। ফলে জলে বসবাসকারী প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতির ক্ষতিসাধন করে।

কৃষিকাজজনিত কাজের জন্য চাষীরা নানাধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে। যেমন পোকা মারার জন্য প্যারাথায়ন, ইথায়ন প্রভৃতি, আগাছা এবং অপ্রয়োজনীয় গাছপালা ধ্বংস করার জন্য 2, 4 -ডাইক্লোরোফিনক্সি অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। এই সকল কীটনাশক পদার্থসমূহ স্প্রে করার সময় বাতাসে মিশে যায় এবং কাছাকাছি কোনো পুকুর বা জলাশয় পড়ে। বৃষ্টির জল দ্বারাও এই সকল পদার্থ বিভিন্ন জলাশয়ে গিয়ে মেশে এবং জল দূষিত করে।

(ii) অবৈজদূষক পদার্থসমূহ ঃ পৃথিবীর সমস্ত উন্নয়নশীল দেশেই শিল্পের প্রসারণের জন্য প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহার হয় এবং এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে দূষিত পদার্থ জলের সঙ্গে মিশে জলকে দূষিত করে। বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড ইত্যাদি; উপাদানকারী কারখানা থেকে প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য পদার্থ জলের মধ্যে মিশে জলের অম্লদূষণ করে। কস্টিক সোডা, চুন, কলিচুন উৎপাদনকারী কারখানা থেকেও প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য পদার্থ জলে মিশে জলের ক্ষার দূষণ করে। নাইট্রেট (NO^{o}_{3}) নাইট্রাইট (NO^{o}_{2}) সালফেট (SO^{2}_{4}), প্রভৃতি অ্যানায়নযুক্ত এবং কপার (Cu), ম্যাঙ্গানীজ (Mn), মারকারী (Hg), সীসা (Pb) প্রভৃতি লবণ ক্ষতিকারক সীসার উপর থাকলে দীর্ঘস্থায়ী দূষণ সমস্যার সৃষ্টি করে।

সীসা দূষণের প্রধান উৎস হল ইস্পাত ও রঙ শিল্প। এছাড়া টেট্রাইথাইল লেড গাড়িতে অ্যান্টিনক যৌগ হিসাবে গ্যাসোলিনে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে জলে এবং বায়ুতে সীসার পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সীসা দূষিত জল গ্রহণ করলে শরীরের বিপাকীয় প্রক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটে।

ইদানীং আর্সেনিকজনিত দূষণ এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আর্সেনিক দূষিত জল গ্রহণ করার ফলে বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক চর্মরোগের সৃষ্টি হচ্ছে।

(iii) পলি ঃ বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল, কৃষিকাজ, ভূমিক্ষয়, বুলডোজার চালানো শহর এলাকা থেকে ধুয়ে আসা মাটি ও খনিজ পদার্থের ক্ষুদ্র কণা থেকে পলি উৎপন্ন হয়। এই পলি নদীপথ এবং নদীগর্ভকে বুজিয়ে নদীর গভীরতা হ্রাস করে। ভাকরা, মাইথন প্রভৃতি জলাধারে পলি পড়ার ফলে এখানে বেশি জল ধরে রাখা যাচ্ছে না। এর ফলে বর্ষাকালে বন্যা বেশি হচ্ছে এবং গ্রীষ্মকালে সেচের জন্য পরিমাণমত জল পাওয়া যাচ্ছে না। নদীতে বেশী পরিমাণে পলি পড়ার ফলে নদীবন্দরগুলিতে জাহাজ চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। পাম্পিং এবং টারবাইন ব্যবস্থায় ক্ষয়ের ফলে জলে প্রয়োজনীয় সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারছে না, ফলে জলের নীচের উদ্ভিদসমূহের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া বাধা পাচ্ছে।

(iv) তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ ঃ নিউক্লিয় অস্ত্র, নিউক্লিয় ঔষুধ, নিউক্লিয় গবেষণাগার থেকে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ জল দূষিত করে। খনি থেকে তেজস্ক্রিয় মৌলের নিষ্কাশনের সময়েও কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ জলে মেশে। তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকসমূহ যেমন Ra^{226}, U^{236}, Pu^{239}, Ba^{140} প্রভৃতি জলের নিচে পলিতে জমা হয় এবং জৈবচক্রে প্রবেশ করে এবং শরীর ও স্বাস্থ্যের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। জলে উপস্থিত অতি সামান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ ক্যান্সার সৃষ্টি করে এবং DNA ধ্বংস করে।

(v) তাপীয় দূষকসমূহ ঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় জলীয় বাষ্পকে শীতল ও ঘনীভূত করার জন্য প্রচুর পরিমাণে জল লাগে। ফলে জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এবং এই উষ্ণ জল নদী বা হ্রদে নিক্ষেপ করা হয়। এর ফলে নদী বা হ্রদের জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে, মাছের জীবনধারণ কঠিন হয়ে পড়ে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলের ঘনত্ব ও অক্সিজেনর পরিমান কমে যায়, ফলে জলজ প্রাণীর পরিপাকক্রিয়া নষ্ট হয়।

(vi) অতি পৌষ্টিকতা (Eutrophication) ও জলদূষণ ঃ চিনিকল, কসাইখানা, কাগজের কল, দুগ্ধকেন্দ্র প্রভৃতি শিল্পের বর্জিত ময়লা জলে নানাধরনের পুষ্টিকর পদার্থ দ্রবীভূত অথবা প্রলম্বিত অবস্থায় থাকে। এই জল উৎস থেকে নিকটবর্তী জলাশয়ে প্রবেশ করলে জলের পৌষ্টিকতা বৃদ্ধি পায়। সেই জলাশয়ের জলে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ (যেমন, নীলচে-সবুজ শ্যাওলা) দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। এই অবস্থাকেই 'অতিপৌষ্টিকতা' বলে। এর ফলে জলাশয়ে জলতল শ্যাওলায় আবৃত হয়ে যায়। একে 'শৈবাল বিকাশ' বলে। অবশেষে শ্যাওলায় মতাবশেষ পচে বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং বিয়োজনকারী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে জলের অক্সিজেনের পরিমাণ ভীষণভাবে কমে যায়। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় বলে জলজপ্রাণী, যেমন মাছ, অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়।

জলের এই অতিপৌষ্টিকতাজনিত সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়গুলি হল–

(a) প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎসের বর্জির জল থেকে পুষ্টিকর পদার্থগুলির অপসারণ, এই পদ্ধতি ব্যয়সাপেক্ষ

(b) পুষ্টিসমৃদ্ধ জল সেচের কাজে ব্যবহার করা

(c) জলাশয়ের শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদ থেকে জৈব গ্যাস তৈরী করা।

অনুশীলনী – 1

(a) জলদূষণ বলতে কি বোঝায়?

(b) জলের প্রধান উৎসসমূহ কি কি?

(c) জলদূষণের গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলির নাম লিখুন।

(d) জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কত হওয়া উচিত?

(e) কৃত্রিম ডিটারজেন্ট কিভাবে জল দূষিত করে?

(f) জলবাহিত কয়েকটি রোগের নাম করুন।

2.2 জলদূষণের কয়েকটি ঘটনা

(i) জাপানের মিনিমাটা অঞ্চলে ভিনাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন করার কারখানা থেকে প্রচুর পরিমাণে মার্কিউরিক ক্লোরাইড [$HgCl_2$] সমুদ্রে ফেলা হত। এই পারদ যৌগ সমুদ্রের তলার মাটির জীবাণুর দ্বারা ডাই-মিথাইল মার্কারী [$(Ch_3)_2Hg$] যৌগ তৈরী করে যা মাছের শরীরে প্রবেশ করে। এই মাছ খাওয়ার ফলে 1953 সালে এই অঞ্চলের মানুষ স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়।

(ii) 1973 সালে আমেরিকার মিচিগান শহরে ভুলবশতঃ ম্যাগনেশিয়াম অখসাইড [MgO] মনে করে পলিব্রোমিনেটেড বাই ফিনাইল (PBB) পশুর খাবারের সঙ্গে মেশানো হয়। ফলে প্রচুর গরু, কুকুর, মুরগী মারা যায়।

(iii) 1988 সালে ইংল্যান্ডের জলশোধন কেন্দ্রে 200 টন অ্যালুমিনিয়াম সালফেট [$Al_2(SO_4)_3$] জলের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে জলে Al-র মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। এই জল গ্রহণের ফলে এই অঞ্চলের মানুষের মুখে ঘা, পাকস্থলীর প্রদাহ ইত্যাদির লক্ষণ দেখা যায়।

2.3 জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ

জলদূষণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নত শিল্প প্রযুক্তির বিকাশ। জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জাতিগতভাবে এবং সরকারী ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার। প্রত্যেক মানুষকে জলের প্রকৃতি এবং প্রাণীজগতে এর প্রভাব সম্বন্ধে জানার জন্য যথেষ্ট শিক্ষিত হতে হবে। জলের মধ্যে প্রাণীর বা মানুষের ব্যবহৃত নোংরা বর্জ্য পদার্থ ছোঁড়া থেকে নিজেকে সংযত রাখতে হবে। পৌরসংস্থাগুলিকে নর্দমার সুব্যবস্থা করতে হবে এবং জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কাজে সরকারকে নির্দিষ্ট্য তহবিল গড়তে হবে। 1974 সালে জলদূষণ আইন পাশ করে ভারত সরকার জলদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে।

2.4 জলের দূষণ মুক্তকরণ

জলের মধ্যে উপস্থিত জৈব বর্জ্য পদার্থ, অব্যবহার্য প্লাস্টিকের দ্রব্য, ধাতুর টুকরো, সংক্রামক জীবাণু, ধুলো, বালি মিশে থাকে। এই সকল ক্ষতিকারক দূষিত পদার্থসমূহ দূর করে বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত করা যায়। নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়ে পৌর অঞ্চলের নর্দমার জল, শিল্প কারখানার বর্জ্য জল পরিশোধন করা হয়।

2.4.1 জলের প্রাথমিক পরিশোধন

থিতান ঃ গৃহস্থালি ও কারখানার পরিত্যক্ত জলে প্লাস্টিকের দ্রব্য, ধাতুর টুকরো, কাচের টুকরো, কাঠ ইত্যাদি থাকে। এই সকল পদার্থ বাহিত নালার মুখে ধাতুনির্মিত ছাঁকনী লাগিয়ে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের কঠিন পদার্থ ছেঁকে পৃথক করা হয়। এরপর এই জল সরু ছাঁকনীর মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়। এরপর ঐ জলকে বড় জলাধারে রেখে থিতানো হয়। এর ফলে বালি, মাটি, কাদা ও ভারী ধুলিকণা থিতিয়ে পড়ে।

তঞ্চন ঃ অবিশুদ্ধ জলকে থিতান ট্যাঙ্কে কয়েকদিন রাখার পর, এর মধ্যে ফটকিরি [যেমন পটাশ অ্যালাম K_2SO_4,

$Al_2(SO_4)_4$, $24H_2O$] যোগ করা হয়। এর ফলে ছোট ছোট কণাগুলি একত্রিত হয়ে বড় কণায় পরিণত হয় এবং থিতিয়ে পড়ে।

পরিস্রাবণ ঃ থিতিয়ে পড়া কাদা, ময়লা থেকে উপরের জলকে পরিস্রাবণের মাধ্যমে পৃথক করা হয়। এরজন্য ঐ জলকে বালির স্তরের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়।

সংক্রামক জীবাণু দূরীকরণ ঃ পরিস্রুত জলকে জীবাণুশূন্য করার জন্য ক্লোরিন কিংবা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে সমস্ত জলকে আলোড়ন করা হয়। ক্লোরিনের পরিমাণ বেশী হলে জলে উপস্থিত জৈব যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন তৈরী হয়, যা ক্যান্সার রোগের সৃষ্টি করে। এইজন্য জলের জীবাণু দূর করার জন্য ক্লোরিন ব্যবহার না করে অতিবেগুনী রশ্মি বা ওজোন ব্যবহার করা হয়।

2.4.2 জলের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিশোধন

এই পর্যায়ে জীবাণু, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি জীবন্ত আণবিক পদার্থের সাহার্য্যে জলে উপস্থিত দ্রবীভূত এবং কলয়ডীয় জৈব পদার্থসমূহকে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অপসারিত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় জীবন্ত আণবিক পদার্থ জলে উপস্থিত জৈব পদার্থগুলিকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং উহাদের CO_2- তে জারিত করে। নাইট্রোজেন যুক্ত জৈব পদার্থসমূহ অ্যামোনিয়া এবং নাইট্রেট ও নাইট্রাইটে পরিণত হয়।

2.4.3 জলের তৃতীয় পর্যায়ের পরিশোধন

রাসায়নিক পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে জলে ফেরাস সালফেট, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট মিশিয়ে জলে উপস্থিত কলয়ডীয় কণার অধঃক্ষেপ ফেলা হয় এবং বালির স্তরের ছাঁকনীর মধ্য দিয়ে পাঠান হয়। এরপর পরিস্রুত জলে কলিচুন যোগ করে জলে উপস্থিত ফসফেট ক্ষারকীয় ফসফেটরূপে অধঃক্ষিপ্ত করা হয়। অবশিষ্ট জৈব পদার্থ অপসারণের জন্য সক্রিয় অঙ্গারের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। এরপর ঐ পরিস্রুত জলে ওজোন বা ক্লোরিন মিশিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

আয়ন বিনিময় পদ্ধতি ঃ জলে অনেক সময় ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের সালফেট, ক্লোরাইড প্রভৃতি লবণ দ্রবীভূত হয়ে থাকে। পানীয় জলের ক্ষেত্রে ও লন্ড্রীর কাজের ক্ষেত্রে এই জল উপযুক্ত নয়। এইজন্য এই জলকে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন বিনিময়কারী রেজিনের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। ক্যাটায়ন বিনিময়কারী রেজিন হল উচ্চ আণবিক ওজোনযুক্ত পলিমার যৌগ যেখানে কার্বক্সিল (–COOH) বা সালফোনিক অ্যাসিড মূলক ($–SO_3H$) থাকে এবং অ্যানায়ন বিনিময়কারী রেজিন হল উচ্চ আণবিক ওজনের অ্যামিন যৌগ। এই দুই প্রকার রেজিনের মধ্যে জল চালনা করলে জল আয়নমুক্ত হয়ে মৃদু জলে পরিণত হয়।

বাতাস্বিতকরণ ঃ উচ্চ চাপের বায়ুকে মৃদু জলের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে বুদবুদ আকারে বের করে দেওয়া হয়। এর ফলে মৃদু জলের মধ্যে উপস্থিত কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতি গ্যাস দূর হয় এবং জলে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

2.5 জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন (D.O)

জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ 4-6 ppm হওয়া দরকার। জলের ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক কার্য্যের উপর জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ভর করে। জৈব পদার্থের দূষণের ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে

যায়। দূষিত জলের মধ্যে উপস্থিত ব্যাক্টেরিয়া দ্রবীভূত অক্সিজেনকে কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত করে। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণের উপর কোন্ জল কতটা দূষিত বলা যায়।

জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ আয়োডোমিতি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়। একটি বিশেষ ধরনের ছিপিযুক্ত কাঁচের বোতলে ভর্তি করে দূষিত জল নেওয়া হয়। এর মধ্যে ক্ষারীয় পটাসিয়াম আয়োডাইড এবং ম্যাঙ্গানাস সালফেট যোগ করা হয়, এতে ম্যাঙ্গানাস হাইড্রক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন দ্বারা ম্যাঙ্গানাস হাইড্রক্সাইড ক্ষারকীয় ম্যাঙ্গানীক হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয়। এর মধ্যে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করলে ক্ষারকীয় ম্যাঙ্গানীক হাইড্রক্সাইড জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সমতুল্য আয়োডেন মুক্ত করে, যা প্রমাণ সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণ দিয়ে স্টার্চ নির্দেশক ব্যবহার করে প্রশমিত করা হয়। ব্যবহৃত সোডিয়াম থায়োসালফেটের আয়তন থেকে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

2.6 জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা

জলে উপস্থিত জৈব পদার্থের জীবাণু দ্বারা সবাত অবস্থায় বিভাজনের জন্য যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, তাকে জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বলে। নির্দিষ্ট পরিমাণ নমুনা জল বায়ুনিরোধক পাত্রে নিয়ে 20^0C উষ্ণতায় 5 দিন ধরে রেখে দেওয়া হয়। প্রথমে এবং 5 দিন পরে জলে উপস্থিত অক্সিজেনের পরিমাণের পার্থক্য থেকে জৈব রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা নির্ণয় করা হয়।

2.7 জলে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ

জলে উপস্থিত দ্রবীভূত, প্রলম্বিত ও থিতিযোগ্য সমস্ত কঠিন পদার্থকে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ বলা হয়। জলে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ নির্ণয়ের জন্য একটি পোর্সেলিন পাত্রের নির্দিষ্ট ওজন নেওয়া হয়। এই পাত্রের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণমত জল নিয়ে ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত করা হয়। এইভাবে তরল অংশ সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়ে গেলে, অবশেষকে আরও শুষ্ক করে নির্দিষ্ট ওজন নেওয়া হয়। দুইটি ওজনের পার্থক্য থেকে জলে দ্রবীভূত মোট কঠিন পদার্থের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

2.8 জলের খরতা

জলের মধ্যে সাধারণ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রণ প্রভৃতি ক্লোরাইড, সালফেট, বাইকার্বনেট লবণ দ্রবীভূত হয়ে থাকে। এই সকল দ্রবীভূত লবণের পরিমাণের উপর জলের খরতার মাত্রা নির্ভর করে। জলের খরতা সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা হয়। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রণ প্রভৃতির বাইকার্বনেট লবণ জলে দ্রবীভূত থেকে অস্থায়ী খরতার সৃষ্টি করে। স্ফুটনের সাহায্যে জলের এই অস্থায়ী খরতা দূর করা হয়। জলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতির ক্লোরাইড, সালফেট লবণ দ্রবীভূত থাকলে স্থায়ী খরতার সৃষ্টি করে। এই খরতা সাধারণ স্ফুটনের সাহায্যে দূর করা যায় না।

2.9 সারাংশ

- এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জলদূষণ সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য জানতে পেরেছেন তার সার-সংক্ষেপ নিচে দেওয়া হল ঃ
- জলদূষণ কাকে বলে
- জলের প্রধান প্রাকৃতিক উৎসগুলি যেমন বৃষ্টির জল, নদীর জল, ঝরনার জল ও সমুদ্রের জল। এই উৎসগুলি থেকে প্রাপ্ত জল কোন্ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং সবচেয়ে দূষিত কেন
- জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জলদূষণ মুক্তকরণ পদ্ধতি
- জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনর পরিমাণ কত হওয়া উচিত এবং কেন দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। এর ফলে কি হয়।
- জলে রাসায়নিক অক্সিজেনর চাহিদা ও জৈব রাসায়নিক অক্সিজেনর চাহিদা বলতে কি বোঝায়= এবং কিভাবে নির্ণয় করা যায়।
- জলের খরতা কিসের উপর নির্ভর করে এবং জলের এই খরতা কিভাবে নির্ণয় করা যায়।

একক 3 ❑ বায়ুদূষণ (Air Pollution)

গঠন

3.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

3.1 বায়ুদূষণের উৎসসমূহ

3.2 প্রধান প্রধান বায়ুদূষক গ্যাসসমূহ এবং তাদের উৎস ও ক্ষতিকারক প্রভাব

3.2.1 কার্বন মনোক্সাইড

3.2.2 কার্বন ডাইঅক্সাইড

3.2.3 সালফার ডাইঅক্সাইড

3.2.4 নাইট্রোজেন অক্সাইড

3.2.5 বস্তুকণা

3.2.6 বিষাক্ত ভারী উপাদান

3.3 সবুজঘর বা গ্রীনহাউস প্রভাব

3.3.1 সবুজঘর বা গ্রীনহাউস কী

3.3.2 সবুজঘরের প্রভাবগুলি কী কী

3.3.3 সবুজঘর গ্যাসসমূহ এবং তাদের উৎস

3.3.4 সবুজঘর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ

3.4 অম্লবৃষ্টি

3.4.1 অম্ল বৃষ্টির উৎস

3.4.2 অম্লবৃষ্টির প্রভাব

3.4.3 অম্লবৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ

3.5 ধোঁয়াশা

3.5.1 কেন ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়

3.5.2 ধোঁয়াশার প্রকারভেদ

3.5.3 ধোঁয়াশার প্রভাব

3.6 ওজোন স্তর

3.6.1 বায়ুমন্ডলে ওজোন স্তরের সৃষ্টি

3.6.2 ওজোন স্তরের বিনষ্টি

3.6.3 ওজোন স্তর ক্ষয়ের প্রভাব

3.6.4 ওজোন স্তর রক্ষা

3.7 বায়ুদূষণের কয়েকটি ঘটনা

3.8 বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

3.9 সারাংশ

3.0 প্রস্তাবনা

মানুষ ও তার চারপাশের সমস্ত কিছু নিয়েই পরিবেশ গঠিত হয়। বাড়িঘর, গাছপালা, খালবিল, নদনদী, সাগর মহাসাগর, কলকারখানা, বৈজ্ঞানিক প্রকল্প ও গবেষণাগার ইত্যাদি সবকিছুই মানুষের পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। Natural Environmental Research Council -এর মতে যে সকল পদার্থ ও শক্তি বর্জ্য পদার্থ হিসাবে মানুষ পরিত্যাগ করে এদের মধ্যে যেগুলি পরিবেশের উপর ক্ষতিকারক পরিবর্তন সাধন করে তাকে দূষণ বলে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের মধ্যে ক্ষতিকারক পদার্থের ঘন সমাবেশ যখন মানুষ ও তার পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হয় তখন তাকে বায়ুদূষণ বলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বাসস্থানের প্রয়োজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ বনভূমি বিলুপ্ত করে, উচ্চভূমিতে সমতল করে, নদীর গতিপথকে পরিবর্তন করে গ্রাম, শহর, নগর গড়ে তুলছে। সবুজ তৃণভূমি ও শস্যক্ষেত্রের অবলুপ্তি ঘটিয়ে বড় বড় জাতীয় সড়ক, রেলপথ, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ করা হচ্ছে। নিজের প্রয়োজনে বনাঞ্চল বিলুপ্ত করার জন্য পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। শিল্পের ব্যাপক প্রসারের ফলেও বায়ু দূষিত হচ্ছে। স্বচ্ছ বায়ু মানুষ ও জীবকুলের জীবনের অন্যতম উপাদান। বাতাসের মধ্যে যে সকল পদার্থ থাকে, তাদের হঠাৎ বৃদ্ধি বায়ুদূষণের সৃষ্টি করে।

উদ্দেশ্য ঃ

- বর্তমান এককটি পাঠ করে আপনারা জানতে পারবেন–
- বায়ুদূষণ কী, আর কারা কীভাবে বায়ুকে দূষিত করছে
- বহুশ্রুত সবুজঘর প্রভাব প্রকৃতপক্ষে কী, সবুজঘর গ্যাসসমূহ কী, এদের উৎসই বা কী। এই প্রভাব নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহও জানতে পারবেন
- অম্লবৃষ্টি কী ও কেন
- ওজোন স্তর কী, কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, কীভাবে এদের বিনষ্টি ঘটছে এবং এই বিনষ্টি পরিবেশকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে
- ইতিহাসে বিধৃত বায়ুদূষণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা
- বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ

3.1 বায়ুদূষণের উৎসসমূহ

প্রাকৃতিক উৎস ঃ আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে উদ্ভূত ছাই, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসসমূহ; ছত্রাক থেকে ভাইরাস ও সূক্ষ্ম কণা; ভূমিপৃষ্ঠ থেকে দাবানল, ধূলা ও মাটির কণা ইত্যাদি।

অপ্রাকৃতিক উৎস ঃ কলকারখানা ও শিল্পাঞ্চল থেকে উৎপন্ন ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাস; গাড়ি, এরোপ্লেন ও অন্যান্য ইঞ্জিনের ধোঁয়া ও গ্যাস; পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় কণা ও রশ্মি; পৌর আবর্জনা ইত্যাদি।

3.2 প্রধান প্রধান বায়ুদূষক গ্যাসসমূহ এবং তাদের উৎস ও ক্ষতিকারক প্রভাব

3.2.1 কার্বন মনোক্সাইড (CO)

প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় যেমন আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের সময়, বজ্রবিদ্যুৎপাতের সময় কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়। এছাড়া মোটরগাড়ি থেকে, জ্বলন্ত সিগারেট থেকে, জৈব পদার্থের দহনের ফলে নির্গত ধোঁয়ায় প্রচুর কার্বন মনোক্সাইড থাকে। বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত চুল্লী যেমন, লৌহ-ইস্পাত শিল্প, কয়লা শিল্প থেকে কার্বন মনোক্সাইড বায়ুমন্ডলে আসে। প্রধানতঃ শহরাঞ্চল এবং শিল্পাঞ্চলে এই গ্যাসের প্রভাব বেশী দেখা যায়। বাতাসে মোট দূষণকারী পদার্থের 60 শতাংশই হল কার্বন মনোক্সাইড।

ক্ষতিকারক প্রভাব ঃ প্রশ্বাসের সময় কার্বন মনোক্সাইড মানবদেহে প্রবেশ করে এবং রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুস্থিত যৌগ কাবক্সি-হিমোগ্লোবিন উৎপন্ন করে। ফলে রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ ও বহন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বিপাকীয় বৈকল্য দেখা যায়। এতে কোষের কার্যক্ষমতা কমে যায়। সাধারণথঃ বাতাসে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ 10 - 250 ppm হলে মাথা ধরা, দৃষ্টিশক্তিহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ যদি 500 ppm এর বেশী হয়, তাহলে সেই বাতাস গ্রহণ করলে মানুষ ও জীবজন্তুর মৃত্যু হতে পারে।

3.2.2 কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)

কয়লা ও খনিজ তেলের সম্পূর্ণ দহনের ফলে বাতাসে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উৎপত্তি হয়। সবুজ গাছপালা সালোকসংশ্লেষের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে নিজেদের খাদ্য তৈরী করে। কিন্তু বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে গাছপালা কমে যাওয়ায় বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে।

ক্ষতিকারক প্রভাব ঃ বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে, তা সৌরশক্তি শোষণ করে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়িয়ে তোলে। একে গ্রীনহাউস এফেক্ট বা সবুজঘর প্রভাব বলে। বাতাসে CO_2- এর পরিমাণ বেড়ে গেলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমার এবং মাটির আর্দ্রতা লুপ্ত হবার সম্ভাবনা বাড়ে এছাড়া বাতাসে CO_2-এর পরিমাণ বাড়লে সমুদ্রের জলের অম্লতা বেড়ে যায়, ফলে সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের ক্ষতি হয়।

3.2.3 সালফার ডাইঅক্সাইড

জীবাশ্ম জ্বালানী ও উচ্চ সালফারযুক্ত কয়লার দহনে, ধাতু নিষ্কাশনে, মোটরগাড়ির ধোঁয়া থেকে বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইড আসে। এছাড়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় প্রচুর সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।

ক্ষতিকারক প্রভাব ঃ শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় মানুষের শরীরে সালপার ডাইঅক্সাইড প্রবেশ করলে হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি রোগ দেখা যায়।

বায়ুতে সালফার ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে শ্বাসনালীতে জ্বালার সৃষ্টি করে এবং ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া গাছপালা ও উদ্ভিদের পক্ষে অল্প পরিমাণে সালফার ডাইঅক্সাইড সহনযোগ্য কিন্তু বায়ুমন্ডলে এর পরিমাণ বাড়লে জলের অম্লতা বৃদ্ধি পায়, ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হ্রাস পায়। বেশীদিন ধরে সালফার ডাইঅক্সাইড পরিমন্ডলে থাকলে উদ্ভিদের ক্লোরোফিল নষ্ট হয়, ফলে উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়।

উদ্ভিদ ও প্রাণী ছাড়া সালফাল ডাইঅক্সাইড ইট, কাঠ, লোহা, সিমেন্টের কাঠামো, মূর্তি এবং প্রাকৃতিক তন্তুর ক্ষতি করে। পৃথিবীর নানা অঞ্চলে বহু ঐতিহ্যবাহী অমূল্য মূর্তির নিদর্শন যেমন ভারতের তাজমহল এই গ্যাসের ক্ষতিকারক প্রভাবের ফলে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে।

3.2.4 নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_x)

নাইট্রোজেনের নানা অক্সাইড যেমন নাইট্রিক অক্সাইড (NO), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) প্রভৃতি অন্যতম দূষণকারী পদার্থ। এইগুলির মধ্যে নাইট্রিক অক্সাইডই হল প্রধান দূষক। কয়লা, তেল, গ্যাসোলিন প্রভৃতির দহনের ফলে নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি সৃষ্টি হয়। এছাড়া বায়ুমন্ডলের উচ্চ অংশে তড়িৎ মোক্ষণে, নাইট্রোজেন যৌগ দহনে, আগ্নেয়গিরি থেকে, নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন শিল্প থেকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

ক্ষতিকারক প্রভাব ঃ বাতাসে নাইট্রিক অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসে ক্যান্সার প্রভৃতি সমস্যার সৃষ্টি হয়। নাইট্রিক অক্সাইড রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রক্তের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা হ্রাস করে।

বেশি গাড়ত্বের নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড পাতার কোষ ধ্বংস করে, সালোকসংশ্লেষের হার কমায় এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি রোধ করে।

3.2.5 বস্তুকণা

প্রাকৃতিক উৎস যেমন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, টর্নেডো, সাইক্লোন দ্বারা পৃথিবী পৃষ্ঠের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বাতাসে আসে। এছাড়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, ধাতু পরিশোধন কেন্দ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে এরূপ কণিকা উৎপন্ন হয়। কৃষি ক্ষেত্রে ফসলের বর্জ্য পদার্থ দহনের ফলেও প্রচুর কণিকা বায়ুতে আসে। গ্যাসোলিনের দহনে উৎপন্ন টেট্রাইথাইল লেড, কয়লার দহনে উৎপন্ন সিলিকা, অ্যালুমিনা, কার্বন প্রভৃতি কণা বাতাসে দূষণ সৃষ্টি করে।

ক্ষতিকারক প্রভাব ঃ বাতাসে উপস্থিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে ফুসফুস কোষের ক্ষতিসাধন করে। মোটরগাড়ির ধোঁয়া থেকে নির্গত সীসার কণা শ্বাসনালীর মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে মস্তিষ্কে ব্যাপক ক্ষতি করে এবং স্নায়বিক বৈকল্য দেখা যায়। সীসার কণা রক্তের লোহিত কণিকার উৎপাদন কমায়। শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় সিলিকা মানবদেহে প্রবেশ করলে দীর্ঘস্থায়ী সিলিকোসিস রোগ হয়।

নানাপ্রকার ধাতব কণা বৃষ্টির মাধ্যমে মাটিতে জমা হয় এবং মাটির উর্বরতা নষ্ট করে। ধুলি, ধোঁয়াশা প্রভৃতি কণা

পাতার পত্ররন্ধ্র বন্ধ করে উদ্ভিদের CO_2 গ্রহণ ক্ষমতা হ্রাস করে ফলে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি কমে যায়।

3.2.6 বিষাক্ত ভারী উপাদান

জীবের পক্ষে ক্ষতিকারক ভারী উপাদানগুলি হল পারদ, সীসা, আর্সেনিক, ক্যাডমিয়ার প্রভৃতি। খননকার্যের মাধ্যমে বা অন্যান্য উপাদান পরিশোধনের মাধ্যমে এগুলির সৃষ্টি হয়।

ক্ষতিকারক প্রভাব ঃ সামান্য পরিমাণে পারদবাষ্প প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করলে স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি হয়। আর্সেনিক গ্রহণ দীর্ঘস্থায়ী ক্যান্সার ও নানাধরনের চর্মরোগের সৃষ্টি করে।

অনুশীলনী– 1

(a) বায়ুর তিনটি দূষণকারী উপাদানের নাম করুন।

(b) বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে বায়ুদূষণের সংজ্ঞা দিন।

(c) কার্বন মনোক্সাইড কীভাবে মানুষের ক্ষতি করে?

(d) নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড থেকে বৃষ্টিতে কী গ্যাস সঞ্চারিত হয়? বিক্রিয়া দিন।

(e) বাতাসে থাকতে পারে ও ক্যান্সার ঘটায়, এমন বস্তুকণার নাম করুন।

(f) সিলিকোসিস্ রোগ কীসের থেকে ঘটে?

3.3 সবুজঘর বা গ্রীনহাউস প্রভাব

3.3.1 সবুজঘর বা গ্রীনহাউস কী?

সবুজঘর হল কাচের তৈরী একটি আবদ্ধ ঘর যার মধ্যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সবুজ গাছপালার চাষ করা হয়। এই ঘরের কাচের মধ্য দিয়ে সূর্যের দৃশ্য আলোকরশ্মি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে উদ্ভিদ ও মাটিকে উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত মাটি দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিলোহিত রশ্মি বিকিরণ করে, কিন্তু এই রশ্মি কাচ ভেদ করে বাইরে আসতে পারে না। ফলে ঘরের মধ্যের তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রা থেকে বেশী থাকে। এই সবুজঘরের সাথে প্রকৃতির সবুজ ঘরের তুলনা করা হয়।

সবুজঘর প্রভাব বা প্রকৃতির সবুজ কাকে বলে? বায়ুমন্ডলে উপস্থিত CO_2, CO, N_2 প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণের উপর পৃথিবীর তাপমাত্রার ভারসাম্য নির্ভর করে। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে যে CO_2, জলীয় বাষ্পের স্তর আছে তা গ্রীনহাউসের কাঁচের মতো আচরণ করে। মহাশূন্য থেকে আগত সূর্যরশ্মি পৃথিবী-পৃষ্ঠে এসে পড়ে কিন্তু পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত রশ্মি বায়ুমন্ডলে উপস্থিত CO2, জলীয় বাষ্প দ্বারা শোষিত হয় ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ে। এই ঘটনাকে সবুজঘর প্রভাব বলে।

3.3.2 সবুজঘরের প্রভাবগুলি কী কী?

তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঃ কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাসসমূহ পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত সূর্যের অবলোহিত রশ্মি মহাশূন্যে বিকীর্ণ হতে দেয় না। ফলে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি ঃ পৃথিবীর তাপমাত্রা 2-4^{0}C বৃদ্ধি পেলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করবে। ফলে সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং সমুদ্রতীরবর্তী দেশ জলমগ্ন হবে।

জলচক্রের পরিবর্তন ঃ পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলের বাষ্পীভবন বৃদ্ধি পাবে এবং পৃথিবীর মাটি শুকিয়ে যাবে। এর ফলে গরমকালে গরম বাড়বে এবং বর্ষাকালে বৃষ্টি ও বন্যা বেশী হবে। এইভাবে পৃথিবীর জলচক্রের পরিবর্তন হবে।

স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ঃ পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়লে বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু প্রকৃতির প্রাদুর্ভাব বাড়বে। হাঁপানি ও অ্যালার্জি জাতীয় রোগ বাড়বে।

বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব ঃ উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের জীবনধারণেত্র জন্য পৃথিবীর তাপমাত্রার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সবুজঘরের প্রভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল ধ্বংস হয়ে যাবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে কৃষিপণ্যের উৎপাদন হ্রাস পাবে, জৈবিক উপাদানও হ্রাস পাবে।

3.3.3 সবুজঘর গ্যাসসমূহ এবং তাদের উৎস

কার্বন ডাইঅক্সাইড ঃ সবুজঘর প্রভাবের জন্য কার্বন ডাই অক্সাইডের ভূমিকা সর্বাধিক। বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়ার ফলে বায়ুমন্ডলে CO_2- এর পরিমাণ দিনে দিনে বাড়ছে কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতির দহনের ফলে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়। মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি প্রভৃতিতে ডিজেল এবং গ্যাসোলিনের দহনের ফলেও প্রচুর পরিমাণে CO_2 তৈরী হয়।

মিথেন ঃ পৃথিবী-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য CO_2- এর পর মিথেন (CH_4)- এর স্থান। মিথেন গ্যাসের প্রধান উৎস হল গবাদি পশুপালন কেন্দ্র। ধানক্ষেত, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর বর্জ্যপদার্থ থেকে বায়ুমন্ডলে নিথেন গ্যাস আসে। তেল এবং কয়লাখনি থেকেও মিথেন গ্যাস নির্গত হয়।

নাইট্রাস অক্সাইড ঃ নাইট্রোজেন ঘটিত সার, দূষিত জল বিশুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়া থেকে, গাছপালার দহনে, কলকারখানার ধোঁয়া থেকে বাতাসে নাইট্রাস অক্সাইড আসে।

উদ্বায়ী জৈব রাসায়নিক পদার্থ ঃ রঙশিল্প, শুষ্ক ধৌতায়ন প্রক্রিয়া, প্রসাধনী শিল্প থেকে প্রচুর পরিমাণে জৈব রাসায়নিক পদার্থ তৈরী হয়।

3.3.4 সবুজঘর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ

কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জ্বালানীর ব্যবহার কমিয়ে সৌরশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে সবুজঘর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ব্যাপক পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ প্রয়োজন কারণ সবুজ গাছপালা সালোকসংশ্লেষের সময় CO^2 গ্যাস গ্রহণ করে, ফলে CO_2-এর সবুজঘর প্রভাব অনেকটা কমে।

3.4 অম্লবৃষ্টি

বৃষ্টির জলে সালফিউরিক, নাইট্রিক, হাইড্রোক্লোরিক প্রভৃতি অ্যাসিড মিশ্রিত থাকলে তাকে অম্লবৃষ্টি বলে। বাতাসে উপস্থিত SO_2, NO_2, প্রভৃতি গ্যাস জলের সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরাস অ্যাসিড (H_2SO_3), সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4), নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3), নাইট্রাস অ্যাসিড (HNO_2) প্রভৃতি তৈরী করে। এই সকল অ্যাসিড বৃষ্টির সাথে মাটিতে এসে পড়ে।

3.4.1 অম্লবৃষ্টির উৎস

সালফার ডাইঅক্সাইড ঃ সালফার ঘটিত আকরিকের বায়ুতে তাপ জারণের ফলে, সালফার ঘটিত খনিজ তেলের দহনের ফলে প্রচুর পরিমাণে SO_2 উৎপন্ন হয়। বাতাসের O_2-এর সাথে SO_2-বিক্রিয়ায় SO_3 উৎপন্ন হয়, যাহা বৃষ্টির জলের সাথে মিশে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ঃ বিদ্যুৎক্ষরণের সময় বায়ুতে উপস্থিত N_2 এবং O_2 পরস্পর যুক্ত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড NO উৎ পন্ন হয়। উৎপন্ন NO বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড তৈরী করে।

নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন শিল্পেও প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং বাতাসে মেশে। বৃষ্টির জলের সাথে এর বিক্রিয়ায় নাইট্রিক অ্যাসিড ও নাইট্রাস অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবং তা বৃষ্টির জলের সাথে মাটিতে এসে পড়ে।

3.4.2 অম্ল বৃষ্টির প্রভাব

জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর প্রভাব ঃ জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী জলের নির্দিষ্ট pH মানের (এই pH-এর মান 5.6) উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। অম্লবৃষ্টির ফলে পুকুর, নদী প্রভৃতি জলের pH-এর মান কমে যায়। এর ফলে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের উৎপাদন কমে। অম্লবৃষ্টির প্রভাবে মাটির আম্লিকতা বাড়ে ফলে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ব্যাঘাত ঘটে এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি কমে যায়। অম্লবৃষ্টির ফলে নদী তীরবর্তী মাটিতে উপস্থিত অ্যালুমিনিয়াম, তামা, পারদ, সীসাঘটিত যৌগ দ্রবীভূত হয়ে নদীতে এসে পড়ে এবং নদীর জলকে বিষাক্ত করে। এই বিষাক্ত জল গ্রহণ করে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনহানি ঘটে। নদীর জলের অম্লত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের জৈব রাসায়নিক বিভাজন কমে যায় ফলে মাছের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন, ফসফরাস প্রভৃতির পরিমাণ কমে যায়।

মাটির উপর প্রভাব ঃ মাটিতে অম্লের পরিমাণ বাড়ার ফলে উদ্ভিদের শিকড়ে উপস্থিত নাইট্রোজেন আত্তীকারক জীবাণুসমূহের কর্মক্ষমতা কমে যায় ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়, মাটির মধ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রাণী ও জীবাণুরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অম্লবৃষ্টির ফলে মাটি থেকে প্রয়োজনীয় ধাতু Mg, K প্রভৃতি দূরীভূত হয় ও দূষণকারী ধাতু Al, Pb, Cu জমা হয়, ফলে উদ্ভিদের মৃত্যুও ঘটে থাকে।

মানুষের উপর প্রভাব ঃ অম্লবৃষ্টির ফলে মাটিতে উপস্থিত দূষিত কণিকা জলবাহিত হয়ে নদীর জলে মেশে। এই বিষাক্ত জল গ্রহণ করে পেটের অসুখ (বিশেষ করে আন্ত্রিক ক্ষত), মানসিক ভারসাম্যহীনতা, হৃৎপিন্ড সম্বন্ধীয় নানা জটিল রোগের সৃষ্টি হয়। অম্লবৃষ্টির ফলে মানুষের ত্বক ও চুলের ক্ষতি হয়।

3.4.3 অম্লবৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ

অম্লবৃষ্টি সৃষ্টির প্রধান উৎস যেমন SO_2, NO_2 প্রভৃতি গ্যাসের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। কম সালফারযুক্ত জ্বালানী তেল ব্যবহার করে বা বিকল্প শক্তি যেমন সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি প্রভৃতি ব্যবহার করে SO_2 -এর পরিমাণ কমানো যায়। যে সকল শিল্পে প্রচুর পরিমাণে SO_2, NO_2 প্রভৃতি গ্যাস উৎপন্ন হয়, সেখানে উৎপন্ন গ্যাস ক্ষারীয় দ্রবণ বা প্রলম্বন যেমন KOH, CaO, MgO প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করালে আম্লিক গ্যাসগুলি শোষিত হয়ে যায়। ফলে বায়ুতে SO_2, NO_2 -এর পরিমাণ কমে।

3.5 ধোঁয়াশা

জীবাশ্ম জ্বালানীর দহনের ফলে, গাড়ির ধোঁয়া ও অন্যান্য প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন নাইট্রোজেন অক্সাইড, CO, অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনসমূহ প্রভৃতি সূর্যালোকের প্রভাবে আলোক-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে। ধোঁয়াশার সঙ্গে সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ওজোন প্রভৃতি বায়ুদূষণকারী গ্যাস এবং সীসা, তামার গুঁড়ো, ধুলিকণা প্রভৃতি কঠিন ও তরল কণিকা মিশ্রিত থাকলে ধোঁয়াশা বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

3.5.1 কেন ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 10 কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুতে CO_2, SO_2, NO_2 প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণ বেশী থাকলে সূর্যের আলো ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হওয়ার আগেই এই সকল গ্যাস দ্বারা শোষিত হয়। ফলে উষ্ণতার বিপরীতক্রম হয় অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ ঠান্ডা থাকে এবং উপরের বায়ুস্তর গরম থাকে। এইজন্য ভূ- পৃষ্ঠে সৃষ্ট ধোঁয়া, ধূলিকণা প্রভৃতি উপরে উঠতে পারে না। এই ফলে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুতে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়।

3.5.2 ধোঁয়াশার প্রকারভেদ

দূষিত গ্যাস ও অন্যান্য ভাসমান কণার উপস্থিতির উপর ধোঁয়াশাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

আলো-রাসায়নিক ধোঁয়াশা ঃ বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে NO_2, হাইড্রোকার্বন উপস্থিত থাকলে সূর্যের আলোর প্রভাবে ওজোন এবং জৈব পার-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই ওজোন, জৈব পার-অক্সাইড, ধূলিকণা প্রভৃতি বাতাসকে বিষাক্ত করে তোলে।

সালফিউরাস ধোঁয়াশা ঃ বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইড, সালফিউরিক অ্যাসিডকণা প্রভৃতির সঙ্গে স্থির বাতাস, তাপমাত্রার বিপরীতক্রম ও ঘন কুয়াশা থাকলে সালফিউরাস ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়।

ধূলিকণা ধোঁয়াশা ঃ খনিজ তেলের দহন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন 0 - 1 মাইক্রন ব্যাসের ছোট ছোট ধূলিকণা যে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে, তাকে ধূলিকণা ধোঁয়াশা বলে। সাধারণতঃ শীতকালে এরকম ধোঁয়াশা দেখা যায়।

3.5.3 ধোঁয়াশার প্রভাব

মানুষের উপর ঃ ধোঁয়াশার উপস্থিত O_3 গ্যাস সর্দিকাশি ও ব্রঙ্কাইটিস্ বাড়ায়। ফুসফুসের কর্মদক্ষতা নষ্ট করে। ধোঁয়াশার জারক পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকলে মানুষের বুকের অসুখ দেখা যায়।

উদ্ভিদের উপর ঃ ধোঁয়াশা গাছের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ব্যাহত করে, পাতার উপর সাদা দাগের সৃষ্টি করে, শস্য বিনষ্ট করে।

3.6 ওজোন স্তর

ওজোন হল আঁশটে গন্ধযুক্ত হালকা নীল বর্ণের একটি গ্যাস। এটি অক্সিজেনের একটি রূপভেদ। বাতাসের সকল উচ্চতায় কমবেশি পরিমাণ ওজোন বর্তমান। সমগ্র বায়ুমন্ডলের 90 শতাংশ ওজোন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নিম্নাঞ্চল অর্থাৎ 20-35 কিলোমিটারের মধ্যে থাকে। এই স্তরকে ওজোনোস্ফিয়ার বলে।

3.6.1 বায়ুমন্ডলে ওজোন স্তরের সৃষ্টি

আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমন্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে ওজোন উৎপন্ন হয়। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে বায়ুর অক্সিজেন সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত হয়।

এই অক্সিজেন পরমাণু আণবিক অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে ওজোনে পরিণত হয়।

2 নং বিক্রিয়ায় O_2 বা N_2 থাকা প্রয়োজন, এটি বিক্রিয়াজাত শক্তি শোষণ করে এবং ওজোনকে স্থায়ী করে। এভাবে উৎপন্ন ওজোন সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে ধ্বংস হয়ে যায়।

বায়ুমন্ডলে এইভাবে ওজোন সর্বক্ষণ তৈরী হচ্ছে এবং বিয়োজিত হচ্ছে, ফলে ওজোনের সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। এই ওজোন স্তরের প্রধান ভূমিকা হল মহাশূন্য থেকে আগত ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করা। এখন সাম্যাবস্থায় থাকা ওজোনের পরিমাণ কমে গেলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি ভূ-পৃষ্ঠে চলে আসবে এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন নষ্ট হবে।

3.6.2 ওজোন স্তরের বিনষ্টি

ক্লোরিন তত্ত্ব ঃ ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন শীতকারক বস্তু হিসাবে রেফ্রিজারেটারে, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রে এবং এরোসোল তৈরীতে ব্যবহার করা হয়। কার্বন, ফ্লুওরিন এবং ক্লোরিন-ঘটিত যৌগগুলিকে ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন বলে। এই যৌগ সমূহ সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির দ্বারা বিনষ্ট হয়ে ক্লোরিন পরমাণু (মুক্ত মূলক) উৎপন্ন করে। এই ক্লোরিন পরমাণু ওজোন অণুকে ভাঙতে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে।

মুক্ত Cl পরমাণু পুনরায় ওজোনকে অক্সিজেন অণুতে পরিবর্তিত করে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং একটি ক্লোরিন পরমাণু নিষ্ক্রিয় হওয়ার আগে হাজার হাজার ওজোন অণুকে ধ্বংস করে।

নাইট্রোজেন অক্সাইড তত্ত্ব ঃ কৃষিকাজে রাসায়নিক সার হিসাবে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ ব্যবহৃত হয়। প্রচুর রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে, জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন নাইট্রাস অক্সাইড বাতাসে নাইট্রোজেন এবং নাইট্রিক অক্সাইডে বিশ্লিষ্ট হয়। সার ব্যতীত বাতাসে নাইট্রেত্রাজেন অক্সাইডসমূহের উৎস হল অতিস্রব বিমানসমূহ, এই বিমানে জ্বালানীর দহনের ফলে প্রচুর পরিমাণ NO_x স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ছড়িয়ে পড়ে। এই নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ ওজোনকে ধ্বংস করে।

NO_3, NO_2 প্রভৃতি মূলক অত্যন্ত সক্রিয় এবং এদের অর্ধায়ুকাল দীর্ঘ হওয়ার ফলে ওজোন বিশ্লিষ্ট হওয়ার হার বৃদ্ধি পায়। এই ক্রিয়া অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চলতে থাকে এবং ওজোন অণুর সংখ্যা কমতে থাকে।

3.6.3 ওজোন স্তর ক্ষয়ের প্রভাব

মানুষের উপর ঃ ওজোন স্তরে ওজোনের পরিমাণ কমে গেলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি ভূপৃষ্ঠে আপতিত হবে, ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়বে এবং ত্বকের ক্যানসারও বাড়বে।

সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিতে শরীর বেশীদিন উন্মুক্ত থাকলে মানুষের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে, শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে।

উদ্ভিদের উপর ঃ সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠে আপতিত হওয়ার জন্য উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া কমবে

এবং শস্যের উৎপাদন কম হবে। ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য মাটির আর্দ্রতা কমবে, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন কমবে।

3.6.4 ওজোন স্তর রক্ষা

ওজোন স্তর ধ্বংসকারী ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনের ব্যবহার কমিয়ে ওজোন স্তর রক্ষা করা যায়। বর্তমানে ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনের পরিবর্তে ফ্লুওরোকার্বন ব্যবহৃত হচ্ছে কারণ এদের থেকে ক্লোরিন মূলক নির্গত হবার সম্ভাবনা নেই আর তাই ওজোন স্তরের বিনষ্টিও হ্রাস পাবে।

3.7 বায়ুদূষণের কয়েকটি ঘটনা

1930 সালের ডিসেম্বর মাসে বেলজিয়ামের মিউস্ উপত্যকায় বিষাক্ত সালফিউরাস ধোঁয়াশায় 63 জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং প্রায় 600 মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

1952 সালের ডিসেম্বর মাসে লন্ডনে ধোঁয়াশার প্রভাবে প্রায় 4000 লোকের মৃত্যু হয়।

1984 সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে মধ্যপ্রদেশের ভোপাল শহরে ইউনিয়ন কার্বাইডের কীটনাশক তৈরীর কারখানা থেকে বিষাক্ত গ্যাস মিথাইল আইসোসায়ানেটের নির্গমনের ফলে প্রায় পাঁচ হাজারের বেশী লোকের মৃত্যু হয়।

1995 সালে গরমকালে চিকাগো শহরে সবুজঘরের প্রভাবে প্রায় 465 জন মানুষ প্রাণ হারান।

1986 সালে অম্লবৃষ্টির ফলে ইউরোপের প্রায় 30 হাজার মিলিয়ন হেক্টর বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

3.8 বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার প্রধান উপায় হল দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থগুলির ব্যবহার কমানো এবং তাদের উৎপাদন রোধ করা। বড় বড় শহরে যেখানে অসংখ্য যানবাহন চলাচল করে এবং প্রচুর কলকারখানা আছে সেখানে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সবচেয়ে জরুরী। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার কয়েকটি পদ্ধতি নিচে আলোচনা করা হল।

যানবাহন থেকে নির্গত দূষিত গ্যাসসমূহকে প্রথমে উঁচু তাপমাত্রায় প্লাটিনাম, প্যালাডিয়াম প্রভৃতি অনুঘটকের মধ্য দিয়ে পাঠাতে হবে। এর ফলে গ্যাস মিশ্রণে উপস্থিত কার্বন মনোক্সাইডের দ্বারা নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ বিজারিত হয়ে নাইট্রোজেন ও অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয়। এরপর গ্যাসসমূহকে অতিরিক্ত বাতাসের উপস্থিতিতে নিকেল, আয়রণ বা ম্যাঙ্গানীজ-এর অক্সাইডের মধ্য দিয়ে পাঠাতে হবে। এর ফলে গ্যাস মিশ্রণে উপস্থিত কার্বন মনোক্সাইড এবং অন্যান্য হাইড্রোকার্বনগুলো কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়ে বাতাসে মিশে যাবে।

সালফার ডাইঅক্সাইডের দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রধান উপায় হল সালফারমুক্ত জ্বালানী ব্যবহার করা। এছাড়া জ্বালানীর দহনের ফলে উৎপন্ন গ্যাসকে সক্রিয় চারকোল, তরল অ্যামোনিয়া, চুনজলের দ্রবনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করিয়েও সালফার ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য দূষিত গ্যাস শোষণ করা যায়।

গৃহস্থালী ও কলকারখানায় কয়লা, কাঠ প্রভৃতি জ্বালানীর ব্যবহারের পরিবর্তে তড়িৎশক্তি, সৌরশক্তি ইত্যাদির ব্যবহার বাড়িয়ে দূষণ রোধ করা যায়।

প্রচুর পরিমানে বৃক্ষ রোপণ করেও বায়ুদূষণ রোধ করা যায়। কারণ উদ্ভিদ বায়ুতে উপস্থিত হাইড্রোজেন সালফাইড,

নাইট্রিক অ্যাসিডবাষ্প, কার্বনডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং বাতাসে অক্সিজেন সরবরাহ করে।

প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে পরমাণু চুল্লীর আবর্জনা নিয়ন্ত্রণ ফলপ্রসূ হয়েছে। এর ফলে বাতাসে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব কমবে।

প্রতিবছর 4 ঠা জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে। বেতার, দূরদর্শন এবং সংবাদপত্রে পরিবেশদূষণ সম্পর্কে সতর্কবার্তা প্রচারিত হচ্ছে। মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবনধারাকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক করতে হলে দূষণ মুক্তির কোনো বিকল্প নেই। এই কথাটি ভুললে পৃথিবী একদিন বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে।

আবার এটাও ঠিক যে দূষণ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, তাই একে সম্পূর্ণ বন্ধ করা অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, একে ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনার চেষ্টা করা প্রয়োজন। পৃথিবী জুড়ে সে চেষ্টা হচ্ছে, এবং আমাদের অস্তিত্বের স্বার্থে সে চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত।

অনুশীলনী ঃ – ২

(a) তিনটি গ্রীনহাউস গ্যাসের নাম করুন।

(b) ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনের পরিবর্তে আজকাল কোন্ রাসায়নিক ব্যবহৃত হয়? কেন?

(c) PAN-এর পুরো নাম কী?

(d) তাজমহলের বাইরের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হচ্ছে কীভাবে?

(e) বায়ুমন্ডলে ওজোন কীভাবে উৎপন্ন হয়?

3.9 সারাংশ

- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের মধ্যে ক্ষতিকারক পদার্থসমূহের ঘন-সন্নিবেশ যখন মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিকের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে, তখন তাকে বায়ুদূষণ বলে।
- সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে দূষণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই দূষণ একেবারে বন্ধ করা সম্ভব নয়, তবে একে ন্যূনতম মানে রাখার চেষ্টা জীবমন্ডলের অস্তিত্বের স্বার্থেই প্রয়োজন।
- বায়ুদূষণের উৎসসমূহ হল ঃ (i) প্রাকৃতিক-- আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ছত্রাকসমূহ, দাবানল, ধূলা ও মাটির কণা; (ii) অপ্রাকৃতিক--কলকারখানা, ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাসসমূহ, তেজস্ক্রিয় কণা ও রশ্মি, পৌর আবর্জনা ইত্যাদি।
- বায়ুমন্ডলের গ্যাসীয় দূষণকারী পদার্থের 60% ই কার্বন মনোক্সাইড। এটি রক্তের সঙ্গে সুস্থিত জটিল যৌগ উৎপন্ন করে। তাই রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ ও পরিবহণ ক্ষমতা কমে যায়।
- কার্বন ডাইঅক্সাইড আসে প্রধানতঃ দহন ও শ্বসনের ফলে। এর জন্য সবুজঘর প্রভাবে পরিবেশের তাপমাত্রা বাড়ে ও জলের অম্লতা বাড়ে।
- সালফার ডাইঅক্সাইড আসে সালফারযুক্ত জ্বালানীর দহনে ও অগ্নুৎপাতের ফলে। এর প্রভাবে ফুসফুসের রোগ এমন কি ক্যান্সারও হতে পারে। অম্লবৃষ্টি সৃষ্টিতেও এর ভূমিকা আছে।

- নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ আসে বিভিন্ন জ্বালানীর দহনে, শিল্পক্ষেত্র থেকে বায়ুতে তড়িৎ মোক্ষণের ফলে এর প্রভাবে ফুসফুসের রোগ ও অম্লবৃষ্টি ঘটে, উদ্ভিদের বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়।
- ঝড়, অগ্নুৎপাত, শিল্পক্ষেত্র, খনি ইত্যাদি থেকে বস্তুকণা বায়ুমন্ডলে আসে। এতে চর্মরোগ, স্নায়বিক রোগ ও ফুসফুসের ক্ষতি হয়, অনেক সময় এই ক্ষতি প্রাণান্তকর হয়ে ওঠে।
- সবুজঘর প্রভাব প্রাকৃতিক বায়ুদূষণের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাতাসে CO_2, CO, N_2, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি অন্তরক পদার্থের ঘটিত বেষ্টনী এর জন্য দায়ী। এর প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, জলচক্রের পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে জীবমন্ডলী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে এ সমস্যার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।
- অম্লবৃষ্টি ঘটে বৃষ্টির জলে অম্ল (H_2SO_4, HNO_3, HCL ইত্যাদি)-র উপস্থিতিতে। এর প্রভাবে শস্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে, সৌধাবলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, বাস্তুতন্ত্রের ধর্মের পরিবর্তন হয়, মানুষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।
- জীবাশ্ম জ্বালানী, গাড়ির ধোঁয়া ও বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে সূর্যালোকের প্রভাবে আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়। ধূলিকণা ও সালফার যৌগসমূহও এতে অংশগ্রহণ করে। এর প্রভাবে প্রাণীদের নানারকম রোগ হয়, উদ্ভিদও রোগগ্রস্থ হয় এবং শস্যহানি ঘটে।
- বায়ুমন্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে সূর্যের থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে অক্সিজেন তার রূপভেদ ওজোনে পরিণত হয়। এই ওজোন স্তর অতিবেগুনি রশ্মি প্রতিহত করে। শীতক গ্যাস বা এরোসোলের অন্যতম উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনের বিয়োজন থেকে উদ্ভুত ক্লোরিন মুক্ত মূলক ওজোনকে ক্ষয় করে ওজোন স্তরে গর্ত করে ফেলে। এর মধ্য দিয়ে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীপৃষ্ঠে অবাধে প্রবেশ করে বাস্তুতন্ত্রের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পেলে। ক্লোরিনঘটিত যৌগের ব্যবহার বন্ধ করে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।
- বায়ুদূষণের ফলে একাধিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকালয়ের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে 1930 সালে বেলজিয়ামের মিউস্ উপত্যকায়, 1952 সালে লন্ডনে, 1984 - তে ভারতবর্ষের ভোপালে, 1986-তে ইউরোপের বনাঞ্চলে ও 1995 এ অ্যামেরিকার চিকাগো শহরে উল্লেখ্য ব্যাপক ক্ষতির ইতিহাস হয়ে আছে।
- সারা পৃথিবী জুড়ে বায়ুদূষণ কমাতে প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছেন বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদ্‌রা। ভারতবর্ষও পিছিয়ে নেই।

একক 4 ❑ প্রসাধন সামগ্রী এবং রঞ্জক পদার্থ (Cosmetics and Dyes)

গঠন

4.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

4.1 প্রসাধনী দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ

4.2 প্রসাধনী সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা

4.2.1 ট্যালকম্ পাউডার

4.2.2 ট্যালকম্ পাউডারের উপাদানিক গঠন

4.3 ক্রীম

4.3.1 উপাদানিক গঠন

4.4 চুলরঞ্জিনকারক পদার্থ

4.4.1 অস্থায়ী রঞ্জক

4.4.2 অর্ধস্থায়ী রঞ্জক

4.4.3 স্থায়ী রঞ্জক

4.5 হেয়ার স্প্রে

4.5.1 উপাদানসমূহ

4.5.2 হেয়ার স্প্রে-র বিষক্রিয়া

4.5.3 মল্যায়ন

4.6 ওষ্ঠরঞ্জক

4.6.1 ওষ্ঠরঞ্জকের গুণাবলী

4.6.2 ওষ্ঠরঞ্জক তৈরীর উপাদানসমূহ

4.6.3 ওষ্ঠরঞ্জকের সংযুতি

4.7 সারাংশ

4.0 প্রস্তাবনা

কসমেটিকস্ কথাটির উৎপত্তি Greek শব্দ 'Kosmetikos' থেকে। যার অভিধানগত অর্থ 'সাজসজ্জায় দক্ষ'। মানবসভ্যতার সৃষ্টির সময় থেকেই মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনে নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে আসছে, কিন্তু সেগুলির প্রকৃতি ও উপকরণ সম্বন্ধে তাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। প্রসাধন সামগ্রীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। প্রসাধন দ্রব্যের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে ধারণা থাকলে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে মিশরের রমণীরা চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চোখের পাতায় নানারকম অলংকরণ করতেন। পারস্য এবং রোমানরাও নিজেদের দেহের রং ফর্সা করিবার জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে (যেমন হলুদ, চন্দন) প্রাপ্ত নির্যাস মাখতেন এবং চোখ কালো করার জন্য ভূষাকালি ব্যবহার করতেন। প্রাচীনকালে চীন ও গ্রীসের মেয়েরাও প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের কৌশল জানতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে হিন্দু রমণীরাও সিঁদুর ও মোম মিশ্রিত করিয়া মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতেন। ত্বক পরিষ্কারের জন্য এখনও দুধের সর, ময়দা, ব্যসন ইত্যাদি নানা উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে সামপ্রতিককালে সাবান আর জলের সাহায্যে ত্বক পরিষ্কার করাটা সবচেয়ে জনপ্রিয় পন্থা।

বস্তুতপক্ষে আমরা আমাদের দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এবং স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরকে আকর্ষণ করার জন্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে যে সমস্ত পদার্থ ত্বক চর্চায় ব্যবহার করে থাকি তাদের প্রসাধনী দ্রব্য বা কমমেটিক্শ বলা হয়।

উদ্দেশ্য ঃ এই এককটি পাঠ করার পর আপনি যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হবেন এবং নিজের হাতে কিছু করার জন্য চেষ্টা করতে পারবেন সেগুলি হল–

প্রসাধন সামগ্রী বলতে কি বোঝায় এবং এগুলির শ্রেণীবিভাগ।

ট্যালকম্ পাউডারের উপাদানগুলি কি কি হতে পারে।

আমরা যে ক্রীম ব্যবহার করি সেগুলির রাসায়নিক প্রকৃতি কেমন এবং কি কি পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

চুলরঙীনকারক পদার্থ কতরকম হতে পারে। স্থায়ী চুলরঞ্জক প্রস্তুতির সময় কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

ওষ্ঠরঞ্জক পদার্থের গুণাবলী কি কি, এদের তৈরি করার জন্য কি ধরনের উপাদান প্রয়োজন এবং সংযুক্তি সম্বন্ধে ধারণা।

4.1 প্রসাধনী দ্রব্যের শ্রেণিবিভাগ

ব্যবহারের ভিত্তিতে প্রসাধনী দ্রব্যসমূহকে বিভিন্ন ভাগ করা যায়। যেমন–

1. ইমালসন হিসাবে– ক্রীম বা লোশন
2. পাউডার হিসাবে– ফেস পাউডার, ট্যালকম্ পাউডার
3. প্রলম্বিত মিশ্রণ হিসাবে– পাউডারকে কোন উপযুক্ত তরলে মিশ্রিত করে
4. কাঠ বা স্টীক হিসাবে– লিপিস্টিক, কাজল

4.2 প্রসাধন সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা

4.2.1 ট্যালকম্ পাউডার

ট্যলকম্ পাউডারের প্রধান কাজ হল ত্বকের মধ্যে অবশিষ্ট জল বা ঘাম শোষণ করা। যাদের ত্বক খুব তৈলাক্ত বা সুক্ষ্ম তাদের পক্ষে ট্যালকম্ পাউডার ব্যবহার করলে ত্বকের মসৃণতা ফিরে আসে এবং ত্বক স্বাভাবিক হয়ে উঠে। ট্যালকম্ পাউডারে সুগন্ধি (এসেনসিয়াল তেল) মিশ্রিত করা থাকে বলে দেহমনে সতেজ ভাব নিয়ে আসে, ইহার ব্যবহারের শরীরে স্নিগ্ধ ও শীতল অনুভূতির সৃষ্টি হয়, কারণ ট্যালকমের সুক্ষ্ম কণাগুলির পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বেশী হওয়ার জন্য পৃষ্ঠতল থেকে তাপ বিকিরিত হয় বলে মনে করা হয়।

4.2.2 ট্যালকম্ পাউডারের উপাদানিক গঠন

ট্যালকম্ পাউডারের মূল উপাদান ট্যালকের খুব সুক্ষ্ম কণা, ইহা মূলতঃ ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট, ট্যালক্ খুব নরম ও সাবানের মত পিচ্ছল বলে ইহাকে 'সোপষ্টোন' বলে। ত্বকে আটকে রাখার জন্য পাউডারের সহিত ধাতব স্টিয়ারেট মেশানো হয়। ট্যালকম্ পাউডারের নমুনা উপাদানিক গঠন নিম্নরূপ।

1. টালক্—অতিরিক্ত জল বা ঘাম শোষণ করে।
2. বোরিক অ্যাসিড—ত্বকের উপর অ্যাসিড বা ক্ষারের সমতা বজায় রাখে।
3. জিঙ্ক অক্সাইড—সাদা আভা সৃষ্টির জন্য।
4. ক্যালসিয়াম কার্বনেট—ঘাম শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
5. ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট—ঘাম শোষণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
6. স্টার্চ—তৈলাক্ত পদার্থ শোষণ করে।
7. সুগন্ধি—উপাদানিক গন্ধ চাপা দেওয়ার জন্য এবং মনোরম গন্ধ সৃষ্টির জন্য।

উপাদানগুলিকে অনুভূমিক মিশ্রণের মধ্যে ভালোভাবে মিশ্রিত করে পাউডারে পরিণত করা হয় ও প্যাকেটে ভর্তি করা হয়। ট্যালিকম্ পাউডারে সাধারণত কোন রঞ্জক পদগার্থ যোগ করা হয় না। প্রতিটি উপাদান ব্যাকটেরিয়া মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

নিচে ট্যালকম্ পাউডারের আরও উপাদান সংযুক্তি দেওয়া হলঃ

1. ট্যালক্—অতিরিক্ত জল ও ঘাম শোষণ করার জন্য— 60%
2. কেওলিন—জল শোষণ করার জন্য—20%
3. জিঙ্গা অক্সাইড— সাদা আভা সৃষ্টির জন্য—15%
4. জিঙ্গা স্টিয়ারেট—ত্বকে আটকে থাকার জন্য—5%
5. সুগন্ধি উপাদানিক গন্ধ চাপা দেওয়ার জন্য এবং মনোরম গন্ধ সৃষ্টির জন্য—পরিমাণ মত প্রতিটি উপাদান ব্যাকটেরিয়া মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

(b) 1. ট্যালক্—অতিরিক্ত জল ও ঘাম শোষণের জন্য 75%

2. কেওলিন—জলশোষণ করার জন্য—10%

3. সিলিকা—ত্বকে আটকে থাকার জন্য—2%

4. ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট—ঘাম ও শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য—6%

5. জিংক স্টিয়ারেট—ত্বকে আটকে থাকার জন্য—6%

6. সুগন্ধি—উপাদানিক গন্ধ চাপা দেওয়ার জন্য ও সুগন্ধ সৃষ্টির জন্য—1%

প্রতিটি উপাদান ব্যাকটেরিয়া মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

4.3 ক্রীম

আমাদের ত্বককে সুস্থ ও সতেজ রাখার জন্য ত্বকের পরিচর্যার প্রয়োজন। ত্বক পরিচর্যার জন্য ক্রীম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ক্রীম ত্বকের উপর একটা পাতলা আবরণ সৃষ্টি করে যার ফলে ত্বকে সরাসরি সূর্যকিরণ লাগতে পারে না এবং ত্বককে শুষ্ক হতে দেয় না। ত্বকে আস্তরণ থাকায় সহজে বাহির হতে ধূলাবালি, ময়লা সরাসরি ত্বকের সংস্পর্শে আসতে পারে না। ক্রীম ত্বকের কোলাজেন তন্তুকে রক্ষা করে ত্বকের দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করে। ক্রীমের বিভিন্ন উপাদান জলের সাথে মিশ্রিত করা হয়, যা ত্বককে শুষ্ক হতে বাধা দেয় এবং ত্বকের সিক্তভাব বজায় রাখে। ত্বকের কোলাজেন তন্তু নষ্ট হলে ত্বক শিথিল হয়ে যায়। আমাদের ত্বকে প্রধানতঃ তিনটি স্তর থাকে, যথা– এপিডারমিস, ডারমিস ও হাইপোডারমিস। এই স্তরগুলির আবার নানা উপস্তর আছে। যেখানে অসংখ্য গ্রন্থি বর্তমান। এই গ্রন্থিগুলি থেকে অসংখ্য নালিকা বের হয়ে একেবারে উপরের স্তরে এসে শেষ হয়েছে।

বয়স হলে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা, উজ্জ্বলতা, নমনীয়তা হ্রাস পায়। এর ফলে ত্বক শিথিল হয়ে পড়ে এবং ত্বকে অনেক ভাঁজ বা বলিরেখা দেখা দেয়। বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন গ্রন্থির তৈলাক্ত নিঃসরণ বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমে আসে, তাই ত্বক হারায় তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ও নমনীয়তা। এসময় ত্বকের কোলাজেন ও ইলাস্টিন প্রোটিন ফাইভার (যা ধরে রাখে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা) ভীষণভাবে কমে যায়। তাই এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য ক্রীম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ক্রীম ব্যবহার করার আগে ত্বককে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া একান্ত জরুরী এবং পরিষ্কার করে ক্রীম ব্যবহার করা উচিত।

4.3.2 উপাদানিক গঠন

একটি আধুনিক ক্রীমের উপাদানিক গঠন নিম্নরূপ–

1. ভেসলিন, তরল প্যারাফিন ও ল্যানোলিনের আনুপাতিক মিশ্রণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

2. স্টিয়ারিক অ্যাসিড বা অলেয়িক অ্যাসিড এবং সিটাইল অ্যালকোহল-- ত্বকের উফর ভেজা ভাবের সৃষ্টি করে।

3. ট্রাইসোডিয়াম ইডিটেট– সংরক্ষক হিসাবে কাজ করে।

4. ডি.এম.ডি.এম. হাইড্যোনটয়েন এবং অ্যালকিল প্যারাবেনসমূহ—জীবাণুনাশক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

5. ডিমিথিকোন—ফেনা উৎপাদনে বাধা সৃষ্টির জন্য।

6. জেরানিয়ল বা ফিনাইল ইথাইল অ্যালকোহল, জৈব সুগন্ধ পদাথ—সুগন্ধের জন্য ব্যবহার করা হয়।

7. ট্রাইইথানল অ্যামিন—ত্বকের অ্যাসিড ও ক্ষারের সমতা নিয়ন্ত্রণে (বাফার) ব্যবহার করা হয়।

8. জল— প্রয়োজনমত।

অন্য একটি ক্রীমের উপাদানিক গঠন নীচে দেওয়া হল--

1. গ্লিসারল মনো- এবং ডাই-স্টিয়ারেট—ত্বকের উপর ময়লা দূর করে ত্বককে পরিষ্কার করে।

2. স্টিয়ারিক অ্যাসিড— ত্বকের উপর ভেজাভাবের সৃষ্টি করে।

3. সিটাইল অ্যালকোহল— ত্বকের উপর ভেজাভাবের সৃষ্টি করে।

4. আইসোপ্রোপাইল-মিরিসটেট—সুগন্ধের জন্য ব্যবহার করা হয়।

5. প্রোপিলিন গ্লাইকল ও সরবিটল সিরাপ—ত্বককে শুষ্ক হতে দেয় না।

6. ট্রাইসোডিয়াম ইডিটেট, প্যারাবিন—সংরক্ষকরূপে যাহাতে কোন ক্ষতিকারক জীবাণু ক্রীমকে নষ্ট করতে না পরে।

7. ট্রাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড , জিংক-অক্সাইড— সূর্যকিরণ থেকে ত্বককে রক্ষা করে।

8. ট্যালক্—পিচ্ছলকারী হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

9. রঞ্জকপদার্থ—সুদৃশ্য করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

10. জল—প্রয়োজন মতো।

4.4 চুলরঞ্জনকারক পদার্থ (Hair Dyes)

আমাদের দেশে নারী পুরুষ প্রায় সকলেই চুল সাজানোর জন্য বিভিন্ন রঞ্জকপদার্থ ব্যবহার করে থাকেন। এইসব পদার্থ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল চুলকে নিয়ন্ত্রণে আনা এবং আবহাওয়ার ভিন্নতা যেমন-- বায়ু, আর্দ্রতা, শুষ্কতা, শৈত্যতা, তাপ, সূর্যালোক প্রভৃতি থেকে চুলকে রক্ষা করা এবং চুলের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানো। চুলের সৌন্দর্যবৃদ্ধি ও সাদা চুল কালো ও রঙীন করার জন্য চুলে বিভিন্নরকম প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম রঞ্জকপদার্থ ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক রং-এর মধ্যে প্রধান হল হেনা। এটি মেহেন্দি গাছের পাতায় পাওয়া যায়। হেনার মধ্যে যে রঞ্জকটি থাকে তার নাম 'লাইসোন'। হেনা ব্যবহারের সুবিধা হল এটি ত্বকে জ্বালার সৃষ্টি করে না এবং স্থায়ীভাবে ত্বকে কোন বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে না। ইহা হইতে প্রাপ্ত বর্ণ তুলনামূলকভাবে স্থায়ী এবং ইহা কেশরন্ধ্রে জমা হয় না।

আর চুলের কৃত্রিম রং হিসাবে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন অ্যামিনোফেনল (জৈব যৌগ)। ইহার সঙ্গে সামান্য পরিমাণ অন্যান্য পদার্থ মিশিয়ে রং প্রস্তুত করা হয়।

এইসব রঞ্জক পদার্থের কার্যকারিতা অনুযায়ী এদের মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায় যথা—

1. অস্থায়ী রঞ্জক

2. অর্ধস্থায়ী রঞ্জক

3. স্থায়ী রঞ্জক

4.4.1 অস্থায়ী রঞ্জক

এই শ্রেণীর রঞ্জকপদার্থগুলি অস্থাযী প্রকৃতির। দু-একবার সাবান বা শ্যাম্পু করলেই রঞ্জকপদার্থটি চুল হতে অপসারিত হয়। এই পদার্থগুলি চুলের উপরে একটি অস্থায়ী রঙীন আস্তরণ সৃষ্টি করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। যেমন--অ্যাজোডাই, অ্যানথ্রাকুইনোন, ট্রাইফিনাইল মিথেন ইত্যাদি।

4.4.2 অর্ধস্থায়ী রঞ্জক

এই শ্রেণীর রঞ্জক পদার্থগুলি ফেনা সৃষ্টিকারী সাবান বা শ্যাম্পুর উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইহারাও চুলের উফর একটি পাতলা আস্তরণ সৃষ্টি করে। যেমন--নাইট্রোফেনিলিন ডাই-অ্যামিন।

4.4.3 স্থায়ী রঞ্জক

এই শ্রেণীর রঞ্জকের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। এইসব স্থায়ী রঞ্জক যখন চুলে প্রয়োগ করা হয় তখন রঞ্জকটি বর্ণহীন থাকে। কিন্তু প্রয়োগের পর সূর্যালোক ও বাতাসের উপস্থিতিতে জারণের ফলে অভিষ্ট রং এ রঞ্জিত হয়।

(a) চুলের স্থায়ী রং সৃষ্টির জন্য প্রধানতঃ তিন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

যেমন–

1. ক্ষারক জাতীয় পদার্থ ঃ ইহারা সাধারণত অ্যারোমেটিক জৈব ক্ষারক, যাহারা সহজেই জারিত হয়। যেমন--প্যারা-অ্যামিনোফেনল, প্যারাডাই-অ্যামিনো অ্যানিসোল, প্যারাটলুইন ডাই-অ্যামিন ইত্যাদি। ইহাদের বিষক্রিয়া আছে এবং ত্বকে জ্বালা সৃষ্টি করে।

2. সংযোজক বা পরিবর্তক পদার্থ ঃ ইহারাও সাধারণত অ্যারোমেটিক জৈব ক্ষারক কিন্তু সহজেই জারিত হয় না। যেমন--রেসরসিলন (সবুজাভ), মেটা-অ্যামাইনোফেনল (ম্যাজেন্টা-বাদামী) ইত্যাদি।

3. জারক পদার্থ ঃ ইহারা রঞ্জক পদার্থকে জারিত করে অভীষ্ট রং-এ রঞ্জিত করে। যেমন--হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড, ইউরিয়া পারঅক্সাইড ইত্যাদি।

(b) স্থায়ী চুলরঞ্জক প্রস্তুতির সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

1. রঞ্জক বনিয়াদ ঃ স্থায়ী রঞ্জক প্রস্তুতির সময় কি ধরনের বনিয়াদ হবে অর্থাৎ বনিয়াদের প্রকৃতি যেমন-- দ্রবণ, ইমালসন, জেল, শ্যাম্পু বা পাউডার কি হবে, তা আগে ঠিক করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় উপাদান নির্বাচন করতে হবে।

2. রং উৎপাদক উপাদান ঃ জারণযোগ্য জৈব ক্ষারক এবং উপযুক্ত সংযোজক।

3. ক্ষার নির্বাচন ঃ সাধারণ জৈব ক্ষার বা অ্যামোনিয়ার দ্রবণ ব্যবহার করা হয়।

4. জারণ রোধক ঃ রঞ্জকটি ব্যবহারের আগে যাতে সূর্যালোক ও বায়ুর দ্বারা জারিত না হয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য ইহাতে সালফাইট বা অ্যামোনিয়ামথায়োগ্লাইকোনেট যোগ করা হয়।

4.4.4 স্থায়ী চুলরঞ্জক উপাদান

1. প্যারা-অ্যামিনোফেনল, অর্থো-অ্যামিনোফেনল, প্যারা-টলুইন ডাই-অ্যামিন—ক্ষারক রূপে।

2. রেসরসিলন, মেটা-অ্যামিনোফেনল– সংযোজক ও পরিবর্তক রূপে।

3. সোডিয়াম সালফাইড, মেটালিনিক অ্যাসিড–বিজারক রূপে।

4. আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল—দ্রাবক রূপে।

রং উৎপাদনের উপাদানসমূহ শ্যাম্পুতে দ্রবীভূত করে রাখা হয় এবং ব্যবহারের সময় হাইড্রোজেন পার অক্সাইড মিশ্রিত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চুলে প্রয়োগ করা হয় এবং ২০-৩০ মিনিট অপেক্ষা করার পর রং ফুটে উঠলে জল দিয়ে চুল ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। লেড, সিলভার ও কপারের যৌগ ব্যবহার করলে রং-এর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। বস্তুতপক্ষে আলো, বাতাসের উপস্থিতিতে অদ্রাব্য অক্সাইড ও সালফাইড উৎপন্ন হয় এবং জারণের ফলে কুইনোনিমিন যৌগ উৎপন্ন হওয়ার ফলে চুলে রং ধরে যায়।

4.5 হেয়ার স্প্রে

চুলের স্প্রে এমন একটি উদ্বায়ী তরল পদার্থ যা চুলে স্প্রে করলে সহজেই দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং চুলকে সহজেই নিয়ন্ত্রিত করা যায় ও চুলের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখে। চুলের স্প্রে ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল চুলের উপর অদৃশ্য একধরনের পলিমারের পাতলা আবরণের প্রলেপ দেওয়া, যা বাইরের কোন বস্তু থেকে চুলকে রক্ষা করে। উদ্বায়ী তরল দ্রুত বাষ্পীভূত হলে চুল সঠিক স্থানে থাকিয়া যায়।

4.5.1 উপাদানসমূহ

চুলের স্প্রে-এর প্রধান উপাদানগুলি হল পলিমার, দ্রাবক, প্লাস্টিসাইজার, নিউট্রালাইজার সুগন্ধি দ্রব্য ও অন্যান্য অ্যাডিটিভ দ্রব্য।

পলিমার হিসাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন কৃত্রিমপলিমারগুলি হল--পলিভিনাইল, পাইরোলিডোন বা পলিভিনাইল অ্যাসিটেট।

দ্রাবক হিসাবে বিশুদ্ধ ইথাইল অ্যালকোহল ব্যবহৃত হয়।

প্লাস্টিসাইজার হিসাবে বিভিন্ন ইথার, ফিনাইল মিথাইল সিলিকোন, সিলিকোন-গ্লাইকল, কো-পরিমারের যে আস্তরণের সৃষ্টি হয় তাকে নমনীয় করা এভং সঠিক স্থানে চুলকে বিন্যস্ত রাখা। রেজিনের অ্যাসিডমাত্রার উপর নির্ভর করে নিউট্রালাইজার যোগ করা হয়। বর্তমানে হেয়ার স্প্রে-এর মান উন্নত করতে বিভিন্ন ধরনের ভিঠামিন, প্রোভিটামিন ও সুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়।

একটি সাধারণ হেয়ার স্প্রে-এর মধ্যে মোটামুটি রেজিন (প্রধানতঃ, করায়াগাম, অ্যাকাসিয়াগাম, ট্রাগাকান্ঙ গাম), অনার্দ্র ইথাইল অ্যালকোহল (স্প্রে সৃষ্টিকারী পদার্থের আর্দ্রবিশ্লেষণ প্রতিহত করার জন্য) 40% ভিনাইল-অ্যাসিটেট, ক্রোটানিক অ্যাসিড কো-পলিমার 1.2%, সুগন্ধি দ্রব্য 0.05% পান্থানল 0.2%, বাকি অংশে জল থাকে।

পূর্বে হেয়ার স্প্রে-এর দ্রাবক হিসাবে ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন ব্যবহার করা হত কিন্তু দূষণগত কারণে বর্তমানে ইহার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন-এর বিকল্প দ্রাবক হিসাবে হাইড্রোকার্বন (বিউটেন, আইসো-বিউটেন) ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু হাইড্রোকার্বন ব্যবহারের ফলেও নিম্নলিখিত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

1. এই হাইড্রোকার্বনসমূহ উন্নতমানের দ্রাবক নয়। সাহায্যকারী দ্রাবক হিসাবে মিথিলিন ক্লোরাইড ও জল মিশানো হয়।

2. এই হাইড্রোকার্বনসমূহ খুব বেশী পরিমাণে দাহ্য।

4.5.2 হেয়ার স্প্রে এর বিষক্রিয়া

1. অসাবধানতাবশতঃ হেয়ার স্প্রে ফুসফুসে প্রবেশ করলে শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগের সৃষ্টি হয়।

2. ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনযুক্ত অ্যারোসল, অ্যারোসল স্প্রে অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহারের ফলে হৃদরোগের সম্ভাবানা দেখা যায়।

4.5.3 মূল্যায়ন

নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন--আস্তরণের কাঠিন্য, উজ্জ্বল্যতা, স্বচ্ছতা, দ্রাব্যতা, চুলে আটকে থাকা, প্রয়োজনে সহজেই দূরীভূত করা ইত্যাদি নির্ধারণ করে কোন রেজিন ব্যবহৃত হবে।

4.6 ওষ্ঠরঞ্জক (Lipstick)

ঠোঁটের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য এই জাতীয় রঞ্জকপদার্থ দন্ডের ন্যায় আকারযুক্ত করে বিক্রি করা হয়ে থাকে। যদিও প্রধানতঃ মহিলাদের মধ্যে লিপস্টিকের ব্যবহার বহুল পরিমাণে পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। তথাপি উপ যুক্তভাবে ইহার ব্যবহার অনেক মহিলা ও পুরুষকে সুদর্শনা ও সুদর্শন করে তোলে। যেহেতু লিপস্টিকের মূল উপাদান তৈল বা চর্বি এবং মোম তাই ইহার ব্যবহারের ফলে ঠোঁট মোলায়েম থাকে ও ফাটা থেকে রক্ষা পায়।

4.6.1 ওষ্ঠরঞ্জকের গুণাবলী

ভালো লিপস্টিকের নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা প্রয়োজন ঃ

1. ভালো লিপস্টিক যেন ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে শক্ত না হয়ে যায়।

2. অসাবধানতাবশতঃ শরীরের ভেতরে প্রবেশ করলে ভেতরের অংশের উপর যেন কোন প্রভাব সৃষ্টি না করে।

3. ব্যবহার করা সুবিধাজনক হওয়া চাই এবং প্রয়োজন অনুযায়ী লিপস্টিক যেন সহজেই দূরীভূত করা যায়।

4. সহজেই যেন জলে দ্রবীভূত না হয়।

4.6.2 ওষ্ঠরঞ্জক তৈরীর উপাদানসমূহ

লিপস্টিক তৈরীতে ব্যবহৃত মূল উপাদানগুলি হল--কৃত্রিম রেজিন, মোম এবং রঞ্জকপদার্থ।

কৃত্রিম রেজিন হিসাবে ব্যবহৃত উপাদানগুলি হল কারবোমার, পলি ইথিলিন, ইত্যাদি।

ব্যবহৃত মোমের মধ্যে ক্যান্ডেলিলা-মোম, কারনোবা-মোম, মৌমাছি-মোম, পেট্রোলিয়ামঘটিত মোম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ঠোঁটের চকচকে ভাব আনতে এবং স্থায়ীত্বের জন্য যথাক্রমে প্রোপিলিন গ্লাইকল এবং কিছু বিশেষ ধরনের পলিমার ব্যবহার করা হয়।

লিপস্টিকে ব্যবহৃত রং অবশ্যই স্বীকৃত হওয়া চাই। এই ধরনের রং অবশ্যই ঠোঁটে ব্যবহারের উপযুক্ত হওয়া চাই। রংগুলি যেন ঠোঁটে কোন ক্ষতিসাধন না করে বা জলে সহজেই দ্রবীভূত না হয়। সাধারণতঃ ঠোঁটে দুইভাবে রং করা হয়--

1. রঞ্জক পদার্থ দ্বারা প্রলেপ দিয়ে।

2. একটি স্তরের সাহায্যে ঠোঁটের অসমৃণ রেখে।

4.6.3 ওষ্ঠরঞ্জকের সংযুতি

একটি ওষ্ঠরঞ্জকের সংযুতি মোটামুটি নিম্নরূপ—

1. কারনোবা-মোম — 10%

2. পরিশোধিত মৌচাকের মোম — 15%

3. ল্যানোলিন — 5%

4. সিটাইল অ্যালকোহল — 5%

5. ক্যাস্টর অয়েল — 60%

6. স্বীকৃত অদ্রাব্য জৈব রং — 1-5%

7. সুগন্ধি — 2%

8. জারণ রোধক — 0.1%

এক্ষণে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ওষ্ঠরঞ্জক প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব পণ্যসামগ্রীর উৎকর্ষতা ও আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন প্রকার পদার্থ ব্যবহার করে থাকেন। এইসব পদার্থের নাম ও শতকরা মাত্রা প্রকাশ করেন না, বাণিজ্যিক গোপনীয়তার (trade-secret) জন্য।

4.7 সারাংশ

- এক একটি পাঠ করার পর আপনি যে বিষয়গুলি জানতে পারলেন তার সারসংক্ষেপ হল—
- ট্যালকম্ পাউডারের মূল উপাদান কি? এই পাউডার তৈরি করতে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট এবং জিঙ্ক স্টিয়ারেটের প্রয়োজনীয়তা কোথায়।
- বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ত্বক তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ও নমনীয়তা হারায় কেন? এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্রীম ব্যবহার করার উপকারীতা কতখানি।
- একটি আধুনিক ক্রীমের উপাদানগুলি কি কি
- চুলরঞ্জকপদার্থের রাসায়নিক প্রকৃতি কেমন, স্থায়ী চুলরঞ্জকপদার্থ প্রস্তুত করার সময় কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- চুলে স্প্রে করার উদ্দেশ্য কি? সাবধানতা অবলম্বন না করলে কি কি অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। একটি ওষ্ঠরঞ্জকের সংযুতি সম্বন্ধে ধারণা।

4.4.1 অস্থায়ী রঞ্জক

এই শ্রেণীর রঞ্জকপদার্থগুলি অস্থায়ী প্রকৃতির। দু-একবার সাবান বা শ্যাম্পু করলেই রঞ্জকপদার্থটি চুল হতে অপসারিত হয়। এই পদার্থগুলি চুলের উপরে একটি অস্থায়ী রঙীন আস্তরণ সৃষ্টি করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। যেমন--অ্যাজোডাই, অ্যানথ্রাকুইনোন, ট্রাইফিনাইল মিথেন ইত্যাদি।

4.4.2 অর্ধস্থায়ী রঞ্জক

এই শ্রেণীর রঞ্জক পদার্থগুলি ফেনা সৃষ্টিকারী সাবান বা শ্যাম্পুর উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইহারাও চুলের উফর একটি পাতলা আস্তরণ সৃষ্টি করে। যেমন--নাইট্রোফেনিলিন ডাই-অ্যামিন।

4.4.3 স্থায়ী রঞ্জক

এই শ্রেণীর রঞ্জকের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। এইসব স্থায়ী রঞ্জক যখন চুলে প্রয়োগ করা হয় তখন রঞ্জকটি বর্ণহীন থাকে। কিন্তু প্রয়োগের পর সূর্যালোক ও বাতাসের উপস্থিতিতে জারণের ফলে অভিষ্ট রং এ রঞ্জিত হয়।

(a) চুলের স্থায়ী রং সৃষ্টির জন্য প্রধানতঃ তিন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

যেমন–

1. ক্ষারক জাতীয় পদার্থ ঃ ইহারা সাধারণত অ্যারোমেটিক জৈব ক্ষারক, যাহারা সহজেই জারিত হয়। যেমন--প্যারা-অ্যামিনোফেনল, প্যারাডাই-অ্যামিনো অ্যানিসোল, প্যারাটলুইন ডাই-অ্যামিন ইত্যাদি। ইহাদের বিষক্রিয়া আছে এবং ত্বকে জ্বালা সৃষ্টি করে।

2. সংযোজক বা পরিবর্তক পদার্থ ঃ ইহারাও সাধারণত অ্যারোমেটিক জৈব ক্ষারক কিন্তু সহজেই জারিত হয় না। যেমন--রেসরসিলন (সবুজাভ), মেটা-অ্যামাইনোফেনল (ম্যাজেন্টা-বাদামী) ইত্যাদি।

3. জারক পদার্থ ঃ ইহারা রঞ্জক পদার্থকে জারিত করে অভীষ্ট রং এ রঞ্জিত করে। যেমন--হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড, ইউরিয়া পারঅক্সাইড ইত্যাদি।

(b) স্থায়ী চুলরঞ্জক প্রস্তুতির সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

1. রঞ্জক বনিয়াদ ঃ স্থায়ী রঞ্জক প্রস্তুতির সময় কি ধরনের বনিয়াদ হবে অর্থাৎ বনিয়াদের প্রকৃতি যেমন-- দ্রবণ, ইমালসন, জেল, শ্যাম্পু বা পাউডার কি হবে, তা আগে ঠিক করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় উপাদান নির্বাচন করতে হবে।

2. রং উৎপাদক উপাদান ঃ জারণযোগ্য জৈব ক্ষারক এবং উপযুক্ত সংযোজক।

3. ক্ষার নির্বাচন ঃ সাধারণ জৈব ক্ষার বা অ্যামোনিয়ার দ্রবণ ব্যবহার করা হয়।

4. জারণ রোধক ঃ রঞ্জকটি ব্যবহারের আগে যাতে সূর্যালোক ও বায়ুর দ্বারা জারিত না হয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য ইহাতে সালফাইট বা অ্যামোনিয়ামথায়োগ্লাইকোনেট যোগ করা হয়।

4.4.4 স্থায়ী চুলরঞ্জক উপাদান

1. প্যারা-অ্যামিনোফেনল, অর্থো-অ্যামিনোফেনল, প্যারা-টলুইন ডাই-অ্যামিন—ক্ষারক রূপে
2. রেসরসিলন, মেটা-অ্যামিনোফেনল– সংযোজক ও পরিবর্তক রূপে।

3. সোডিয়াম সালফাইড, মেটালিনিক অ্যাসিড–বিজারক রূপে।

4. আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল–দ্রাবক রূপে।

রং উৎপাদনের উপাদানসমূহ শ্যাম্পুতে দ্রবীভূত করে রাখা হয় এবং ব্যবহারের সময় হাইড্রোজেন পার অক্সাইড মিশ্রিত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চুলে প্রয়োগ করা হয় এবং ২০-৩০ মিনিট অপেক্ষা করার পর রং ফুটে উঠলে জল দিয়ে চুল ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। লেড, সিলভার ও কপারের যৌগ ব্যবহার করলে রং-এর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। বস্তুতপক্ষে আলো, বাতাসের উপস্থিতিতে অদ্রাব্য অক্সাইড ও সালফাইড উৎপন্ন হয় এবং জারণের ফলে কুইনোনিমিন যৌগ উৎপন্ন হওয়ার ফলে চুলে রং ধরে যায়।

4.5 হেয়ার স্প্রে

চুলের স্প্রে এমন একটি উদ্বায়ী তরল পদার্থ যা চুলে স্প্রে করলে সহজেই দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং চুলকে সহজেই নিয়ন্ত্রিত করা যায় ও চুলের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখে। চুলের স্প্রে ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল চুলের উপর অদৃশ্য একধরনের পলিমারের পাতলা আবরণের প্রলেপ দেওয়া, যা বাইরের কোন বস্তু থেকে চুলকে রক্ষা করে। উদ্বায়ী তরল দ্রুত বাষ্পীভূত হলে চুল সঠিক স্থানে থাকিয়া যায়।

4.5.1 উপাদানসমূহ

চুলের স্প্রে-এর প্রধান উপাদানগুলি হল পলিমার, দ্রাবক, প্লাস্টিসাইজার, নিউট্রালাইজার সুগন্ধি দ্রব্য ও অন্যান্য অ্যাডিটিভ দ্রব্য।

পলিমার হিসাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন কৃত্রিমপলিমারগুলি হল--পলিভিনাইল, পাইরোলিডোন বা পলিভিনাইল অ্যাসিটেট।

দ্রাবক হিসাবে বিশুদ্ধ ইথাইল অ্যালকোহল ব্যবহৃত হয়।

প্লাস্টিসাইজার হিসাবে বিভিন্ন ইথার, ফিনাইল মিথাইল সিলিকোন, সিলিকোন-গ্লাইকল, কো-পরিমারের যে আস্তরণের সৃষ্টি হয় তাকে নমনীয় করা এবং সঠিক স্থানে চুলকে বিন্যস্ত রাখা। রেজিনের অ্যাসিডমাত্রার উপর নির্ভর করে নিউট্রালাইজার যোগ করা হয়। বর্তমানে হেয়ার স্প্রে-এর মান উন্নত করতে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, প্রোভিটামিন ও সুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়।

একটি সাধারণ হেয়ার স্প্রে-এর মধ্যে মোটামুটি রেজিন (প্রধানতঃ, করায়াগাম, অ্যাকাসিয়াগাম, ট্রাগাকানথ গাম), অনার্দ্র ইথাইল অ্যালকোহল (স্প্রে সৃষ্টিকারী পদার্থের আর্দ্রবিশ্লেষণ প্রতিহত করার জন্য) 40% ভিনাইল-অ্যাসিটেট, ক্রোটানিক অ্যাসিড কো-পলিমার 1.2%, সুগন্ধি দ্রব্য 0.05% পান্থানল 0.2%, বাকি অংশে জল থাকে।

পূর্বে হেয়ার স্প্রে এর দ্রাবক হিসাবে ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন ব্যবহার করা হত কিন্তু দূষণগত কারণে বর্তমানে ইহার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন-এর বিকল্প দ্রাবক হিসাবে হাইড্রোকার্বন (বিউটেন, আইসো-বিউটেন) ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু হাইড্রোকার্বন ব্যবহারের ফলেও নিম্নলিখিত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

1. এই হাইড্রোকার্বনসমূহ উন্নতমানের দ্রাবক নয়। সাহায্যকারী দ্রাবক হিসাবে মিথিলিন ক্লোরাইড ও জল মিশানো হয়।

2. এই হাইড্রোকার্বনসমূহ খুব বেশী পরিমাণে দাহ্য।

4.5.2 হেয়ার স্প্রে এর বিষক্রিয়া

1. অসাবধানতাবশতঃ হেয়ার স্প্রে ফুসফুসে প্রবেশ করলে শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগের সৃষ্টি হয়।

2. ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনযুক্ত অ্যারোসল, অ্যারোসল স্প্রে অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহারের ফলে হৃদরোগের সম্ভাবনা দেখা যায়।

4.5.3 মূল্যায়ন

নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন--আস্তরণের কাঠিন্য, উজ্জ্বল্যতা, স্বচ্ছতা, দ্রাব্যতা, চুলে আটকে থাকা, প্রয়োজনে সহজেই দূরীভূত করা ইত্যাদি নির্ধারণ করে কোন রেজিন ব্যবহৃত হবে।

4.6 ওষ্ঠরঞ্জক (Lipstick)

ঠোঁটের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য এই জাতীয় রঞ্জকপদার্থ দন্ডের ন্যায় আকারযুক্ত করে বিক্রি করা হয়ে থাকে। যদিও প্রধানতঃ মহিলাদের মধ্যে লিপস্টিকের ব্যবহার বহুল পরিমাণে পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। তথাপি উপ যুক্তভাবে ইহার ব্যবহার অনেক মহিলা ও পুরুষকে সুদর্শনা ও সুদর্শন করে তোলে। যেহেতু লিপস্টিকের মূল উপাদান তৈল বা চর্বি এবং মোম তাই ইহার ব্যবহারের ফলে ঠোঁট মোলায়েম থাকে ও ফাটা থেকে রক্ষা পায়।

4.6.1 ওষ্ঠরঞ্জকের গুণাবলী

ভালো লিপস্টিকের নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা প্রয়োজন ঃ

1. ভালো লিপস্টিক যেন ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে শক্ত না হয়ে যায়।

2. অসাবধানতাবশতঃ শরীরের ভেতরে প্রবেশ করলে ভেতরের অংশের উপর যেন কোন প্রভাব সৃষ্টি না করে।

3. ব্যবহার করা সুবিধাজনক হওয়া চাই এবং প্রয়োজন অনুযায়ী লিপস্টিক যেন সহজেই দূরীভূত করা যায়।

4. সহজেই যেন জলে দ্রবীভূত না হয়।

4.6.2 ওষ্ঠরঞ্জক তৈরীর উপাদানসমূহ

লিপস্টিক তৈরীতে ব্যবহৃত মূল উপাদানগুলি হল--কৃত্রিম রেজিন, মোম এবং রঞ্জকপদার্থ।

কৃত্রিম রেজিন হিসাবে ব্যবহৃত উপাদানগুলি হল কারবোমার, পলি ইথিলিন, ইত্যাদি।

ব্যবহৃত মোমের মধ্যে ক্যান্ডেলিলা-মোম, কারনোবা-মোম, মৌমাছি-মোম, পেট্রোলিয়ামঘটিত মোম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ঠোঁটের চকচকে ভাব আনতে এবং স্থায়ীত্বের জন্য যথাক্রমে প্রোপিলিন গ্লাইকল এবং কিছু বিশেষ ধরনের পলিমার ব্যবহার করা হয়।

লিপস্টিকে ব্যবহৃত রং অবশ্যই স্বীকৃত হওয়া চাই। এই ধরনের রং অবশ্যই ঠোঁটে ব্যবহারের উপযুক্ত হওয়া চাই। রংগুলি যেন ঠোঁটে কোন ক্ষতিসাধন না করে বা জলে সহজেই দ্রবীভূত না হয়। সাধারণতঃ ঠোঁটে দুইভাবে রং করা হয়--

1. রঞ্জক পদার্থ দ্বারা প্রলেপ দিয়ে।

2. একটি স্তরের সাহায্যে ঠোঁটের অসমৃণ রেখে।

4.6.3 ওষ্ঠরঞ্জকের সংযুতি

একটি ওষ্ঠরঞ্জকের সংযুতি মোটামুটি নিম্নরূপ—

1. কারনোবা-মোম — 10%
2. পরিশোধিত মৌচাকের মোম — 15%
3. ল্যানোলিন — 5%
4. সিটাইল অ্যালকোহল — 5%
5. ক্যাস্টর অয়েল — 60%
6. স্বীকৃত অদ্রাব্য জৈব রং — 1-5%
7. সুগন্ধি — 2%
8. জারণ রোধক — 0.1%

এক্ষণে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ওষ্ঠরঞ্জক প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব পণ্যসামগ্রীর উৎকর্ষতা ও আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন প্রকার পদার্থ ব্যবহার করে থাকেন। এইসব পদার্থের নাম ও শতকরা মাত্রা প্রকাশ করেন না, বাণিজ্যিক গোপনীয়তার (trade-secret) জন্য।

4.7 সারাংশ

- এক একটি পাঠ করার পর আপনি যে বিষয়গুলি জানতে পারলেন তার সারসংক্ষেপ হল—
- ট্যালকম্ পাউডারের মূল উপাদান কি? এই পাউডার তৈরি করতে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট এবং জিঙ্ক স্টিয়ারেটের প্রয়োজনীয়তা কোথায়।
- বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ত্বক তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ও নমনীয়তা হারায় কেন? এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্রীম ব্যবহার করার উপকারীতা কতখানি।
- একটি আধুনিক ক্রীমের উপাদানগুলি কি কি
- চুলরঞ্জকপদার্থের রাসায়নিক প্রকৃতি কেমন, স্থায়ী চুলরঞ্জকপদার্থ প্রস্তুত করার সময় কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- চুলে স্প্রে করার উদ্দেশ্য কি? সাবধানতা অবলম্বন না করলে কি কি অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। একটি ওষ্ঠরঞ্জকের সংযুতি সম্বন্ধে ধারণা।

একক 5 ☐ সাবান, পরিষ্কারক ও জল (Soaps, Detergents and Water)

গঠন

5.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

5.1 উৎপাদন

5.2 সাবানের শ্রেণিবিভাগ

5.3 সাবান প্রস্তুতি

5.3.1 সাবান প্রস্তুতির বিভিন্ন পদ্ধতি

5.3.2 সাবান প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

5.3.3 সাবান প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল

5.4 সাবানের ধর্ম

5.5 প্রসাধনী সাবান

5.6 তরল সাবান

5.7 সাবানের কার্যকারিতা

5.8 পরিষ্কারক

5.9 পরিষ্কারকের কার্যকারিতা

5.10 পরিষ্কারক ও সাবানের মধ্যে পার্থক্য

5.11 জল

5.12 শ্রেণিবিভাগ

5.12.1 মৃদু জল

5.12.2 খর জল

5.13 খর জলের শ্রেণিবিভাগ

5.13.1 অস্থায়ী খর জল

5.13.2 স্থায়ী খর জল

5.14 খরতা দূরীকরণ বা জল মৃদুকরণ

5.14.1 স্ফুটন পদ্ধতি

5.14.2 ক্লার্কের পদ্ধতি

5.14.3 সোডা পদ্ধতি

5.14.4 চুন-সোডা পদ্ধতি

5.14.5 পারমুটিট বা জিওলাইট পদ্ধতি

5.14.6 আয়ন বিনিময় রেজিন পদ্ধতি

5.15 খর জল ব্যবহারের অসুবিধা

5.16 খরতার মাত্রা

5.17 সারাংশ

5.0 প্রস্তাবনা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিধেয় ও অন্যান্য বস্ত্র পরিষ্কারের কাজে এবং স্বাস্থ্য রক্ষা ও শরীরের ময়লা দূর করতে যা আমরা সব সময় ব্যবহার করি তাহা হল সাবান। সাবান শিল্প একটি অতি প্রাচীন শিল্প। ইহার ব্যবহার 2500 বৎসর পূর্ব হতে চলে আসছে। মেসোপটেমিয়ায় (বর্তমান নাম ইরাক) সাবান ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। আধুনিক সাবান প্রস্তুতির কাজ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে শুরু হলেও রোমান রাজাদের রাজত্বকালেও ইহার ব্যবহার জানা ছিল। তখন জন্তু-জানোয়ারের চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে কাঠের ভস্ম মিশিয়ে সাবান প্রস্তুতি করা হত যাহা পরিধেয় বস্ত্র কাচা ও পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হত। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্য মানুষ তাদের আরাম ও স্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদে ও পরিধেয় সামগ্রী পরিষ্কারের জন্য এই শিল্পের প্রসার ঘটিয়েছে।

উদ্দেশ্য ঃ

আমাদের শরীর ও পরিধেয়সামগ্রী পরিষ্কার রাখার জন্য সাবান, পরিষ্কারক ও জল ব্যবহার করি। এই এককটি পাঠ করলে আপনি এদের রসায়ন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে পারেন। যেসব তথ্য আপনি জানতে পারবেন সেগুলি হল ঃ

- সাবানের রাসায়নিক সংকেত
- সাবানীভবন বিক্রিয়া কাকে বলে
- সাবান প্রস্তুতির জন্য কি কি যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের প্রয়োজন
- সাবান শিল্পে রঞ্জক ও সুগন্ধি দ্রব্যের প্রয়োজন হয় কেন
- তরল সাবানের উল্লেখযোগ্য কাঁচামালগুলি কি কি
- সাবানের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা
- পরিষ্কারক প্রস্তুতিতে কি কি রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয়

- পরিষ্কারক ও সাবানের মধ্যে পার্থক্য
- মৃদু জল ও খর জল বলতে কি বোঝায়
- খর জলে সাবান ব্যবহার করলে সহজে ফেনা হয় না এবং সাবানের অপচয় হয়; কিন্তু পরিষ্কারক খর জলে ব্যবহার করা যায়। এর কারণ কি?
- খর জল মৃদু জলে পরিণত করার পদ্ধতিগুলি কি কি
- গৃহস্থালী কার্যে বা শিল্পে খর জল ব্যবহার করলে কি কি অসুবিধার সৃষ্টি হয়
- জলের খরতার মাত্রা প্রকাশের এককগুলি কি কি

5.1 উৎপাদন

সাবান এক প্রকার জৈব লবণ যা উদ্ভিজ্জ তেল অথবা প্রাণীজ চর্বির সঙ্গে কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশের (ক্ষার) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। তেল ও চর্বি থেকে প্রাপ্ত গ্লিসারাইডসমূহকে কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশ দিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষিত করলে দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম ঘটিত লবণ (সাবান) পাওয়া যায় এবং গ্লিসারল (প্রোপেন-১,২,৩-ট্রাইঅল) উৎপন্ন হয়।

$$\text{উদ্ভিজ্জ তেল বা প্রাণীজ চর্বি + কস্টিক সোডা} \xrightarrow{\text{উত্তপ্ত}} \text{সিলটিং}$$

$$\text{ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ (সাবান) + গ্লিসারল}$$

উদ্ভিজ্জ তেল অথবা জীবজন্তুর চর্বির (গ্লিসারাইড) সঙ্গে ক্ষারের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তেল বা চর্বির অণুগুলিসাবানে রূপান্তরিত হয় এবং গ্লিসারল মুক্ত হয়। এই বিক্রিয়ায় কিছুটা তাপের উৎপত্তি হয়। তেল বা চর্বির সঙ্গে ক্ষারের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তেল বা চর্বি যে পদ্ধতিতে সাবানে রূপান্তরিত হয় সেই পদ্ধতিকে পটাশ সাবান বলে অবহিত করা হয়।

সাবান উৎপাদনের জন্য সাবানীভবন বিক্রিয়াকে তিনভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যথা—

1. প্রশম তেল সাবানীভবন—স্টীল নির্মিত পাত্রে তেল ও কস্টিক সোডা স্টীম-এর উপস্থিতিতে ৩–৪ ঘন্টা ধরে আর্দ্রবিশ্লেষিত করা হয় এবং ঠান্ডা অবস্থায় ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে সাবান পৃথক করা হয়।

$$\underset{\text{(উদ্ভিজ্জ তেল)}}{\text{গ্লিসারাইল স্টিয়ারেট + কস্টিক সোডা}} \longrightarrow \underset{\text{(সোডা সাবান)}}{\text{সোডিয়াম স্টিয়ারেট}} + \text{গ্লিসারল}$$

2. আর্দ্রবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় চর্বিকে বিয়োজিত করে ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপাদন ও উদ্ভুত ফ্যাটি অ্যাসিডের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষার মিশ্রিত করে প্রশমিত করলে সাবান উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{(চর্বি)}}{\text{গ্লিসারাইল স্টিয়ারেট + জল}} \xrightarrow{\text{উত্তাপ}} \text{ফ্যাটি অ্যাসিড + গ্লিসারল}$$

$$\text{ফ্যাটি অ্যাসিড + কস্টিক সোডা} \longrightarrow \underset{\text{(সাবান)}}{\text{সোডিয়াম স্টিয়ারেট}} + \text{জল}$$

৩. মিথাইল এস্টারের সাবানীভবন—বিক্রিয়ার প্রথম মিথাইল এস্টার তৈরি করা হয় এবং সাবানীভবন প্রক্রিয়ায় সাবান উৎপাদন করা হয়।

$$\text{গ্লিসারাইল স্টিয়ারেট (চর্বি বা তেল)} + \text{মিথাইল} \longrightarrow \text{মিথাইল এস্টার} + \text{গ্লিসারল}$$

$$\text{মিথাইল এস্টার} + \text{কস্টিক সোডা} \longrightarrow \underset{\text{(সাবান)}}{\text{সোডিয়াম স্টিয়ারেট}} + \text{মিথানল}$$

5.2 সাবানের শ্রেণীবিভাগ

ব্যবহারিক দিক দিয়ে সাবানকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায় :

1. প্রসাধনী সাবান (toilet soap)
2. কাপড়কাচা সাবান (washing soap)
3. তরল সাবান (liquid soap)
4. দাড়ি কামানোর সাবান (shaving soap)

সাবানকে উপাদানগতভাবে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

1. কঠিন সাবান (hard soap)—সাবানের মধ্যে যদি সংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের (যেমন পামিটিক অ্যাসিড, স্টিয়ারিক অ্যাসিড) সোডিয়াম লবণ বেশি মাত্রায় থাকে ঐ সাবানকে কঠিন সাবান বলে।

2. কোমল সাবান (soft soap)- সাবানের মধ্যে যদি অশংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের (যেমন ওলেয়িক অ্যাসিড, লিনোলেনিক অ্যাসিড) পটাশিয়াম বেশি মাত্রায় থাকে তবে ঐ সাবানকে কোমল সাবান বলে।

5.3 সাবান প্রস্তুতি

সাবান প্রস্তুতির দুইটি মূল বিষয় 1. সাবানীকরণ প্রক্রিয়া এবং 2. উৎপন্ন সাবানের সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সমসত্ত্বভাবে মেশানো।

5.3.1 সাবান প্রস্তুতির বিভিন্ন পদ্ধতি

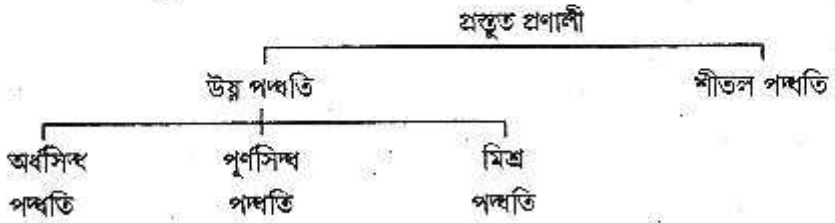

1. উষ্ণ পদ্ধতি – এই পদ্ধতিতে সাধারণত প্রসাধন ও কাপড় কাচার সাবান প্রস্তুত করা হয়। উষ্ণ পদ্ধতিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা (a) অর্ধসিদ্ধ পদ্ধতি, (b) পূর্ণসিদ্ধ পদ্ধতি (c) মিশ্র পদ্ধতি।

2. শীতল পদ্ধতি— স্বচ্ছ বা বিশেষ ধরণের সাবানের জন্য সাধারণত শীতল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

5.3.2 সাবান প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

সাবান প্রস্তুতির জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়ঃ

1. কড়াই বা বর্তমানে স্টীলনির্মিত সাবান-কেটলী (পনের-তিরিশ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট, আট-দশ ফুট গভীর পাত্র)
2. আলোড়ক খুন্তি বা কাঠের তাড়ু বা বর্তমানে স্বছিদ্র স্টীম কুন্তলী
3. উনান তৎসহ জ্বালানী
4. বালতি
5. মগ
6. হাইড্রোমিটার যন্ত্র
7. মাপক চোঙ
8. স্টেনলেশ স্টীলের ছুরি
9. তুলাদন্ড ও বাটখারা
10. সাবান জমাইবার পাত্র
11. কস্টিক সোডা রাখিবার পাত্র
12. সাবানে ছাপ লাগানোর যন্ত্র
13. কাঠের ট্রে
14. ডাইস
15. মোড়ক দ্রব্য ইত্যাদি

5.3.3 সাবান প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল

সাবান প্রস্তুতির জন্য দুইটি প্রধান উপাদান নিম্নে দেওয়া হলঃ

1. উদ্ভিদ তেল অথবা প্রাণীজ চর্বি (ত্রি-গ্লিসারাইড)। এদের প্রধান উৎস-
   (a) গো-চর্বি (শতকরা 75-80 ভাগ)
   (b) ভেড়ার চর্বি
   (c) শূকরের চর্বি ইত্যাদি এবং
   (d) নারকেল তেল (শতকরা 15-25 ভাগ)
   (e) মহুয়া তেল
   (f) বাদাম তেল
   (g) পাম, কার্ণাল তেল প্রভৃতি নন্-ডাইং অয়েল

2. ক্ষারজাতীয় পদার্থ– যেমন কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশ। কস্টিক সোডার উৎস ক্লোরিন শিল্প। সাবান শিল্পে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাঁচামালগুলি যথাক্রমে–

(a) জল একটি মূল্যবান উপাদান। ইহা তেল এবং ক্ষারের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করে।

(b) ধারক হিসাবে সোডিয়াম সিলিকেট, সোডা অ্যাশ, ট্রাইসোডিয়াম ফসফেট, সাইট্রেট লবণ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

(c) ফিলার হিসাবে ট্যালক্, স্টার্চ ইত্যাদি।

(d) সুগন্ধি দ্রব্য হিসাবে পাইন তেল, ল্যাভেন্ডার তেল, লেমনগ্রাস তেল, সিট্রোনিলা তেল, স্যান্ডেল তেল, ক্লোভ তেল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

(e) লবণ— তেল ও ক্ষারের মিশ্রণ থেকে গ্রেন সোপ প্রস্তুত করার জন্য লবণের ব্যবহার করা হয়। লবণ তেলের মধ্যস্থ গ্লিসারিন ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় জিনিস আলাদা করতে সাহায্য করে।

(f) রঞ্জক দ্রব্য— সাবানকে দৃষ্টি আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ যেমন, ইয়োসিন (বেগুণী রং), আলট্রামেরিন গ্লু (নীল রং), টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড (সাদা রং) যোগ করা হয়। সোপস্টোন পাউডার সাবানের ওজন বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

5.4 সাবানের ধর্ম

1. উন্নতমানের সাবান শক্ত এবং সুগন্ধযুক্ত। 2. সাবান জলে সহজে দ্রবীভূত হয়। 3. সাবান জৈব দ্রাবকেও দ্রাব্য কিন্তু কেরোসিন বা পেট্রোলে দ্রবীভূত হয় না। 4. জলের সঙ্গে প্রচুর ফেনা উৎপন্ন করে।

বিভিন্ন প্রকার তেল থেকে উৎপন্ন সাবান বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। নারকেল তেল, বাদাম তেল থেকে উৎপন্ন সাবান সহজে দ্রবীভূত হয় কিন্তু মহুয়া তেলের সাবান সহজে দ্রবীভূত হয় না।

5.5 প্রসাধনী সাবান

প্রসাধনী সাবান প্রস্তুতির জন্য সাধারণত—

(i) নারকেল তেল/বাদাম তেল/ক্যাস্টর তেল

(ii) কস্টিক তেল

(iii) অ্যালকোহল

(iiv) রঞ্জক পদার্থ

(v) সুগন্ধি পদার্থ নেওয়া হয়।

সাবান-কেটলীতে চর্বি ও তেলকে বিগলিত করার পর কস্টিক সোডা যোগ করা হয় এবং স্টীমের সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয়। আর্দ্র বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হলে রঞ্জক পদার্থ যোগ করা হয় এবং পুনরায় উত্তপ্ত করা হয়। অবশেষে সুগন্ধি পদার্থ যোগ করে জমাবার পাত্রে ঢেলে সাবানের কেক তৈরি করা হয়।

5.6 তরল সাবান (Liquid Soap)

ফ্যাটি অ্যাসিডের পটাশিয়াম লবণসমূহ স্বাভাবিক উষ্ণতায় তরল অবস্থায় থাকে বলে এই লবণসমূহকে তরল সাবান বলা হয়।

তরল সাবান তৈরি করার জন্য নিচে উল্লিখিত কাঁচামালের প্রয়োজন ঃ

(i) নারকেল তেল

(ii) কস্টিক পটাশ

(iii) চিনি

(iv) বোরাক্স

(v) গ্লিসারিন

(vi) জল

(vii) সুগন্ধি দ্রব্য

(viii) রঞ্জক পদার্থ

প্রণালী ঃ সাবান-কেটলীতে নারকেল তেল ও পটাশ লেই (25%) 50° সে. উষ্ণতায় উত্তপ্ত করা হয় এবং ভালভাবে মিশ্রিত করা হয়। উত্তপ্ত অবস্থায় নারকেল তেল কস্টিক পটাশ দ্রবণ দ্বারা আর্দ্রবিশ্লেষিত হয় এবং প্রচুর ফেনা উৎপন্ন হয়। সাবানীভবন সম্পূর্ণ হলে চিনি, বোরাক্স, গ্লিসারিন এবং পরিমাণ মত জল মেশান হয়। এরপর এই মিশ্রণকে ভালভাবে আলোড়িত করে সমসত্ত্ব মিশ্রণে পরিণত করা হয়। এবার মিশ্রণের মধ্যে সুগন্ধি দ্রব্য ও রঞ্জক পদার্থ যোগ করা হয় এবং ভালভাবে মিশিয়ে পরিস্রাবণ করা হয়। প্রাপ্ত পরিস্রুত তরলকে বোতলে সংগ্রহ করা হয়।

বর্তমানে প্রসাধনে ও কাপড় কাচার কাজে তরল সাবান ব্যবহার করা হয়।

5.7 সাবানের কার্যকারিতা

সাবান সাধারণত জামাকাপড়ে আটকে থাকা তেল ও চর্বিকে এবং মানুষের দেহের ত্বকে সেঁটে থাকা ময়লা অপসারণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

এই ময়লা বা তেল, চর্বি অপসারণের জন্য জলের প্রয়োজন হয়। সাবানের গঠনাকৃতিতে দুটি প্রধান অংশ বর্তমান— একটি জল আকর্ষী বা জল সন্ধানী ধ্রুবীয় অংশ এবং অন্যটি জল বিকর্ষী বা জলাতঙ্কী অধ্রুবীয় হাইড্রোকার্বন অংশ। ধ্রুবীয় প্রান্ত জলে দ্রবণীয় এবং অধ্রুবীয় প্রান্ত তেলে দ্রবণীয়। সাবানের অধ্রুবীয় প্রান্ত সরল কার্বন শৃঙ্খল ঘটিত হাইড্রোকার্বন বা বেঞ্জিন প্রতিস্থাপিত হাইড্রোকার্বন দ্বারা গঠিত। এবং ধ্রুবীয় অংশ অপরাধর্মী আয়ন, পরাধর্মী আয়ন বা পরা বা উভয়ধর্মী আয়ন দ্বারা গঠিত হতে পারে। সুতরাং সাবান একইসঙ্গে পরিধেয় সামগ্রী থেকে বা শরীর থেকে তেল জাতীয় পদার্থ ও জল উভয়কেই গ্রহণ করে এবং বৃহদাকার অনুসমষ্টি মিসেলি (micelle) গঠন করে। যার আকার কলয়েড কণার মত (সূক্ষ্ম কণা যা ছেঁকে পৃথক করা যায় না।) সুতরাং সাবান একটি উত্তম ইমালসন সৃষ্টিকারী পদার্থ।

সাবান জলে দ্রবীভূত হলে আয়নীয় অংশ জলের সঙ্গে থাকে এবং হাইড্রোকার্বন বা অধ্রুবীয় অংশ জলের স্তরে বিপরীত দিকে থাকে। জলের মধ্যে সাবানের যে অণুগুলি থাকে সেইগুলি একত্রিত হয়ে একটি বিশেষ আকার গ্রহণ করে যার বাইরের দিকে আয়নীয় অংশ এবং ভিতরের দিকে হাইড্রোকার্বন অংশ থাকে। এই বিশেষ আকারবিশিষ্ট অণুসমূহকে মিসেলি বলে। এই মিসেলিগুলি জলের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে। পরিধেয় সামগ্রী বা শরীরের অংশ থেকে তেল জাতীয় ময়লা এই মিসেলির সংস্পর্শে এলে সাবানের হাইড্রোকার্বন অংশ ঐ তেলকে দ্রবীভূত করে পরিধেয় সামগ্রী হইতে অপসারিত করে দেয় এবং পরিধেয় জামাকাপড় পরিষ্কার হয়।

5.8 পরিষ্কারক (Detergents)

পরিষ্কারক কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ যাহা পরিধেয় সামগ্রীকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। পরিষ্কারক সাধারণত অ্যালকিল সালফোনিক অ্যাসিড ও অ্যালকিল বেঞ্জিন সালফোনিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ। পরিষ্কারকের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য আরও কিছু রাসায়নিক সামগ্রী মিশ্রিত করা হয়। এইসব রাসায়নিক সামগ্রীকে এক কথায় বিল্ডার্স বলে। এদের কার্যকারিতা নিম্নরূপ ঃ

1. অপঘর্ষক হিসাবে ক্যালসাইট, সূক্ষ্ম, বালি মিশ্রিত করা হয়। ইহারা ময়লাকে ঘষে তুলে দিতে সাহায্য করে।
2. পরিষ্কারক হিসাবে অম্লজাতীয় পদার্থ সাইট্রিক অ্যাসিড, ফসফরিক অ্যাসিড এবং ক্ষারকীয় পদার্থ যেমন সোডিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম সিলিকেট মিশ্রিত করা হয়। এরা জামা কাপড়ে ময়লা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।
3. জীবাণুনাশকরূপে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট, পাইন তেল ব্যবহার করা হয়। এরা পরিধেয় সামগ্রীর জীবাণুকে ধ্বংস করে।
4. পুনঃস্থাপক রোধক রূপে পরিকার্বনেট ব্যবহার করা হয়। ইহা অপসৃত ময়লাকে পুনরায় জমতে বাধা দেয়।
5. পরিষ্কারককে সুদৃশ্য করে তোলার জন্য বিভিন্ন সংশ্লেষিত জৈব ও অজৈব রং ব্যবহার করা হয়। সুগন্ধি হিসাবে নানাপ্রকার জৈব সুগন্ধির মিশ্রণ এবং সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন জৈব যৌগ যেমন বিউটাইলেটেড হাইড্রক্সি টলুইন, গ্লুটার‍্যালডিহাইড যোগ করা হয়। এগুলি পরিষ্কারককে জারণ, ব্যাকটেরিয়া, পচন প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা করে এবং পরিষ্কারকে দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে।

5.9 পরিষ্কারকের কার্যকারিতা

সাবানের ন্যায় পরিষ্কারক অণুতে একটি জলাকর্ষী আয়নীয় অংশ এবং একটি জল বিকর্ষী হাইড্রোকার্বন অংশ থাকে। ইহারা জলের সঙ্গে মিসেলি (ময়লা পরিষ্কারকের বিক্রিয়ায় উদ্ভূত) উৎপন্ন করে ময়লা অপসারণ করে। পরিষ্কারকের ক্ষারকীয়তা সাবান অপেক্ষা কম। সুতরাং এরা সাবান অপেক্ষা প্রসাধন সামগ্রীর কম ক্ষতি করে। পরিষ্কারকের ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম লবণ জলে দ্রবীভূত হয় বলে এরা খর জলে সাবান অপেক্ষা অধিক কার্যকরী হয়। সাবান ব্যবহারের জন্য মৃদু জল আদর্শ কিন্তু পরিষ্কারক মৃদু বা খর যে কোন জলই ব্যবহার করা যায়।

5.10 পরিষ্কারক ও সাবানের মধ্যে পার্থক্য

পরিষ্কারক ও সাবান উভয়ের মধ্যেই জল বিকর্ষী বা জলাতঙ্কী হাইড্রোকার্বন অংশ এবং জলাকর্ষী আয়নীয় অংশ থাকে। পরিষ্কারক এমন একটি রাসায়নিক মিশ্রণ যার উপরিতল সক্রিয় পদার্থ এবং ফিলার বা উজ্জ্বল কারক বিল্ডার থাকে। বিল্ডারের উপস্থিতির জন্য পরিষ্করণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। পরিষ্কারকে জীবাণুনাশক পদার্থ যোগ করা হয়। পক্ষান্তরে সাবান একটি উচ্চ আণবিক গুরুত্ববিশিষ্ট জৈব অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণ। খর জলের মধ্যে দ্রাব্য ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম লবণ সাবানের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্যলসিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামের অদ্রাব্য লবণ গঠন করে। ফলে ফেনা তৈরি ও পরিষ্কার করায় বাধা সৃষ্টি হয় এবং সাবানের অহেতুক অপচয় হয়। কিন্তু পরিষ্কারক খর জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করলেও উৎপন্ন পদার্থ হয় দ্রাব্য না হয় কলয়েড হিসাবে জলে দ্রবীভূত হয়। পরিষ্কারক জলীয় ও অজলীয় দ্রাবকে দ্রবীভূত করা যায় কিন্তু সাবান শুধুমাত্র জলে দ্রবীভূত হয়। পরিষ্কারকের ক্ষারকীয়তা সাবান অপেক্ষা কম সুতরাং ইহা পরিধেয় সামগ্রীর কম ক্ষতি করে। পরিষ্কারক অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে নর্দমার জলে পরিষ্কারক সঞ্চিত হয়ে জল দূষিত করতে পারে সেই জন্য বর্তমানে কিছু বায়োডিগ্রেডেবল পদার্থ (সহজে জীবাণু দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়) যোগ করা হয়। শর্করা সমন্বিত ধূলো-বালি দূর করার জন্য উৎসেচক অ্যামাইলেজ এবং তৈলাক্ত পদার্থ অপসারণের জন্য লিপিড ভাঙন উৎসেচক লাইপেজ ব্যবহার করা হয়। সুতরাং পরিষ্কারক সাবান অপেক্ষা অধিক কার্যকরী।

পরিষ্কারক কিভাবে জল দূষণে সাহায্য করে তা নিচে খুব সংক্ষেপে বলা হল ঃ

দীর্ঘশৃঙ্খলযুক্ত অ্যালকিল বেঞ্জিন সালফোনিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ পরিষ্কারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অ্যালকিল মূলকে যদি শাখা না থাকে (unbranched alkyl group) তবে ঐ পরিষ্কারক (Linear alkyl sulphonates অথবা LAS) ব্যবহার করার পর প্রাকৃতিক অবনমন বা বিয়োজন ঘটে। সুতরাং এই পরিষ্কারক জল দূষণ করে না। কিন্তু অ্যালকিল মূলকে যদি শাখা থাকে (branched alkyl group) তবে ঐ পরিষ্কারক (alkyl benzene sulphonates অথবা ABS) দীর্ঘদিন অবিকৃত অবস্থায় বিরাজ করে এবং জল দূষণে সাহায্য করে।

তাছাড়া প্রস্তুতকারীরা এখন পরিষ্কারকের সঙ্গে নিচে অজৈব পদার্থগুলিও মিশিয়ে দেন। এগুলি হল-

(i) সোডিয়াম সালফেট 20%

(ii) অজৈব ফসফেট 30-50%

(iii) সোডিয়াম পারবোরেট ফ্লুওরিসিন এবং ফেনা উৎপাদনকারী কিছু পদার্থ

পরিষ্কারক ব্যবহার করার পর নর্দমা দিয়ে যখন এগুলি জলাশয়ে গিয়ে মেশে তখন অতিরিক্ত 'ফসফেট' থাকার ফলে ঐ জলাশয়ের জল অতিপৌষ্টিকতার (eutrophication) জন্য দূষিত হয়। ফসফেট পুষ্টিকর খাদ্যের উপস্থিতিতে নীলচে-সবুজ শ্যাওলা প্রচুর পরিমাণে বাড়তে থাকে। পরে এগুলি পচে গেলে বিযোজনকারী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বৃদ্ধি ঘটে এবং জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। এর ফলে জলজ প্রাণী ও মাছ অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়।

5.11 জল (Water)

পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশই জল। আর জলের সহিত আমাদের পরিচয় আমাদের জন্মলগ্ন থেকেই। পূর্বে জল একটি মৌলিক পদার্থ বলে গণ্য হত। কিন্তু 1781 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ক্যাভেন্ডিস প্রমাণ করেন জল একটি যৌগিক পদার্থ এবং পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ার বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিত হন যে জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে সৃষ্ট একটি রাসায়নিক যৌগ।

দৈনন্দিন প্রয়োজনে, কৃষিকার্যে ও শিল্প-প্রয়োজনে এবং পানীয়রূপে জলের ব্যবহার অপরিহার্য। রন্ধনকার্যে, পরিধেয় বস্ত্রাদি ধৌত করতে, কৃষিকার্যে সেচের জন্য, শিল্পে বয়লার চালানোর জন্য, রাসায়নাগারে দ্রাবকরূপে, ফটোগ্রাফি ও ঔষধি প্রস্তুতিতে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়।

5.12 শ্রেণীবিভাগ

সাবানের সঙ্গে ব্যবহার বিচার করে প্রাকৃতিক জলকে দুভাগে ভাগ করা যায় যথা- 1. মৃদু জল এবং 2. খর জল।

5.12.1 মৃদু জল

যে জলে সহজে সাবানের ফেনা উৎপন্ন হয় এবং সহজে খাদ্য দ্রব্য সুসিদ্ধ হয় তাহাকে মৃদু জল বলে।

5.12.2 খর জল

যে জলে সহজে সাবানের ফেনা উৎপন্ন হয় না কিন্তু অনেক সাবান ব্যবহারের ফলে ফেনা হয় বা সহজে খাদ্য দ্রব্য সিদ্ধ হয় না তাকে খর জল বলে। জলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম আয়নের বাইকার্বনেট, ক্লোরাইড, সালফেট লবণ দ্রবীভূত থাকে বলে খরতার সৃষ্টি হয়। সাবানের সঙ্গে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম বিক্রিয়া করে অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম লবণের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে, ফলে সাবানের ফেনা উৎপন্ন হয় না।

সোডিয়াম স্টিয়ারেট + ক্যালসিয়াম আয়ন ⟶ ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেট + সোডিয়াম আয়ন
(সাবান) (খর জল) (সাদা অধঃক্ষেপ)

5.13 খর জলের শ্রেণীবিভাগ

জলের মধ্যে দ্রবীভূত লবণের প্রকৃতি অনুযায়ী খর জলকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- 1. অস্থায়ী খর জল 2. স্থায়ী খর জল।

5.13.1 অস্থায়ী খর জল

ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট, ম্যাগনেসিয়াম বাইকার্বনেট ও কখনো কখনো আয়রন বাইকার্বনেট লবণ জলে দ্রবীভূত থাকলে যে খরতার সৃষ্টি হয় তাকে অস্থায়ী খর জল বলে। শুধুমাত্র ফুটিয়ে ও পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে জলের অস্থায়ী খরতা দূর করা যায়।

5.13.2 স্থায়ী খর জল

ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রনের ক্লোরাইড, সালফেট লবণ জলে দ্রবীভূত থাকলে জলে যে খরতার সৃষ্টি হয় তাকে স্থায়ী খরতা বলে এবং এই জলকে স্থায়ী খর জল বলে। স্থায়ী খরতাকে শুধুমাত্র ফুটিয়ে খরতা দূর করা যায় না।

5.14 খরতা দূরীকরণ বা জল মৃদুকরণ

খর জলের মধ্যে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম আয়রনের বাইকার্বনেট, ক্লোরাইড, সালফেট লবণকে কোন সহজ ভৌত প্রক্রিয়া বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অদ্রাব্য ক্যলসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম আয়রন লবণরূপে অধঃক্ষিপ্ত করতে পারলেই জলের খরতা দূর হয় এবং খর জল মৃদু জলে পরিণত হয়।

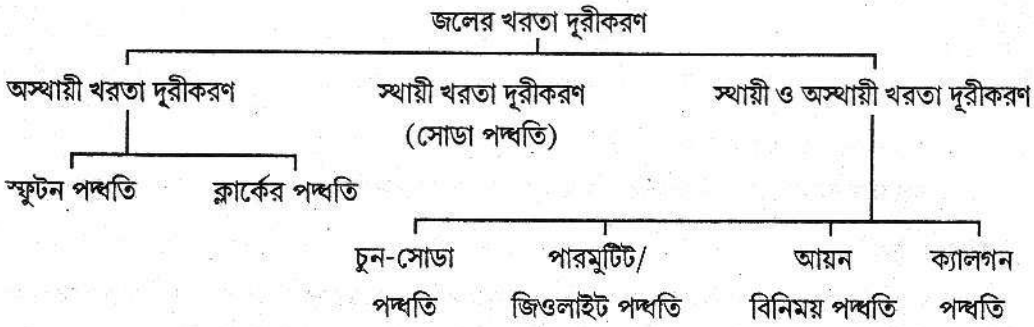

5.14.1 স্ফুটন পদ্ধতি

অস্থায়ী খর জলকে স্ফুটন পদ্ধতির সাহায্যে মৃদু জলে রূপান্তরিত করা যায়। স্ফুটনের ফলে দ্রাব্য ধাতব বাইকার্বনেট লবণ অদ্রাব্য ধাতব কার্বনেটে পরিনত হয় এবং অধঃক্ষিপ্ত হয়। ইহাকে পরিস্রাবণ (ছাঁকন) প্রক্রিয়ার দ্বারা মৃদু জল করা যায়।

অস্থায়ী খর জল (দ্রাব্য ধাতব বাইকার্বনেট) $\xrightarrow{\text{স্ফুটন}}$ অদ্রাব্য ধাতব কার্বনেট (অধঃক্ষেপ) $\xrightarrow{\text{পরিস্রাবণ}}$ মৃদু জল

5.14.2 ক্লার্কের পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে অস্থায়ী খর জলের সঙ্গে পরিমাণ মত কলিচুন যোগ করা হয়, ফলে অদ্রাব্য ধাতব কার্বনেটের অধঃক্ষেপণ হয় (থিতিয়ে পড়ে)।

কোক কার্বন বা বালির মধ্যে ছাঁকিয়া অধঃক্ষেপ দূর করা হয় এবং মৃদু জল পাওয়া যায়।

অস্থায়ী খর জল + কলিচুন = ধাতব কার্বনেট + মৃদু জল
(অধঃক্ষেপ)

5.14.3 ক্লার্কের পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে অস্থায়ী খর জলের সঙ্গে পরিমাণ মত কাপড় কাচার সোডা যোগ করা হয়। ফলে অদ্রাব্য ধাতব কার্বনেটের অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই অধঃক্ষেপ পরিস্রাবণ করিয়া (ছাঁকিয়া) পৃথক করা হয় এবং মৃদু জল সংগ্রহ করা হয়।

অস্থায়ী খর জল + সোডা = ধাতব কার্বনেট + দ্রাব্য সোডিয়াম লবণ

(দ্রাব্য ধাতব লবণ) (অদ্রাব্য অধঃক্ষেপ)

5.14.4 চুন সোডা পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে উপযুক্ত অনুপাতে কলিচুন ও কাপড় কাচার সোডা মিশ্রিত করা হয়। ফলে অদ্রাব্য ধাতব কার্বনেট ও ধাতব হাইড্রক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। পরিস্রাবণ পদ্ধতির সাহায্যে এই অধঃক্ষেপ পৃথক করে মৃদু জল সংগ্রহ করা হয়।

5.14.5 পারমুটিট বা জিওলাইট পদ্ধতি

প্রাকৃতিক জিওলাইট বা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত পারমুটিট আসলে সোডিয়াম অ্যালুমিনয়াম সিলিকেট (সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন ও অক্সিজেনের একটি রাসায়নিক যৌগ)।

পারমুটিটকে একটি উচ্চ গোলাকার প্রকোষ্ঠের মধ্যে রাখা হয়। প্রকোষ্ঠের ভিতরে পারমুটিটের উপরে ও নীচে মোটা বালির ও পাথরের নুড়ির স্তর থাকে। প্রকোষ্ঠের উপর হতে খর জলের প্রবাহ পাঠানো হয়। প্রকোষ্ঠের মধ্যে খর জলের মধ্যস্থ দ্রাব্য ধাতব লবণগুলির (ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রনের লবণ) অদ্রাব্য ধাতব পারমুটিটে পরিনত হয়। প্রকোষ্ঠের তলদেশ হইতে যে পরিস্রুত জল পাওয়া যায় তাহা মৃদু জল।

সোডিয়াম-পারমুটিট + খর জল = ক্যালসিয়াম-পারমুটিট + মৃদু জল

5.14.6 আয়ন বিনিময় রেজিন পদ্ধতি

কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বৃহদাকার জটিল সংযুতি রেজিন প্রধান সালফোনিক অ্যাসিড যৌগ। প্রথমে সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ প্রবাহিত করে রেজিনকে সোডিয়াম লবণে পরিনত করা হয় এবং পরে ইহার উপর দিয়ে খর জল পাঠালে জলের খরতা দূরীভূত হয়। এই প্রক্রিয়ায় রেজিনে উপস্থিত সোডিয়াম আয়নের সঙ্গে খর জলের ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন আয়নের বিনিময় ঘটে এবং খর জল মৃদু জলে রূপান্তরিত হয়।

5.15 খর জল ব্যবহারের অসুবিধা

1. গৃহস্থালির কার্য যেমন পরিধেয় বস্ত্রাদি ধৌতাদি পর্বে খর জল ব্যবহার করা উচিত নয়। খর জলে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন ধাতুর লবণ সাবানে উপস্থিত সোডিয়াম, পটাশিয়াম লবণের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অদ্রাব্য লবণ অধঃক্ষিপ্ত করে ফলে সাবান ও জলের মিশ্রণে ফেনা উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে। এর ফলে অহেতুক সাবানের অপচয় হয়।
2. কেটলীতে দীর্ঘদিন খর জল উত্তপ্ত করলে কেটলীর ভেতরে একটি অদ্রাব্য তাপ অপরিবাহী আস্তরণ জমা হতে থাকে। ফলে কেটলীতে জল সহজে গরম হয় না। এক্ষেত্রেও অহেতুক জ্বালানীর অপচয় হয়।

3. রন্ধনকার্যেও অত্যধিক খর জল ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ খর জলে খাদ্যদ্রব্য সহজে সুসিদ্ধ হয় না এবং ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী
4. শিল্পের প্রয়োজনে স্টীম উৎপাদনে খর জল ব্যবহার করলে বয়লারের ক্ষতি হয়। বয়লারের তলদেশে যে আস্তরণ পড়ে, তাপ প্রয়োগে তাহার অসমান সম্প্রসারণ ঘটে এবং বয়লার বিস্ফোরণসহ ফেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

5.16 খরতার মাত্রা

জলের খরতা মি.গ্রা./লি. বা 'প্রতি দশ লক্ষ ভাগের কত ভাগ' ((ppm) এইরূপে প্রকাশ করা হয়। প্রতি দশ লক্ষ ভাগ ওজনের জলে যত ভাগ ওজনের ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা উহার সমতুল্যাংক পরিমাণ অপরাপর খরতা সৃষ্টিকারী ধাতব লবণ থাকে তত ভাগ ওজনই ঐ জলের খরতার মাত্রা (parts per million).

5.17 সারাংশ

- এই এককের আলোচনা থেকে আপনি যা শিখেছেন তার সারসংক্ষেপ হল ঃ
- সাবান আসলে কি ধরণের রাসায়নিক পদার্থ
- উদ্ভিজ্জ তেল বা প্রাণীজ চর্বি থেকে কি পদ্ধতিতে সাবান প্রস্তুত করা হয়
- সাবান শিল্পে উপজাত হিসাবে গ্লিসারিন পাওয়া যায়
- প্রসাধনী সাবান ও তরল সাবান প্রস্তুতির জন্য কি কি কাঁচামালের প্রয়োজন হয় এবং কিভাবে এগুলি প্রস্তুত করা হয়
- সাবানের গঠনাকৃতিতে দুটি প্রধান অংশ থাকে–জল আকর্ষী ধ্রুবীয় অংশ এবং জলাতঙ্কী অধ্রুবীয় অংশ— এরা কিভাবে কাজ করে
- পরিষ্কারক সাধারনত অ্যালকিল সালফোনিক অ্যাসিড ও অ্যালকিল বেঞ্জিন সালফোনিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ
- মৃদু ও খর জলে সাবান ও পরিষ্কারক কিভাবে কাজ করে এবং কোন্ জল সাবানের ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক এবং কেন
- মৃদু জল ও খর জল কাদের বলে। জলের খরতা কয় প্রকার ও কি কি? কিভাবে জলের খরতা দূর করা যায়
- খর জল ব্যবহারের অসুবিধাগুলি কি কি
- জলের খরতার মাত্রা মি. গ্রা./লি. বা ppm এককে প্রকাশ করা হয়

একক 6 □ ওষুধ ও জীবাণুনাশকের রসায়ন (Medicines and Antiseptics)

গঠন

6.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

6.1 ওষুধের শ্রেণীবিভাগ

6.1.1 সাধারণ জ্বর, ব্যথা-বেদনা, প্রদাহ উপশমের জন্য ব্যবহৃত ওষুধ

6.1.2 চর্মরোগের ওষুধ

6.1.3 পচন নিবারক ওষুধ

6.1.4 চেতনানাশক ওষুধ

6.1.5 অম্লনাশক ওষুধ

6.1.6 ম্যালেরিয়া প্রতিরোধী ওষুধসমূহ

6.1.7 অ্যামিবোয়িক ও ব্যাসিল্যারি আমাশয় রোগের উপশমের জন্য ওষুধ

6.1.8 অ্যান্টিবায়টিক ওষুধসমূহ

6.2. সারাংশ

6.0 প্রস্তাবনা

মানব সভ্যতার বিকাশ যখন ঘটেনি এবং মানুষের মনের অন্ধকার জগত যখন বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়নি তখনও শারীরিক অসুস্থতার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে মানুষ নানারকমের ফল, মূল, গাছ-গাছলার পাতা ও ছাল প্রভৃতি ব্যবহার করতে জানত।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রসারতাও বাড়ল। কোন্ ওষুধ প্রয়োগে কোন্ রোগের উপসম হয় তা মানুষের করায়ত্ত হল। শুধু বনৌষধির ব্যবহারই নয়, রসায়নাগারে বিভিন্ন ওষুধ সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে কিভাবে প্রস্তুত করা যায় তার রসায়নও বিজ্ঞানীদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বিংশ শতাব্দিতে বিজ্ঞানীরা এমন সম জীবনদায়ী ওষুধ আবিষ্কার করেছেন যা শুধু রোগের উপশমই করেনি, মানুষের পরমায়ও বাড়িয়ে দিয়েছে। কোন্ ওষুধ ব্যবহার করলে সাধারণ রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তা আমরা অনেকেই কিছু না কিছু জানি। সর্দি-কাশির জন্য বনৌষধি, যেমন তুলসী পাতা, শিউলি পাতা বা বাসক পাতার রস খেলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। এখন URTI তে ARI module Presuibes honey, Talsi and Basak. আবার ম্যালেরিয়া রোগের উপশমের জন্য কুইনিন, ক্লোরোকুইন বা এই জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়। মাথাধরা, শরীরের ব্যথা-বেদনার হাত থেকে সাময়িক রেহাই পাবার জন্য ডিস্প্রিন, অ্যানাসিন ব্যবহার করে থাকি। Blunt Trauma খেলতে গিয়ে পায়ে ব্যথা

পেলে আয়োডেক্স, ইউথেরিয়া, মুভ প্রভৃতি মলম ব্যবহার করে উপকার পাই। শরীরের কোন অংশ সামান্য কেটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশটুকু পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ও পরে শুকিয়ে নিয়ে বিটাডিন মারকিউরোক্রোম (2% অ্যালকোহলীয় দ্রবণ) লাগালে সহজেই ক্ষত স্থানের পচন রোধ করা যায়। গুরুপাক খাবার খেলে অম্লের সৃষ্টি হয়। জেলুসিল, অ্যালুড্রেক্স, পলিক্রল, র‍্যানটাক, ঠান্ডা দুধ প্রভৃতি ওষুধ খেলে অম্লের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। রোগ নিবারণের জন্য এইরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে।

রোগ উপশমের জন্য অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ মত সঠিক ওষুধ গ্রহণ করতে হবে।

এই এককে আমরা কয়েকটি নির্দিষ্ট ওষুধের প্রস্তুতি খুব সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে আলোচনা করব।

শিক্ষার্থীরা বিশেষ অনুসন্ধিৎসা মেটানোর জন্য কিছু ওষুধের রাসায়নিক গঠন উল্লেখ করা হল।

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠের উদ্দেশ্য হল যে সকল রাসায়নিক যৌগ সাধারণ রোগের উপশমের জন্য ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাদের সঙ্গে আপনি পরিচিত হতে পারবেন। আপনি যা যা জানতে পারবেন তা হল-

- ওষুধের শ্রেণীবিভাগকরণ
- ব্যথাবেদনা, প্রদাহ ও সাধারণ জ্বর প্রশমের জন্য ওষুধ চিহ্নিতকরণ ও প্রস্তুতি
- চর্মরোগের জন্য ব্যবহৃত ওষুধের প্রকৃতি
- পচননিবারক, অম্লনাশক ও চেতনানাশক ওষুধের নাম ও রাসায়নিক প্রকৃতি
- ম্যালেরিয়া নিরাময়ের জন্য ওষুধ এবং তাদের রাসায়নিক গঠন
- আমাশয় রোগ নিরাময় করার জন্য ওষুধসমূহ
- জীবাণুনাশক ও সংক্রমকরোগ প্রশমনের জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি অ্যান্টিবায়টিকের নাম ও গঠন
- রোগ উপশমে সালফোনামাইড-এর প্রয়োগ এবং এদের রাসায়নিক গঠন

6.1 ওষুধের শ্রেণীবিভাগ

এক এক ধরনের ওষুধ এক এথ রকম রোগের উপশমের জন্য ব্যবহৃত হয়। কোন্ রোগের জন্য কোন্ ওষুধ বা ওষুধসমূহের প্রয়োজন, এদের গঠন প্রকৃতি কেমন, তার উপর ভিত্তি করেই ওষুধের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। এই এককেই গঠনেই তা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন, সাধারণ জ্বর, ব্যথা-বেদনার জন্য প্যারাসিটামল ক্রোসিন; চর্মরোগের ন্য স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। চেতনানাশক ও ঘুমের ওষুধ হিসাবে প্রতিস্থাপিত বারবিটিউরিক অ্যাসিড-- যেমন ভেরোনান, লুমিনালের ব্যবনালের ব্যবহার। ম্যালেরিয়া রোগের জন্য কুইনিন, ক্লোরোকুইন; অম্লনাশক ওষুধ হিসাবে ধাতব হাইড্রক্সাইড ব্যবহার করা হয়। জীবাণুনাশক ও সংক্রামক রোগের জন্য পেনিসিলিন; টাইফয়েড রোগের জন্য ক্লোরামফিনিকল ও যক্ষ্মারোগের জন্য স্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি ওষুধের সঙ্গে আমরা পরিচিত।

6.1.1 সাধারণ জ্বর, ব্যথা-বেদনা, প্রদাহ উপশমের জন্য ব্যবহৃত ওষুধ (Antipyretic and Analgesic Drugs)

এখানে তিনটি ওষুধের নাম, সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে প্রস্তুতি ও ধর্ম সংক্ষেপে বলা হল ঃ

1. প্যারাসিটামল (paracetamol) :

ব্যবহার ঃ জ্বর, ব্যথা-বেদনা- যেমন, মাথাধরা, দাঁতের ব্যথার জন্য ব্যবহৃত হয়। বয়স্কদের টেবলেট এবং শিশুদের জন্য প্যারাসিটামল সিরাপ দেওয়া হয়। বাজারে প্রচলিত ওষুধ কম্বিফ্লামে (combiflam) প্যারাসিটামল থাকে। → With Ibuprotca → Bronchial Asthna in Childrca.

2. অ্যাসপিরিন ঃ রাসায়নিক নাম অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। → Prevcation of Strokes.

ব্যবহার ঃ গা-হাত পা ব্যথা, মাথাধরা উপশমের জন্য ব্যবহৃত হয়। অ্যাসপিরিন আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। বেশি পরিমাণে ব্যবহার করলে অথবা অনেকদিন ধরে এই ওষুধ খেলে খাদ্যনালীতে আলসার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই এই ওষুধ ব্যবহার করার পর প্রচুর পরিমাণে জল পান করা উচিত।

3. মিথাইল স্যালিসাইলেট ঃ

ব্যবহার ঃ হাতে-পায়ে ব্যথা উপশমের জন্য ব্যবহৃত হয়। আয়োডেক্স, ইউথেরিয়া, মুভ প্রভৃতি মলমে এই যৌগটি বর্তমান।

6.1.2 চর্মরোগের ওষুধ

আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগের শিকার হয়ে থাকি। এই রোগের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য খাবার ওষুধ ছাড়াও বিভিন্ন মলম যেমন- Betnovet N, Betnovet C, Diprovate, Supragent ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায়। রোগের প্রকৃতি উপর নির্ভর করে কি ওষুধ ব্যবহার করতে হবে তা অবশ্যই ডাক্তার পরামর্শ দেবেন। এখানে আমরা শুধুমাত্র দাঁদ রোগ উপশমের জন্য একটি ওষুধের নাম উল্লেখ করব যা ব্যবহার করলে দাঁদ সহজেই সেরে যায়।

6.1.3 পচন নিবারক ওষুধ (Antiseptic Drugs)

মারকিউরোক্রোম ঃ

ব্যবহারের পদ্ধতি ঃ 2% মারকিউরোক্রোমের অ্যালকোহলীয় দ্রবণ (লাল বর্ণের) ক্ষতস্থানে ব্যবহার করা হয়।

মারকিউরোক্রোম ছাড়া আরও অনেক পচন নিবারক ওষুধ ক্রিম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন- বোরোলীন, বোরোপ্লাস, বোরোক্যালেন্ডুলা ও বোরোসফট্। এদের প্রত্যেকের মধ্যেই বোরিক অ্যাসিড আছে। সেই কারণে রৌদ্রে বেরনোর আগে না লাগিয়ে বেরোনো উচিত।

6.1.4 চেতনাশক ওষুধ (Sedatives, Hypnotics and Tranquilisers)

কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রকে অবশ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষুধ পাওয়া যায়।

প্রতিস্থাপিত বারবিটিউরিক অ্যাসিড ঃ

সিডেটিভস্ ও হিপনোটিকস্ ওষুধ ব্যবহার করলে ঘুমের বা ঝিমানোর আবেশ তৈরি হয়। যেমন প্রতিস্থাপিত বারবিটিউরিক অ্যাসিড। এই ওষুধগুলি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রয় করা হয় না।

6.1.5 অম্লনাশক ওষুধ

আমাদের পাকস্থলী থেকে প্রায় 1 M HCL-এর ক্ষরণ হয়। এই অবস্থায় পাকস্থলীতে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে না এবং এন্‌জাইম সহজেই প্রোটিনের উপর বিক্রিয়া করে হজমে সাহায্য করে। কিন্তু পাকস্থলীতে খুব বেশি অ্যাসিডের ক্ষরণ ঘটলে হজমে ব্যাঘাত ঘটে।

পরিপাকক্রিয়া সুসম্পন্ন না হলে খাবার থেকে অম্ল সৃষ্টি হয়। এর ফলে পেট ফেঁপে যায়, কখনও কখনও টক টক ঢেকুর ওঠে এবং বমিও হতে পারে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য প্রচুর পরিমাণে জল পান করা উচিত। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের অম্লনাশক ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের ওষুধগুলি সবই ক্ষারজাতীয়। যেমন, অ্যালুড্রক্স অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড [Al $(OH)_3$]; জেলুসিলে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড [Mg $(OH)_2$]; পলিক্রলে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড ও অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইডের [Mg $(OH)_2$ + AL$(OH)_3$] মিশ্রণ থাকে। ক্ষার অম্লকে প্রশমন করে।

6.1.6 ম্যালেরিয়া প্রতিরোধী ওষুধসমূহ

স্যার রোনাল্ড রস্ ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারের কারণ আবিষ্কার করেন (১৮৯৭) স্ত্রী অ্যানোফেলিস মশকে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট, প্লাসমোডিয়াম-এর জীবন ইতিহাস পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছিলেন যে মশকের কামড়েই মানুষের রক্তে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু প্রবেশ করে।

এই রোগ উপশমের জন্য বাজারে অনেক ধরনের ওষুধ পাওয়া যায়। এখানে তিনটি ওষুধের নাম ও গঠন সংকেত দেওয়া হল।

1. কুইনিন (Quinine) :

সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে কুইনিন সংগ্রহ করা হয়।

নিষ্কাশন পদ্ধতি ঃ

সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে প্রায় 8% কুইনিন পাওয়া যায়। গাছের ছাল শুকনো করে গুড়ো করা হয়। এই গুড়োতে ক্ষারের জলীয় দ্রবণ যোগ করা হয়। এই মিশ্রণে প্রয়োজনমত বেঞ্জিন অথবা টলুইন যোগ করে দ্রাবক-নিষ্কাশন পদ্ধতিতে (solvent extraction) উপক্ষারগুলি নিষ্কাশন করা হয়। জৈব দ্রাবকস্তর পৃথক করে তার মধ্যে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড দিলে কুইনন, সিঙ্কোনিন প্রভৃতি উপ ক্ষারের সালফেট লবণ উৎপন্ন হয়। এই আম্লিক দ্রবণকে পৃথক করে আবার ক্ষারের সাহায্যে প্রশমিত করলে কুইনিন সালফেট অধঃক্ষিপ্ত হয়। হাইড্রোক্লোরাইড অথবা সালফেট লবণ হিসাবে কুইনিন ব্যবহৃত হয়।

ধর্ম ঃ

কুইনিন ওষুধটি অত্যন্ত তেতো। কেলাসিত কুইনিনের গলনাঙ্ক প্রায় 177° - 178° কুইনিন উপক্ষার জলে প্রায় অদ্রাব্য।

2. ক্লোরোকুইন (chloroquine) :

কুইনিনের মতই ওষুধটি তেঁতো। ক্লোরোকুইন ডাইফসফেট সাদা পাউডার হিসাবে পাওয়া যায় ও জলে দ্রাব্য। গলনাঙ্ক প্রায় 210°.

ম্যালেরিয়ার ওষুধ হিসাবে ক্লোরোকুইন, কুইনিন থেকে অধিক কার্যকর। ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট ধ্বংস করতে প্রায় 1.4 - 1.5 গ্রা ক্লোরোকুইনের প্রয়োজন হয়।

3. পামাকুইন (pamaquine) :

ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রেহাই পাবার আরও একটি ওষুধ হল পামাকুইন। ক্লোরোকুইনের সঙ্গে পামাকুইনের তফাৎ হল, পামাকুইনে প্রতিস্থাপিত অ্যামিন মূলকটি কুইনোলিন বলয়ের 8 নং কার্বনের সঙ্গে যুক্ত। এতে ক্লোরিন অনুপস্থিত; কিন্তু 6 নং কার্বনের সঙ্গে একটি মিথাক্সিমূলক যুক্ত আছে।

6.1.7 অ্যামিবোয়িক ও ব্যাসিলারি আমাশয় রোগের উপশমের জন্য ওষুধ

এই রোগে নিম্নলিখিত সংমিশ্রণের ওষুধ খাওয়া প্রয়োজন। যেমন Ornidazde এবং Offoxacin.

61.8 অ্যান্টিবায়টিক ওষুধসমূহ

নিচে কয়েকটি আন্টিবায়টিক ওষুধের নাম, আবিষ্কর্তার নাম, রাসায়নিক গঠন এবং কোন্ অসুখের জন্য ব্যবহার করা হয় তার উল্লেখ করা হল। 1942 সালে Waksman প্রথম অ্যান্টিবায়টিক শব্দটি ব্যবহার করেন।

1. পেনিসিলিন জি. (penicillin G) :

1929 অ্যালেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। এই ওষুধটি জীবাণুনাশক এবং সংক্রমক রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্যবহার কর হয়।

2. স্ট্রেপটোমাইসিন (streptomycin) :

এই ওষুধ যক্ষ্মা, মেনিনজাইটিস ও নিমোনিয়া রোগ নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

3. ক্লোরোমাইসেটিন বা ক্লোরামফিনিকল (chloromycetin or chloramphenicol) :

এই ওষুধটি টাইফয়েড বা প্যারাটাইফয়েড রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়।

6.2 সারাংশ

- এই এককটি পাঠ করে আপনি যে তথ্য জানতে পেরেছেন সেগুলির সার-সংক্ষেপ হল ঃ
- ওষুধের শ্রেণীবিভাগ কি ভিত্তিতে করা হয়েছে
- জ্বর, ব্যথা-বেদনা প্রশমনের জন্য কি ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয়- যেমন, জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল; মাথা ধরার জন্য অ্যাসপিরিন, ব্যথার জন্য আয়োডেক্স, ইউথেরিয়া প্রভৃতি ব্যবহার করি।

● চর্মরোগ—বিশেষ করে দাঁদজাতীয় রোগের জন্য স্যালিসাইলিক অ্যাসিড সম্পৃক্ত অ্যালকোহলীয় দ্রবণের ব্যবহার

● মারকিউরোক্রোম একটি পচন নিবারক ওষুধ

● চেতনানাশক ও স্নায়বিক উত্তেজনা হ্রাসের ওষুধ হিসাবে ভেরোনাল, লুমিনাল, হাইড্রালজিন, রিসারপিন ইত্যাদির ব্যবহার ও LSD-র অপকারিতা

● অম্লনাশক ওষুধের প্রকৃতি কি

● ম্যালেরিয়ার ওষুধ ও এদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কি? সিঙ্কোনা গাছ থেকে কিভাবে কুইনিন সংগ্রহ করা হয়

● অ্যামিবোরিকও ব্যাসিল্যারি আমাশয়ে ব্যবহৃত ওষুধের নাম ও রাসায়নিক গঠন

অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ—যেমন পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, ক্লোরাম-ফিনিকল—এদের রাসায়নিক গঠন ও ব্যবহার

একক 7 □ চর্বি ও তেল (Fats and Oils)

গঠন

7.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

7.1 চর্বি ও তেলের রাসায়নিক প্রকৃতি

7.1.1 উদ্ভিজ তেলের সঙ্গে খনিজ তেলের পার্থক্য

7.2 খাদ্য তালিকায় চর্বি ও তেলের প্রয়োজনীয়তা

7.2.1 খাদ্যের উপযোগী/অনুপযোগী চর্বি ও তেল

7.3 সারাংশ

7.0 প্রস্তাবনা

আমরা বেঁচে থাকার জন্য যে খাদ্য প্রতিদিন গ্রহণ করে থাকি তার মধ্যে প্রধান তিন শ্রেণীর খাদ্য হল প্রোটিন, শর্করা এবং চর্বি ও তেল। প্রোটিন যেমন শরীর গঠনের (body building) জন্য প্রয়োজন, তেমনি শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন শর্করা এবং চর্বি ও তেল (energy food) জাতীয় খাদ্য।

খাদ্য পরিপাকের ফলে শর্করা এবং চর্বি ও তেল থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা কেবলমাত্র আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের প্রেরণাই যোগায় না আমাদের দেহের অনুকূল তাপমাত্রাও সর্বদা বজায় রাখে।

চর্বি ও তেল যে শুধু মানুষের প্রধান খাদ্য তালিকাতেই স্থান করে নিয়েছে তাই নয়, এই শ্রেণীর জৈব যৌগের শিল্পেও প্রচুর চাহিদা রয়েছে। যেমন-- সাবান শিল্পে, গ্লিসারিন তৈরি করতে, শুষ্ক তেল (drying oil) প্রস্তুতিতে বা লিনোলিয়াম অয়েল ক্লথ (oil cloth) ইত্যাদি তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়।

চর্বি, তেল ও মোম উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ উৎস থেকে প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা হয়। প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত এই শ্রেণীর জৈব পদার্থগুলিকে 'লিপিড' (lipid) বলে। গ্রীক ভাষায় 'লিপিড' শব্দের অর্থ হল চর্বি। যে লিপিডসমূহ অ্যাসিডের উপস্থিতিতে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যালকোহল উৎপন্ন করে তাদের 'সরল লিপিড' বলে। এই সরল লিপিডসমূহকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়–

চর্বি ও তেল ঃ এইগুলি আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড ও 'গ্লিসারল' উৎপন্ন করে।

মোম ঃ এইগুলি আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড ও দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল উৎপন্ন করে।

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে চর্বি, তেল ও মোম রাসায়নিক জৈব 'এস্টার' শ্রেণীর যৌগ। ফ্যাটি অ্যাসিড ছাড়া চর্বি ও তেলে থাকে গ্লিসারল; আর মোমে থাকে দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল।

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠের পর আপনি যা শিখতে পারবেন তা হল ঃ

- চর্বি ও তেল কোন্ শ্রেণীর জৈব যৌগ এবং এদের প্রাকৃতিক উৎস কি
- উদ্ভিজ্জ তেল/প্রাণিজ চর্বি ও তেলের সঙ্গে খনিজ তেলের পার্থক্য কোথায়
- আমাদের খাদ্য তালিকায় চর্বি ও তেলের প্রয়োজন কেন? কোন কোন্ তেল আমাদের খাদ্যের উপযোগী এবং কোন্ কোন্ তেল খাদ্যের উপযোগী নয়
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস থেকে উৎপন্ন তেলের মধ্যে মিল বা অমিল কোথায়
- প্রাকৃতিক উৎস থেকে তেলের নিষ্কাশন পদ্ধতিসমূহ
- অশোধিত চর্বি বা তেলের শোধন করার পদ্ধতি
- প্রাণিজ চর্বি সাধারণত কঠিন এবং উদ্ভিজ্জ তেল তরল কেন
- চর্বি ও তেলের রাসায়নিক গঠন ও নামকরণ
- ভৌত ধর্ম ও রাসায়নিক বিক্রিয়া
- তেল থেকে বনস্পতি প্রস্তুতকরণ
- চর্বি ও তেলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ–সাবানীভবন মান (saponification value), আয়োডিন মান (iodine value), অম্লমান (acid value) প্রভৃতি বলতে কী বোঝায়
- চর্বি ও তেল দীর্ঘদিন বায়ুর সংস্পর্শে রাখলে (rancid) হয় কেন

7.1 চর্বি ও তেলের রাসায়নিক প্রকৃতি

প্রাণিজ চর্বি ও উদ্ভিজ তেল 'এস্টার' শ্রেণীর জৈব যৌগ। জৈব অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় 'এস্টার' ও জল উৎপন্ন হয়।

$$\text{অজৈব অ্যাসিড} + \text{ক্ষার} = \text{লবণ} + \text{জল}$$

সাধারণ তাপমাত্রায় এস্টার যৌগ যখন কঠিন অবস্থায় থাকে তখন তাকে বলা হয় চর্বি, আর যখন তরল অবস্থায় থাকে বলা হয় তেল। নারকেল তেল শীতকালে কঠিন (চর্বি) এবং গ্রীষ্মকালে তরল (তেল) অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ চর্বি কম গলনাঙ্ক বিশিষ্ট কঠিন পদার্থ।

7.1.1 উদ্ভিজ্জ তেলের (vegetable oil) সঙ্গে খনিজ তেলের (mineral oil) পার্থক্য

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে চর্বি ও তেল জৈব 'এস্টার' শ্রেণীর যৌগ। এই যৌগগুলি কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন C,H,O) মৌলিক উপাদান দিয়ে গঠিত।

কিন্তু খনিজ তেল [পেট্রোলিয়াম] মূলতঃ 'হাইড্রোকার্বন' শ্রেণীর জৈব যৌগ। অর্থাৎ খনিজ তেল শুধু কার্বন ও হাইড্রোজেন (C, H) মৌলিক উপাদান দিয়ে গঠিত।

7.2 খাদ্য তালিকায় চর্বি ও তেলের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের শরীর ধারণের জন্য বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের প্রয়োজন। যেমন– প্রোটিন, শর্করা, চর্বি ও তেল, ভিটামিন ও খনিজ লবণ= প্রোটিন শরীর গঠনের জন্য প্রয়োজন আবার শর্করা, চর্বি ও তেলের পরিপাক ক্রিয়ার ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়। এই শক্তিই আমাদের দৈনন্দিন কাজ করার ক্ষমতার উৎস এবং আমাদের দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখে।

প্রোটিন – C, H, O, N মৌলিক পদার্থ নিয়ে গঠিত

খাদ্য পরিপাকের ফলে তিন শ্রেণীর প্রধান খাদ্য থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা সারণী – 1 এ উল্লেখ করা হল ঃ

সারণী –1

প্রধান খাদ্যের নাম (প্রতি গ্রাম)	উৎপন্ন শইক্তর পরিমাণ (কি. জুল)
প্রোটিন	16.74
শর্করা	23.01
চর্বি বা তেল	33.50

7.2.1 খাদ্যের উপযোগী/অনুপযোগী চর্বি ও তেল

প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সমস্ত তেলই খাবার উপযুক্ত নয়। খাবার উপযুক্ত কয়েকটি তেলের (edible oil) নাম সারণী– 2a-তে উল্লেখ করা হল ঃ

সারণী– 2a

ক্রমিক সংখ্যা	তেলের নাম
1.	সর্ষের তেল (mustard oil)
2.	নারকেল তেল (coconut oil)
3.	সয়াবিন তেল (soyabean oil)
4.	ধানের তুষের তেল (rice oil)
5.	বাদাম তেল (groundnut oil)
6.	পাম তেল (palm oil)
7.	সূর্যমুখী তেল (sunflower oil)
8.	রেপসীড তেল (rapeseed oil)

আর যে তেলসমূহ খাবার উপযুক্ত নয় (inedible oil) সে রকম কয়েকটি তেলের নাম সারণী 2b তে দেওয়া হল ঃ

সারণী 2b

ক্রমিক সংখ্যা	তেলের নাম
1.	মশিনাবীজ তেল (linseed oil)
2.	তুলাবীজ তেল (cottonseed oil)
3.	রেড়ির তেল (castor oil)
4.	তিল তেল (sesame oil)

7.3 সারাংশ

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি যা শিখতে পেরেছেন তার সারমর্ম হল ঃ

- উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উৎস থেকে চর্বি ও তেল সংগ্রহ করা হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় কঠিন অবস্থায় থাকলে তাদের বলে চর্বি আর তরল অবস্থায় থাকলে তাদের বলে তেল
- চর্বি ও তেল ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন এস্টার শ্রেণীর যৌগ। এদের ট্রাইগ্লিসারাইড বলে। অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের ট্রাইগ্লিসারাইড তরল আর সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের ট্রাইগ্লিসারাইড কঠিন
- আমাদের খাদ্য তালিকায় চর্বি ও তেল শক্তি-উৎপাদক প্রধান খাদ্য (শ্বেতসার ও শর্করার সঙ্গে) হিসাবে পরিগণিত
- খাদ্যের উপযোগী এবং খাদ্যের অনুপযোগী চর্বি ও তেল সম্বন্ধে ধারণা
- ক্ষারের উপস্থিতিতে গ্লিসারাইডসমূহ আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে সাবান ও গ্লিসারল উৎপন্ন করে। সে জন্য সাবান শিল্পে এবং গ্লিসারল প্রস্তুতিতে চর্বি তেলের খুব চাহিদা
- প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিশুদ্ধ তেল কীভাবে সংগ্রহ করা হয়
- চর্বি ও তেলে উপস্থিত গ্লিসারাইডসমূহের নামকরণ, ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম
- কোন্ কোন্ চর্বি ও তেলে কোন্ কোন্ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং তাদের নামের তালিকা
- সাবানীভবন মান, আয়োডিন মান, অ্যাসিড মান প্রভৃতির সংজ্ঞা এবং এই মানগুলি থেকে ট্রাইগ্লিসারাইড সম্বন্ধে ধারণা
- বনস্পতি (মার্জারিন) কিভাবে প্রস্তুত করা হয়।
- সম্পৃক্ত বা অসম্পৃক্ত চর্বি/তেল খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে আমরা কী ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকি
- সরষের তেলে ঝাঁঝের কারণ কী
- সরষের তেল বিশুদ্ধ কিনা তার পরীক্ষা

চতুর্থ পত্র - খ

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ

একক 1 ❑ খাদ্য রসায়ন

গঠন ঃ

1.0 উদ্দেশ্য

1.1 খাদ্যের রাসায়নিক যৌগ

1.1.1 জল

1.1.2 শর্করাজাতীয় যৌগ

1.1.3 প্রোটিন

1.1.4 তেল ও চর্বিজাতীয় যৌগ

1.1.5 ভিটামিন

1.1.6 খনিজ বা মিনারেল

1.1.7 খাদ্যদ্রব্যে রং

1.2.7.1 ক্যারোটিনয়েড

1.2.7.2 ক্লোরোফিল

1.2.7.3 হিমোগ্লোবিন

1.2.7.4 সাইটোক্রোম

1.2.7.5 ফ্লেভোন ও ফ্লেভোনয়েড

1.2.7.6 এন্থসায়ানিন

1.2.7.7 কৃত্রিম রং

1.2.8. খাদ্যের স্বাদ ও গন্ধ (ফ্লেভার)

1.2.9 ভিন পরিবর্তিত (মডিফাইড) খাদ্য

1.2.10 বিষকারী দ্রব্য

1.2.10.1 বিষকারক প্রাকৃতিকভাবেই খাবারে থাকা

1.2.10.2 প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণজাত

1.2.10.3 খাবারের নানা রাসায়নিক

1.2.10.4 ব্যবহার থেকে আসা রাসায়নিক

1.2.10.5 দূষণকারী রাসায়নিক পরিবেশ থেকে খাদ্য আসা

1.2.11 হোমো-সেলুলোজ, লিগনিন ও অন্যান্য রাসায়নিক

1.2.12 এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট

1.2 সারাংশ

1.3 অনুশীলনী

1.4 গ্রন্থপঞ্জী

1.0 উদ্দেশ্য

খাদ্যের মধ্যে কি কি রাসায়নিক যৌগ আছে, কি কি বিভিন্ন শ্রেণীর তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্নভাবে বা শ্রেণীগতভাবে ওদের কি কি গুণ তাও জানা দরকার রাসায়নিক গুণ বিচার করেই খাদ্য কি রকম পুষ্টি দেবে, প্রক্রিয়াতে কি রকম হবে, কি কি রকম সুবিধা হবে এদের ধারণা জন্মাবে। পৃথিবীর যে-কোন দ্রব্য (ম্যাটার বা সাবস্টেনস) অনেক রাসায়নিক দ্রব্যের সমষ্টি বা মিশ্রণ। মৌলিক কণাগুলো নিজেদের মধ্যে রাসায়নিক ধর্ম হেতু যুক্ত হয়, এরা রাসায়নিক যৌগ। খাদ্যেও বলাবাহুল্য হাজার হাজার যৌগ আছে। অধাতু মৌলিক পদার্থের মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে; নাইট্রোজেন ও ফসফরাস বেশ খানিকটা; তারপর সালফার, ক্লোরিন ও অন্যান্যেরা রাসায়নিক যৌগে আছে। ধাতুর মধ্যে সোডিয়াম, কেলসিয়াম, পটাশিয়াম, লৌহ, তামা, দস্তা, সিলেনিয়াম ত আছেই এবং আরও অনেক ধাতুর অণু খুব অল্প অল্প পরিমাণে থাকে। এই মৌলিক অণু থেকে নানা রকমের যৌগ হয়; যৌগগুলো কয়েকটা শ্রেণীর হয়, যেমন— কার্বহাইড্রেট বা শর্করা, চর্বি, প্রোটিন, জল, অনেক রকমের ভিটামিন ও হরমোন, উদ্ভিদখাদ্যে ক্লোরোফিল, প্রাণীজাতীয় খাদ্যে হিমোগ্লোবিন বা এর মত অক্সিজেন ব্যবহারকারী যৌগ; কিছু কিছু যৌগ মিলে ফাইবার তৈরী করে—এই নানা রকমের মৌলিক থেকে যৌগ রাসায়নিক খাদ্যে থাকে। অনুঘটক (এনজাইম) রাসায়নিকভাবে প্রোটিন, কিন্তু খাবারে থেকে অনেক প্রক্রিয়া করে। এরা সবাই যেমন- জল, শর্করা, প্রোটিন, চর্বি, অনেক রকমের ভিটামিন, নানা রকমের ধাতু (বেশির ভাগ পুষ্টিতে লাগে এবং কিছু বিষক্রিয়া করে), ফাইবার, অনেক রকমের এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ইত্যাদির জ্ঞান দরকার। এদের রাসায়নিক গঠন কি; গুণাগুণ কি যাতে নিজের মধ্যে বা অন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে কি ব্যবহার করতে পারে; পুষ্টি বা অপুষ্টি কিভাবে করতে পারে। খাদ্য রাসায়ন এই এই বিষয়ে আমাদের অবহিত করে।

1.1 খাদ্যের রাসায়নিক যৌগ

খাদ্যে অনেক অনেক শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ আছে। আবার প্রত্যেক শ্রেণীতে অনেক আলাদা আলাদা যৌগ আছে। এদের অনেকটাই যে-কোন একটি খাদ্যে থাকতে পারে, কম বা বেশী পরিমাণে। সংক্ষেপে কিছু বিবেচনা করা যেতে পারে।

1.1.1 জল

কাঁচা খাদ্য প্রাণীজ বলে জল থাকবেই, সাধারণভাবে ১০ থেকে ৯০ শতাংশ। বন্ধ এবং মুক্ত দুভাবেই থাকে। কয়েকরকমে বন্ধ থাকতে পারে, যেমন--- ক্রিস্টাল এবং যৌগের খাঁচা বা আকৃতিতে অপরিহার্য্য, ক্যাপিলারীর জন্য বিশেষ উপস্থিতি এবং হাইড্রোজেন বন্ধনজনিত ইত্যাদি। মুক্ত জলের আলগা এবং আলাদা উপস্থিতি, দরকার মত সহজেই আসা-যাওয়া বা আনাগোনা করতে পারে, এবং রাসায়নিক ক্রিয়া করতে পারে। এছাড়া বাইরের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে যেমন শুষ্ক আবহাওয়ায় বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যায় এবং আর্দ্র পরিবেশে জলীয় বাষ্প বাইরে থেকে ঢুকে খাদ্যকে ভিজিয়ে দেয়। এই দেয়া এবং নেয়ার প্রক্রিয়া চলে যে পর্য্যন্ত বাইরের বায়ুর জলের চাপ (ভ্যাপার প্রেশার) খাদ্যের ভেতরের জলের চাপ সমান হয়। এই সমানাকৃত জলজ চাপ সৃষ্টিকারী জলকে সন্তুলিত (ইকুইলিব্রিয়াম ময়েশ্চার কনটেন্ট) বলা হয়। বলাবাহুল্য মুক্ত জলই এই প্রক্রিয়াতে ভাগ নেয়।

রসায়নগতভাবে জল একটি খুব সরল ও সাধারণ যৌগ, শুধু হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন যারা খুব ওতঃপ্রোতভাবে জৈব রাসায়নিক যৌগতে উপস্থিত আছে। অন্য অণু উপস্থিত থাকলে কার্য্যকারিতা সীমাবদ্ধ হতে পারত— সব প্রক্রিয়াতে সাধারণভাবে থাকতে পারত না। তবে এই সরল যৌগ এমনিতে বাষ্প হতই, যদি না হাইড্রোজেন বন্ডের সাহায্যে অসংখ্য H_2O অণু মিলে সর্বত্র ব্যবহার ও রক্ষা করা যায় এমন একটি অদ্ভুতপূর্ব তরল পদার্থের সৃষ্টি করত।

1.1.2 শর্করাজাতীয় যৌগ

কয়েক রকমের চিনিজাতীয় লম্বা কার্বন শৃংখলের এ্যালকোহল, এ্যালডিহাইড এবং কিটোন থেকে মনোসেকারাইড, ডাইসেকারাইড, ট্রাইসেকারাইড, ওলিগোসেকারাইড ও পলিসেকারাইড হিসেবে। গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ ও গ্যালাকটোজ মনোসেকারাইড ; চিনি (সুক্রোজ বা কেইন সুগার) ও ল্যাকটোজ ডাইসেকারাইড ; র‍্যাফিনোজ ট্রাইসেকারাইড ; কয়েকটা জানা ও অজানা ওলিগোসেকারাইড ; এবং স্টার্চ, গ্লাইকোজেন ও সেলুলোজ পলিসেকারাইডের দৃষ্টান্ত।

তাছাড়া পেন্টোজ চিনি আছে কয়েকরকমের যাদের মধ্যে রাইবোজ খুব দরকারী বিশেষ করে ড়িএন.এ-তে থাকে বলে।

জীবনবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞানের কয়েক রকম প্রক্রিয়াতে এই শর্করাজাতীয় যৌগগুলি অনেক কাজ করে থাকে। প্রধানতঃ শর্করাজাতীয় খাদ্য থেকে জৈব অনুঘটকের সাহয্যে জারিত হয়ে গ্লুকোজ তৈরী হয়। গ্লুকোজ খুব দরকারী রাসায়নিক। শরীরের পুষ্টির কাজ ছাড়াও এর এবং সুক্রোজের অনেক প্রযুক্তিগত ব্যবহার আছে। মনোসেকারাইডগুলোর রিডিউজ হওয়ার প্রবণতা খুব বেশী।

1.2.3 প্রোটিন

আলফা-এ্যামাইনো এ্যাসিড ২০ বা বেশী রকমের হয় কার্বন শৃংখল এবং অন্যান্য গ্রুপের উপস্থিতির জন্য। অনেক এ্যামাইনো এ্যাসিড এ্যামাইনো এবং এ্যাসিড গ্রুপের দ্বারা যুক্ত হয়ে খুব বড় এক-একটা যৌগের সৃষ্টি

করে এদেরকে প্রোটিন বলা হয়। প্রোটিন আবার ভেঙে যেতে পারে এর উল্টো প্রক্রিয়াতে এবং ফের এ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরী হয় অনুঘটক জারিত হয়ে। এ্যামাইনো এ্যাসিড অক্সিডাইজ ও ডিএ্যামিনেটেড হয়ে প্রাণীদের জীবনের কাজে লাগে। রাসায়নিক অনেক ক্রিয়াও করে প্রতিটি এ্যামাইনো এ্যাসিড সাধারণভাবে ও বিশেষভাবে এবং সবশেষে যে নাইট্রোজেন শরীরের দরকারের চেয়ে বেশী তা ইউরিয়া হিসাবে প্রস্রাব দিয়ে বেরিয়ে যায়।

শরীরের বৃদ্ধিতে প্রোটিন ত কাজে লাগেই, তাছাড়া প্রোটিন (হয়ত হাজারেরও অনেক বেশী) নানা কাজ করে। যেমন—জৈব অনুঘটক বা এনজাইম, এ্যান্টিবডি, অনেক ছোট জীব রসায়নের বাহক (ক্যারিয়ার) ও রিসেপ্টার এবং নানা রকমের পেপটাইড।

জিন হল যে-কোন প্রাণীর মূলগত পরিচয় এবং এর জন্যই প্রাণীর আকার-প্রকার ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হয়। লক্ষ লক্ষ জিন দরকারমত নিজস্ব প্রোটিন তৈরী করেই নিজের প্রকাশ করে, আর প্রোটিনগুলো এমনিতে এবং বিশেষ করে জৈব অনুঘটক হিসাবে কাজ করে প্রাণীকে বাঁচিয়ে চালিয়ে রাখে। সব জৈব অনুঘটকই প্রোটিন। কারণ প্রোটিনের নানা রকমের বিচিত্র গঠন অনুঘটকের কাজের জন্য দরকারী ; প্রকৃতি এই সমস্ত জীবনদায়ী কাজের প্রয়োজনে প্রোটিনকেই বেছে নিয়েছে অনুঘটকের কাজের জন্য। এক কথায় জৈব অনুঘটকের উপস্থিতিকে প্রাণের উপস্থিতি বলা যেতে পারে ; প্রাণের উৎস নিয়ে যারা ভেবেছেন ওরা বলেন যে নাইট্রোজেনের যৌগ এ্যামোনিয়া হয়ে ক্রমে এ্যামাইনো এ্যাসিড থেকে প্রোটিন হলে এনজাইম এর পর পাওয়া গেছে।

প্রক্রিয়াকরণে দেখতে হবে খাদ্যের প্রোটিন যেন নষ্ট না হয় কারণ প্রোটিন পুষ্টির বিশেষ অঙ্গ। শর্করাজাতীয় স্টার্চ সম্বন্ধে তেমন কোন আশংকা নেই বরং স্টার্চ সেদ্ধ (জিলেটিনাইজ) হলেই ভাল, যাতে জারণযোগ হতে পারে।

প্রোটিনের বিশেষ অংশ হল নাইট্রোজেন। প্রত্যেক রকমের প্রোটিনের মধ্যে নাইট্রোজেন একই অনুপাতে থাকে। নাইট্রোজেন সহজেই ফিয়েলডাল উপায়ে মাপা যায়, সুতরাং একে কোন গুণিতক দিয়ে গুণ করলে প্রোটিন পাওয়া যায় দুধের প্রোটিনের গুণিতক ৬.২৫ গমের প্রোটিনের ৫.৩ বা ৫.৭, ইত্যাদি।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিন কিছুটা নিরেস, কারণ কোন কোন অবশ্য গ্রহণীয় এ্যামাইনো অম্ল শরীরের দরকারে কম থাকে। এ্যামাইনো অম্ল বিশ্লেষণ করে রাসায়নিক স্কোর দ্বারা অথবা জৈব উপায়ে বাচ্চা ইঁদুরকে খাইয়ে ওজন বৃদ্ধি ও খাদ্যের অনুপাতে (পি.ই.আর-প্রোটিন এফিসিয়েন্সী বেশিও) দ্বারা প্রোটিনের জৈব মূল্য বের করা যেতে পারে।

1.1.4 তেল ও চর্বিজাতীয় যৌগ

সব প্রাণীরই কম-বেশী তৈলজাতীয় পদার্থের দরকার, মানুষের খুবই দরকার। কারণ তেলে শক্তি বেশী (৯ ক্যালরী প্রতি গ্রামে) এবং তেলে থাকা কয়েক রকম ফ্যাটি অম্ল অবশ্য গ্রহণীয়, না হলে শরীরের কিছু প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। এই অবশ্য গ্রহণীয় অম্লে কার্বন শৃংখল বিভিন্ন রকম লম্বা এবং কার্বন নানা রকমভাবে অসম্পৃক্ত।

রাসায়নিকভাবে তেল গ্লিসারল ও ফ্যাটি অম্ল এর এস্টার। এর জন্য তেলের এক এক মলিকিউলকে গ্লিসারাইড বলা হয়, ঠিক ঠিক বলতে গেলে ট্রাইগ্লিসারাইড ; কারণ এক মলিউকিল গ্লিসারল তিনটা গ্লিসারাইড করতে পারে। জৈব রাসায়নিক শরীরকে দেয়। এদের সুরক্ষার জন্যই প্রকৃতি চর্বির মত মজবুত যৌগ তৈরী করে রাখে, যা শরীরে ঠিক উল্টো রাস্তায় ভেঙে যায় এবং জারিত হয়।

খাদ্য তেল সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জ বীজ থেকে বের করে আনা হয়, চাপ দিয়ে বের করে (এক্সপেলার দিয়ে) অথবা দ্রাবক (খাদ্য গ্রেড পেট্রলিয়ামজাত হেক্সেন বা হেপ্টেন) দ্বারা। এই কাঁচা তেলকে অনেক ক্ষেত্রে পরিশোধন করা হয়। হাইড্রোজেন অনুঘটক (নিকেল অক্সাইড) দ্বারা ঢুকিয়ে তেল থেকে চর্বি তৈরী করা হয় (তেল থেকে গলনাঙ্কের তাপ বেশী বলে ঘরের তাপেই জমে যায় একে চর্বি বা ফ্যাট বলা হয়) যার ভারতীয় নাম বনস্পতি। এছাড়া চর্বির মধ্যে মাখনও আছে, আছে ঘি (মাখন থেকে জল সরিয়ে, হয় গলিয়ে জল আলাদা করে নতুবা গরম করে)।

ট্রাই গ্লিসারাইডল তেল ও চর্বি (অসম্পৃক্ত অম্ল যেমন সি ১৮ : ০ এবং অন্যান্য থাকে বলে গলনাংক বেশী) ছাড়াও অন্য তেলজাতীয় পদার্থ (লিপিড) আছে।

1.1.5 ভিটামিন

এদের মধ্যে অনেক রাসায়নিক (জৈব) আছে, বড় বড় যৌগ। খাদ্যে অল্প পরিমাণ দরকার হয়। নিজ নিজ ধর্ম আছে যা দরকার মত জানতে হয় পুষ্টিদ্রব্য হিসাবে জীবন রসায়নাকলে এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্যও বটে। ভিটামিন শরীর তৈরী করতে পারে না, খাবার বা ঔষধের মাধ্যমেই পেতে হয়।

ভিটামিন 'এ' খুব বড় ফরমুলার কাঠামো। ক্যারোটিন ভিটামিন 'এ'-এর মত কাজ করে। এরা অক্সিজেন কাতুরে। অক্সিজেনের সঙ্গে সহজেই মেশে বলে এ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মত কাজও করে অন্যান্য জীবনদায়ী শারীরিক কাজ ছাড়াও। এরা জলে দ্রব নয়, তেলেই মেশে।

ভিটামিন 'বি' অনেক অনেক যৌগ, জলে দ্রবণীয়, বড় বড় যৌগ, জৈব অনুঘটকের অংশ হিসাবে কাজ করে বলে খুব দরকারী। ১, ২ থেকে আরম্ভ করে ১২ পর্য্যন্ত আছে। বি ১ হল থায়ামিন নামক জৈব রসায়ন, বি ২ রাইবোফ্লেভিন দুধে বেশী থাকে, নিকোটিনিক অম্ল বা নিয়াসিন বি ৩ কেউ কেউ বলে, ক্যান্টথেনিক অম্ল বি ৫, পিরিডক্সিন বা পিরিডক্সামাইন হল বি ৬, ফোলিক অম্ল ও বায়টিন হয়ে শেষে সাইনোকবালোমিন বি ১২।

এ্যাস্করবিক অম্ল হল ভিটামিন 'সি'। জীবনবিজ্ঞান ঘটিত অনেক কাজ করে। এই কাজগুলো হয় না যদি ভিটামিন 'সি'-র অভাব হয়। শেষে হয় স্কার্ভী নামক রোগ।

এরপর ভিটামিন 'ডি', 'ই' এবং 'কে' বেশ নাম করা দরকারী বলে। অনেক কাজের মধ্যে 'ডি' হাড় গঠনে এবং ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস চালনায় কাজ করে, 'ই' এন্টিঅক্সিডেন্ট ও 'কে' রক্ত জমাট বাঁধানোর কাজ করে।

সব ভিটামিনই বহু কাজ শরীরেরত করেই, অনেকগুলো বিশেষ করে ভিটামিন 'বি' এনজাইমের সহযোগী হয়ে কাজ করে কো-এনজাইম হিসাবে।

1.1.6 খনিজ বা মিনারেল

এরা ভিটামিনের মতই খাদ্য অথবা ঔষধের মাধ্যমে নেওয়া হয়, খুব অল্প পরিমাণেই দরকার হয়। তবে ভিটামিন যেমন জৈব রাসায়নিক কিন্তু এরা অজৈব। ভিটামিন এবং মিনারেলগুলোর কি কি পরিমাণ দৈনিক

দরকার হয় বয়ঃক্রম, বিশেষ শারীরিক অবস্থা ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে সেটা জানা আছে আর.ডি.এ. (সুপারিশকৃত দৈনিক পরিমাণ) হিসাবে।

সোডিয়াম, পটাশিয়াম, লৌহ, ক্যালশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি একটু বেশী পরিমাণে ; কোবাল্ট, নিকেল, সিলেনিয়াম, ক্রোমিয়াম, তামা, দস্তা ইত্যাদি অল্প পরিমাণে শরীরের দরকার হয়। তাছাড়া নন-মেটাল সালফার, ফরফরাস, ক্লোরিণ, আইওডিন এদেরও দরকার হয় পুষ্টির কাজে। শরীরের অনেক প্রক্রিয়াতে এবং জৈব অনুঘটকের অংশ (কো-ফ্যাক্টর) হিসাবে দরকারী। পুরোপুরি পরিমাণ না হলে অসুখ বা শরীরের বিকৃতি হতে পারে, তখন ঔষধ হিসেবে খেতে হয় যেমন রক্তাল্পতায় লৌহ ও হাড়ের দরকারে ক্যালশিয়াম (ভিটামিন 'ডি' সহযোগে)।

এই সব এলিমেন্ট অজৈব রাসায়নিক হিসাবে খেতে হয়। কম হলে অসুখ হবে। দরকারের থেকে প্রচুর পরিমাণে যদি বেশী হয় তবে বিষক্রিয়া হতে পারে। কিছু কিছু ধাতু প্রায় দরকারী নয়, হলেও খুব সামান্য দরকার, এদের জন্য বিষক্রিয়া হয় (বিষকারী ধাতু), যেমন—আর্সেনিক, সীসা, পারদ ও ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম ও ম্যাংগানিজ একটু বেশী হলেই বিশেষতঃ বেশী হবে না। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সময়ও যেন এরা খাদ্যে অসাবধানতাবশতঃ চলে আসতে না পারে দেখতে হবে।

1.1.7 খাদ্যদ্রব্যে রং

কয়েক রকমের পিগমেন্ট খাদ্য রসায়ন হিসেবে দেখা যায়। রংকে প্রকৃতি কিছু রক্ষাকারী রাসায়নিকের সঙ্গে মিশিয়ে রেখেছে যাতে এরা স্থায়ী হয়, এনেরই পিগমেন্ট বলা যায়। যেমন—

1.1.7.1 ক্যারেটিনয়েড

আলফা, বিটা ও গামা ক্যারোটিনয়েড, লাইকোজিন, জ্যান্থফিল, ক্রিপটোজ্যান্থিন এবং ক্রসেটিন ইত্যাদি। বিটা ক্যারোটিনের প্রায় ৫০% এবং আলফা ও গামার অল্প কিছু ভিটামিন 'এ'-র কাজ হয়।

1.1.7.2 ক্লোরোফিল

উদ্ভিদের মধ্যে থাকে যা দিনে সালোক সংশ্লেষণ (ফটোসিনথেসিস) করে এদের বাঁচিয়ে রাখে। খাবারে তাজা সবুজ চেহারা দেওয়া ছাড়া এর কোন পুষ্টিগুণ আছে কি না জানা যায়নি। এদের মধ্যে ম্যাগনেশিয়াম আছে, যা নিজস্ব প্রয়োজন ছাড়াও প্রাণীর প্রয়োজন মেটায়।

1.1.7.3 হিমোগ্লোবিন

এই লৌহঘটিত লাল পিগমেন্ট কেবল প্রাণীজ খাবারেই থাকে।

1.1.7.4 ক্যারোটিনয়েড

এই লৌহঘটিত পিগমেন্ট প্রাণীর মাইটোকনড্রিয়া ও মাইক্রোজমে রেড-অক্স কাজ করে।

1.1.7.5 ফ্লেভোন ও ফ্লেভোনয়েড

হলদে রং-এর পিগমেন্ট এরা।

1.1.7.6 এন্থসায়ানিন

লাল, বেগুনী ও নীল রং-এর পিগমেন্ট।

এই রঙীন রসায়নগুলি অন্যান্য কাজ ছাড়াও একটা খুব দরকারী কাজ করে—শরীরের ভেতরে এ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কাজ করে শরীরকে ফ্রি র‍্যাডিক্যালের বিপদ থেকে বাঁচায়।

1.1.7.7 কৃত্রিম রং

মাত্র কয়েকটা কৃত্রিম রং আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবহার করা যেতে পারে। এদের বিষক্রিয়া ওরা যে পরিমাণে ব্যবহৃত হবে তাতে প্রশ্ন হবে না মনে করেই এদের ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে অনুমতি মাঝে মাঝে পুনর্বীক্ষণ করা হয়। মাত্র কয়েকটি রঙেরই অনুমতি আছে, কয়েকটি অনুমোদিত খাবারে ; এবং নির্দ্ধারিত অল্প পরিমাণে (প্রচলিত আইন অনুসারে)। এই কৃত্রিম রং ছাড়াও স্বাভাবিক (প্রকৃতিতে পাওয়া যায়) রং কিছু কিছু ব্যবহার করা যায় প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত রং হিসাবে অথবা একই জিনিষ ল্যাবরেটারী বা কারখানায় সংশ্লেষিত হিসেবে।

1.1.7.8 খাদ্যের স্বাদ ও গন্ধ (ফ্লেভার)

অল্প পরিমাণ বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য খাদ্যে থাকে। এরা একদিকে জিভের টেস্টবাডে লেগে স্বাদের অনুভূতি জাগায়। প্রধানতঃ মিষ্টি, টক, নোন্‌তা ও তেতো ছাড়াও কয়েকটি অন্য স্বাদও অনুভূত হয় সুনির্দিষ্টভাবে প্রত্যেক স্বাদের একান্ত টেস্টবাডের সাহায্যে।

গন্ধের জন্য রাসায়নিককে উদ্বায়ী হতে হবে। বাষ্পের মত হয়ে নাকের ভেতরে অবস্থিত ওলফ্যাক্টরী গ্ল্যান্ডে ক্রিয়া করে, মস্তিষ্ক গন্ধকে চিহ্নিত করে। নানা রকমের জানা-অজানা রাসায়নিক খাবারে থেকেই সেই সেই রকমের সুবাসের অনুভূতি জাগায়।

সিন্থেটিক ফ্ল্যাভারও অনেক আছে। খাবারে ব্যবহারের জন্য আইনানুগ বিধান আছে ফ্ল্যাভার ও এদের ক্যারিয়ার সলভেন্ট-এর জন্য।

1.1.10 বিষকারী দ্রব্য

বিষকারী ধাতুর কথা বলা হয়েছে। অধাতু বা জৈব যৌগ অনেক আছে খাদ্যে যারা বিষকারী।

1.2.10.1 বিষকারক প্রাকৃতিকভাবেই খাবারে থাকা

এই রকম জৈব যৌগ অনেক আছে, যেমন—গলগণ্ডক কারক, এ্যালার্জী কারক, ল্যাথিরজেন, এ্যান্টি-ভিটামিন,

এ্যান্টি-এনজাইম, ক্যান্সার কারক, মিউটাজেন, টেরাটোজেন, সায়নোজেন (সায়নাইড প্রস্তুতকারী), সমুদ্রজাত বিষকারক ইত্যাদি।

1.2.10.2 প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণজাত

ক্যানসিডিটি, এ্যাসেডিটি, এ্যামাইনো অম্লে নানারকমের ক্রিয়া হওয়া, ব্রাউনিং, মেইলার রিএ্যাকশন ইত্যাদি।

1.2.10.3 খাবারের নানা রাসায়নিক

রং, অপ্রাকৃতিক মিষ্টদ্রব্য, প্রিজারভেটিভ, এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ইমালশনের গাম, ফ্লেভার ইত্যাদি। এদের সবচেয়ে বেশী যা ব্যবহার করা যেতে পারে এর পরিমাপ দেওয়া আছে ; এর বেশী হলেই বিষয়কারী হবে।

1.2.10.4 ব্যবহার থেকে আসা রাসায়নিক

খাদ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে চলে আসা কিছু কিছু যৌগ (রেসিডিটি) বিষকারী হতে পারে। যেমন—পেস্টিসাইড রেসিডিউড, এ্যান্টিবায়াটিক রেসিডিউ, দুধে বা মাংসে ঔষধের রেসিডিউ ইত্যাদি।

1.2.10.5 দুষণকারী রাসায়নিক পরিবেশ থেকে খাদ্যে আসা

খনিজ, কৃষি, শিল্প, গৃহস্থালী, প্যাকিং দ্রব্য, রেডিও-এ্যাক্টিভ দ্রব্য, গামা রশ্মি ব্যবহার ইত্যাদি থেকে বিষকারী দ্রব্য খাবারে আসতে পারে।

1.1.11 হোমো-সেলুলোজ, লিগনিন ও অন্যান্য রাসায়নিক

নানা রকমের রাসায়নিক খাদ্যে আছে। এর মধ্যে সেলুলোজ (শর্করাজাতীয়) ছাড়া খাবারের ফাইবার হিসাবে থাকা কিছু জিনিষ যার হজম হয় না। সেলুলোজ এবং অলিগোসেকারাইডিজাতীয় যৌগ একই সঙ্গে থেকে ফাইবারের সৃষ্টি করে। ফাইবার নেহাৎ খুব প্রয়োজনীয় একটি শ্রেণী যা পুষ্টির জন্য দরকার ; অনেক অপ্রয়োজনীয় পরিমাণের জিনিষ, যেমন—বাইল, কলেস্টারল ও খনিজ দ্রব্য গ্রহণ করে শরীর থেকে মল দ্বারা বের করে দেয় যদিও এই তিনটি জিনিষ এমনিতেই শরীরের পক্ষে দরকার। সেলুলোজ ও অলিগোসেকারাইড মানুষ হজম করতে পারে না কারণ এদের ভাঙবার এনজাইম মানুষের থাকে না। গরুর কয়েকটি পাকস্থলী থাকে, যাতে কি জীবাণু এদের ভাঙতে পারে এবং এভাবে তৈরী শর্করা পুষ্টির কাজও করে। মানুষের বৃহদন্ত্রের জীবাণু সেলুলোজ ভাঙতে পারে না, পুরোটাই বেরিয়ে যায়। তবে অলিগোসেকারাইডকে ভাঙতে পারে, যাতে ওরা নিজেরা শর্করাজনিত পুষ্টি পায় বেঁচে থাকার জন্য এবং মানুষকে পেট ফাঁপা বিশেষতঃ ডাল খাওয়ার জন্য (ফাটুলেন্স) থেকে আরাম দেয়। এই রকম কোন কোন অলিগোসেকারাইড 'প্রিবাওটিক'-এর কাজ করে, যথা দই এবং অন্য গাঁলিত খাদ্যে থাকা উপকারী ল্যাক্টোব্যাসিলাস জীবাণুর বাঁচার ও কাজ করার ব্যবস্থা ও পুষ্টি প্রদান করে। এই উপকারী বীজাণুদের 'প্রবাওটিক' বলা হয়।

1.1.12 এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট

খুব দরকারী বলে খাবারের মধ্যে এবং শরীরের ভেতরে তৈরী করে নানারকমের বন্দোবস্ত করে রেখেছে প্রকৃতি। শরীর ত অক্সিডেশন খুব হয়, সব শক্তিপ্রদানকারী খাদ্য যেমন চর্বি, প্রোটিন ও শর্করা এনজাইম জারিত হয়ে শেষ সময়ে অক্সিজেনে ইলেক্ট্রন দেয় যাতে অক্সিডেশন হয় এবং ক্যালরী তৈরী হয়। প্রত্যেক অক্সিজেন মলিকুলে চারটে ইলেক্ট্রন লাগে। যদি আংশিক হয় তবে ফ্রি র‍্যাডিকাল তৈরী হয়, যারা ইলেক্ট্রনের জন্য ক্ষুধার্ত এবং বহু যৌগকে আক্রমণ করে। এদের জন্য অনেক অনেক অসুখ যার মধ্যে অকাল বার্দ্ধক্য ও ক্যান্সারও আছে। এন্টিঅক্সিডেন্ট এদের থেকে আমাদের বাঁচায়। ভিটামিন এ, ই ও সি, ক্যারটিন, সাইকোনিন (যা টমেটোতে খুব আছে) ও অন্যান্য প্রাকৃতিক রং ইত্যাদি এন্টিঅক্সিডেন্ট খাবারে আছে। তাছাড়া শরীর ভেতরে তৈরী করে ইউবিকুইনোন, ইউরেট ও গ্লুটাথায়োন এবং কিছু কিছু এনজাইম, যেমন—সুপারঅক্সাইড ডিসামিউটেজ, গ্লুটাথায়োন, গ্লুটাথায়োন পারঅক্সিডেজ, ক্যাটালেজ, পারঅক্সিডেজ। এনজাইমগুলো এই অক্সি বা হাইড্রাক্সি ফ্রি র‍্যাডিক্যালগুলোকে ভেঙ্গে দেয়। আর রাসায়নিকগুলো ইলেক্টন দিয়ে ওদেরকে রিডিউস করে সন্তুষ্ট করে এবং নিজেরা অক্সিডাইজড হয়ে যায়।

1.2 সারাংশ

খাদ্যবিজ্ঞানের রাসায়নিক দিকটা আলোচনা করা হয়েছে। ছোট ছোট যৌগিক (জলে দ্রাব্য) রাসায়নিক বন্ধনে খুব বড় হয়ে খাবারে এসেছে, তখন এরা জলে গলে অথবা ধুয়ে বেরিয়ে যাবে না। এটা হয়ত প্রকৃতিরই ডিজাইন। খাওয়ার পরে কিন্তু এরা হজম হয়ে ঐ ছোট ছোট যৌগিকে ভেঙ্গে যায়, এরা ক্রমান্বয়ে শরীরে ব্যবহৃত হয়। যেমন—গ্লুকোজ পলিমার স্টার্চ বা গ্লাইকোজেন, এ্যামাইনো এ্যাসিড থেকে প্রোটিনগুলো এবং গ্লিসারল ও ফ্যাটি এ্যাসিড থেকে চর্বি। পুষ্টিদ্রব্যগুলি কি কি, কিভাবে ওদের গঠন হয়েছে এবং ওদের গুণাগুণ কি রকম। শর্করাজাতীয়, চর্বি ও তেল, প্রোটিন, জল, অনেক রকমের ভিটামিন ও খনিজ লবণ, ফাইবার, এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রং, স্বাদ ও গন্ধ প্রদানকারী রাসায়নিক পদার্থ— বিষকারী দ্রব্য সেলের বাইরের ও ভিতরের রাসায়নিকগুলো ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

1.3 অনুশীলনী

(১) শর্করাজাতীয় খাদ্যাংশে কি কি রাসায়নিক যৌগ থাকে?

(২) আলফা এ্যামাইনো এ্যাসিড কি রকমের যৌগ? এরা কিভাবে প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়?

(৩) খাবারের তেল নাকি গ্লিসারাইড অব্ ফ্যাটি এ্যাসিড। এর ব্যাখ্যা করুন। এতে তেল এত রকমের হয় কি করে?

(৪) জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের একটি সরল যৌগ। এর বাষ্প হওয়ার কথা। তরল হল কেন?

(৫) এনজাইম কি? খাবারের জন্য ও শরীরের জন্য এর কি দরকার? এনজাইমের কিছু বৈশিষ্ট্য বলুন।

(৬) নাইট্রোজেন ল্যাবরেটরীতে কি উপায়ে মাপা হয়? এর দ্বারা প্রোটিনের পরিমাপ কি করে হতে পারে?

(৭) ভিটামিন এ, সি ও ই সম্বন্ধে পাঁচটি লাইন লিখুন।

(৮) লৌহ ও ক্যালসিয়াম—এদের কি কি প্রয়োজন শরীরের পক্ষে?

1.5 গ্রন্থপঞ্জী

1. Gaman, P.M. and Sherrington, K.B. : *The Science of Food,* 1990, Pergamon Press, New York.
2. Srilakshmi, B. : *Food Science,* 1997, New Age International (P) Ltd. Kolkata.
3. Mudambi, S. R. and Rao S.M. : *Food Science,* 1989, New Age International (P) Ltd. Kolkata.
4. Coultate, T. P. : *Food-Chemistry of its Components,* 1998, Royal Society of Chemistry, London.
5. Manay, N. S. and Shadaksharaswamy, M. : *Food, Facts & Principles,* 1987, Wiley Eastern Ltd. Kolkata.
6. Bennion, M. : *Introductory Foods, 1980,* Macmillan Publishing Co., New York.
7. Mondy, N. I. : *Experimental Food Chemistry,* 1980, Avi Publishing Co. Inc., Westpor, Con.
8. Gilbert, J. : *Analysis of Food Contaminants,* 1981, Elsevier Applied Science Publishers Ltd. New York.

একক 2 ❑ পুষ্টিবিজ্ঞান

গঠন

2.0 উদ্দেশ্য

2.1 পুষ্টিবিজ্ঞানের পরিধি

2.2 পুষ্টিদ্রব্য

2.2.1 শর্করাজাতীয়

2.2.2 প্রোটিন

2.2.3 চর্বি

2.2.4 জল

2.2.5 ভিটামিন ও এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট

2.2.6 খনিজ যৌগ

2.2.7 ফাইবার

2.2.8 নিউট্রাসেটিক্যাল ও ফাংসনাল খাদ্য

2.3. খাদ্যের প্রকারভেদ

2.4.1. শর্করাবহুল খাদ্য

2.4.2. ডাল বা লেগিউম

2.4.3. মাছ-মাংস-ডিম

2.4.4. ফল ও সব্জী

2.4.5. দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য

2.4.6. ফাইবার

2.4.7. জল

2.4. খাবার (পথ্য) কেমন হবে

2.4.1 সুষম খাদ্য

2.5 পুষ্টিদ্রব্য বিশ্লেষণ

2.5.1. পুষ্টিগুণ জানা

2.5.2. খাদ্যের মান (স্পেসিফিকেশন)

2.5.3. খাদ্যের পুষ্টিমূল্য

2.5.4. প্রস্তাবিত দৈনিক খাওয়ার পরিমাণ (আর.ডি.এ)

2.5.5. দৈনিক খাবার কেমন হবে

2.5.6. পুষ্টি লেবেল

2.6 খাদ্যের অপুষ্টি

2.6.1. অপর্যাপ্ত পুষ্টি

2.6.2. খাদ্যে বিষক্রিয়া

2.6.3. খাদ্যের বিষের নিষ্ক্রিয়করণ

2.7 অপুষ্টির অনিষ্ট

2.8 সারাংশ

2.9 অনুশীলনী

2.10 গ্রন্থপঞ্জী

2.0 উদ্দেশ্য

প্রাণীদের বৃদ্ধি, ভাল স্বাস্থ্য এবং আয়ুর জন্য পুষ্টি দরকার। কোন কোন দ্রব্য বা রাসায়নিক পুষ্টি যোগায়, পুষ্টিদ্রব্যগুলো কোন্ কোন্ খাবারে কি কি পরিমাণ আছে, এদের কি কি গুণ, রান্না ও অন্যান্য প্রক্রিয়াতে কি কি পরিবর্ত্তন হয়, কি কি ভাবে শরীরের ভিতরে কাজ করে, পুষ্টিদ্রব্যের অভাবে কি কি রোগ হয়, কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য স্বাস্থ্যের পরিবর্দ্ধন করে, সরকারের পুষ্টিসম্বন্ধীয় কি কি পলিসি ইত্যাদি বিচার করা দরকার পুষ্টিবিজ্ঞানে। বিজ্ঞানের রীতিনীতি সম্বন্ধীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তজ্জনিত জ্ঞাত বিষয়ও পুষ্টিবিজ্ঞানে বিচার করা হয়। শরীরের কার্য্যক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, শরীরের দৈর্ঘ্য, ওজন ও সৌন্দর্য, পরিশ্রম ও কাজ করার ক্ষমতা, অকালমৃত্যু বা অকাল-বার্দ্ধক্য রোধ করা ইত্যাদি সবই পুষ্টি সাপেক্ষ। দেশ ও জাতির শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ পুষ্টিই সূচিত করে ; দেশের উৎপাদিকা শক্তি ও জাতীয় আয় সম্মিলিতভাবে বেশী হয় বা উৎকর্ষ লাভ করতে পারে মিলিতভাবে দেশের পুষ্টি যদি ভাল ও নিয়মমত হয়।

2.1 পুষ্টিবিজ্ঞানের পরিধি

খাদ্যবিজ্ঞান যেমন খাদ্য সম্পর্কে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যা বিচার করা হয়, বিশেষ করে খাদ্যের ধর্ম বা গুণাগুণ জানা ত দরকার। কাঁচা খাবারে যে যে পদার্থ প্রকৃতি তৈরী করে দিয়েছে সেই সেই রাসায়নিক কি কি ধরনের তাহা খাদ্য রসায়ন বিচার করে। খাওয়ার পরে খাদ্যের জারণ বিক্রিয়া ও প্রয়োজন মেটানো

কি কি ভাবে শরীরে করে তাহা শারীরবিজ্ঞান এবং জীবনবিজ্ঞানে (বিশেষ করে জীবন রসায়ন) অধ্যয়ন করা হয়। বীজাণু বিজ্ঞান খাদ্যে বীজাণুর প্রভাব যেমন বীজাণুঘটিত কারণে খাদ্য থেকে পাওয়া নানা দরকারী রসায়ন, খাদ্য নষ্ট হওয়া বিষক্রিয়া করা এবং খাদ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বীজাণু বিজ্ঞান বিচার করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে নানা রকমের বিজ্ঞান খাদ্যদ্রব্যে প্রয়োগ করা হয় এবং লব্ধ জ্ঞান (খাদ্যবিজ্ঞান) পুষ্টিবিজ্ঞানের মধ্যেও আনা হয়ে থাকে। এছাড়া খাদ্যপ্রযুক্তি বলেও একটা কথা আছে। খাদ্যবিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞানাবলী থেকে জানা দরকারগুলো যদি খাদ্য প্রয়োগ করতে হয় তাহলে নানা রকম প্রক্রিয়া করতে হয়, যেমন—কৃষিঘটিত গম থেকে আটা, ময়দা, সুজী, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি তৈরী করার খাদ্য প্রযুক্তি। খাদ্য প্রযুক্তি আলাদা ও বিশদভাবে পঠন-পাঠন হয়, তবু পুষ্টিবিজ্ঞানেও জানা হয়ে থাকে, বিশেষ করে পুষ্টি ও প্রক্রিয়া প্রযুক্তির মধ্যে নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

তাছাড়া দেশের খাদ্যসম্বন্ধীয় রেগুলেশনগুলোও পুষ্টিবিজ্ঞানীদের জানতে হয়। খাদ্যে দরকার মত পুষ্টি থাকার জন্য, খাদ্য যাতে বিপদের কারণ না হয়, সর্বোপরি খাদ্যে যাতে ভেজাল না থাকে এবং খাবারের মোড়কের লেবেলে যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য এই সমস্ত পুষ্টি সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য ও নির্দেশ আইনে থাকে যার নাম খাদ্যে ভেজাল নিরোধ আইন। উপভোক্তা সংরক্ষণ আইনও আরেকটি আইন যার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ত আছেই, তাছাড়া পুষ্টিসংক্রান্ত ব্যাপারও আছে যেমন, ভোক্তাদের অধিকার আছে ভাল জীবনের যাহা ভাল খাবারও পুষ্টি দাবী রাখে।

2.3 পুষ্টিদ্রব্য

নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের দরকার পুষ্টির জন্য। এই সব দ্রব্য (যাদের পুষ্টিদ্রব্য বলা যেতে পারে) সৌভাগ্যবশতঃ খাবারে পাওয়া যায়— প্রকৃতি করে দিয়েছে খাবারের মধ্যে—সেই জন্যই ত খাদ্যদ্রব্যের দরকার। কি কি পুষ্টিদ্রব্য বা পুষ্টি রাসায়নিক দরকার হয় শরীর ধারণ করার জন্য, যেমন—শরীরের বৃদ্ধি, শক্তি উৎপাদন করে কাজ করার ক্ষমতা দান, শরীরের ভাইটাল (প্রাণসম্বন্ধীয়) কাজের জন্য।

2.2.1 শর্করাজাতীয়

কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক যৌগ এই খাবার নানা রকমের। কয়েক রকমের শর্করা ত আছেই, ওদের নানা রকমের যৌগ, নানা রকমের পলিমার শৃঙ্খল, তার উপর বেশ কয়েক রকমের বড় মলিউকিলের সংঘবদ্ধ হওয়া এই সমস্ত কারণে কার্বনহাইড্রেটের অসংখ্য রসায়ন আছে।

2.2.2 প্রোটিন

খাবারে প্রোটিন থাকে। প্রোটিন এনজাইমে জারিত হয়ে এ্যামাইনো এ্যাসিড হয়। এ্যামাইনো এ্যাসিড অক্সিজেন জারিত হয়ে শরীরের কাজ করে নানা রকম, তার মধ্যে প্রথমেই প্রায় ৪ ক্যালরী প্রতি গ্রামে শক্তি পাওয়া যায়। এ্যামাইনো এ্যাসিডও ছোট যৌগ, জলে গুলে বেরিয়ে যেতে পারে। তাই এরা নিজেদের একত্র যোগ করে বড় যৌগ প্রোটিন তৈরী করে। প্রোটিন যেন এ্যামাইনো এ্যাসিডের নিরাপদ জমা স্টোর, দরকার মত জারণ করে বের করে আনা যায়।

এ্যামাইনো এ্যাসিডের মধ্যে কয়েকটি অবশ্য প্রয়োজনীয় (এ্যাসেন্সিয়াল), খাবারের প্রোটিনে অবশ্যই থাকবে ভিটামিনের মত। এগুলোকে শরীর তৈরী করতে পারে না—অন্যগুলোকে পারে।

2.3.3 চর্বি

নানা রকমের চর্বিজাতীয় অম্ল (ফ্যাটি অ্যাসিড) শরীরের দরকার ঃ ছোটবড় কার্বন শৃংখলও এক দুই তিন বা বেশী অসম্পৃক্ত কার্বন অণু। কিন্তু সেগুলো জলে বিশেষ করে ক্ষার জলে গুলে যেতে পারে বলে চর্বিজাতীয় অম্লগুলোকে প্রকৃতি এষ্টার করে রাখে গ্লিসারলের সঙ্গে। অনেক সময় শর্করা ও প্রোটিনের সঙ্গে রাসায়নিক বন্ডে (বাঁধনে) বেঁধেও রাখে। শর্করা এবং এ্যামাইনো এ্যাসিড যেমন করে গুলে হারিয়ে যেতে না পারে সেইরকম. এই বড় যৌগগুলোকে জৈব অনুঘটকে জারণ করে ফ্যাটি অম্ল ও গ্লিসারল বের করে এনে শরীরের কাজে লাগায় সাধারণ নিয়ম।

প্রকৃতি আরেকটি সুন্দর কাজ করেছে গ্রাম প্রতি প্রচুর ক্যালরী শর্করা ও প্রোটিনের দ্বিগুণেরও বেশী (৯ ক্যালরী) বিধান করে রেখেছে। এতে খাবার থেকে শক্তি পাওয়ার বেশ ভাল ব্যবস্থা, অল্প খাবারেও বেশী শক্তি পাওয়া যায় যা বেশী কাজ যাদের করতে হয় এদের সুবিধা হয়।

বলাবাহুল্য নানা রকমের ফ্যাটি অম্ল ও নানা রকমের চর্বি শরীরের বিশেষ বিশেষ কাজ করে থাকে।

2.3.4 জল

জল কোন ক্যালরী দেয় না তবে বিশেষ প্রয়োজনীয় পুষ্টি সহায়ক পুষ্টিদ্রব্য। এর জন্যেই সব রকমের জীবন বৈজ্ঞনিক ও শরীর বৈজ্ঞানিক কাজ হতে পারে।

2.3.5 ভিটামিন ও এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট

নানা রকমের জৈব রাসায়নিক যৌগ ভিটামিনের দরকার হয়। এ, বি, সি, ডি, ই, কে, পি ইত্যাদি নানাশ্রেণী আছে ভিটামিনের, প্রত্যেক শ্রেণীতে একাধিক বেশ কিছু রসায়নদ্রব্য আছে যারা ভিটামিনের কাজ করে। ভিটামিন বাইরে থেকে খেতে হয়, সাধারণতঃ খাবার থেকে, ভিটামিনহীনতার অসুখ প্রগাঢ় হলে ঔষধের মত ভিটামিন খেতে হয়। শরীর ভিটামিন তৈরী করতে পারে না অথচ কম পড়লে অসুখ হয়, সেই জন্য খাবার থেকে উপযুক্ত পরিমাণে পেতেই হয়।

ভিটামিন ক্যালরী দেয় না বটে, তবে শর্করা প্রোটিন ও চর্বি থেকে ক্যালরী পেতে দরকার হয়। অন্যান্য জীবনবিজ্ঞানের কাজও করে শরীরের ও স্বাস্থ্যের জন্য।

কিছু কিছু এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভিটামিনের মত খাবার থেকে পেতে হয় যদিও কয়েকটা ভিটামিন (যেমন—এ, ই) এবং অন্যান্য শারীরিক রসায়ন যৌগ ও অনুঘটক এ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কাজ করে। খাদ্যের কিছু প্রাকৃতিক রং, যেমন—ক্যারোটিন, লাইকোপিন, এন্থসায়নিন, ফ্ল্যাভোন ও কিছু লৌহ যৌগ এরাও এ কাজ করে থাকে।

2.2.6 খনিজ যৌগ

লৌহ, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি বেশ পরিমাণে এবং কোবাল্ট, নিকেল, সিলেনিয়াম, ক্রোমিয়াম, তাম দস্তা ইত্যাদি অল্প পরিমাণে শরীরের কাজে দরকার হয়। তাছাড়া ফসফরাস, সালফার, ক্লোরাইড, এদেরও দরকার হয়। এইসব খনিজ লবণ হিসেবে খাবার থেকেই নেওয়া হয় অনেকটা ভিটামিনের মতই। শরীরের অনেক অনেক প্রক্রিয়াতে এবং অনুঘটকের অংশ হিসাবে এরা দরকারী। পুরোপুরি পরিমাণ না হলে অসুখ হতে পারে, তখন ঔষধ হিসেবে খেতে হয়, যেমন ক্যালশিয়াম ও লৌহ।

2.2.7 ফাইবার

এও শর্করাজাতীয়, কিন্তু পলিমারের মত খুব বড় যৌগ। খাবারের সঙ্গে থাকে কিন্তু জারিত হয় না। মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায় এবং এতে খাদ্যনালী পরিষ্কার রাখে ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য হতে দেয় না। এরা জলে ত গুলেই না, এমনকি অম্ল বা ক্ষারেও প্রভাবিত হয় না।

2.2.8 নিউট্রাসেটিক্যাল ও ফাংসনাল খাদ্য

খাদ্যে কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্য থাকতেও পারে বিশেষ করে ঔষধি বলে পরিচিত উদ্ভিদ বা খাদ্য হিসাবে ব্যবহারও করা যেতে পারে। যেমন টমেটোর লাইকোপিন পুষ্টিদ্রব্য নয় কিন্তু এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে বহুমূল্য। ঐ টমেটোতেই 'পিত' নামে রাসায়নিক আছে যা রক্তে প্লেটলেট জড়ো (যাতে থ্রম্বসিস হয়) করার বিরুদ্ধে কাজ করে। সাধারণভাবে যে যে খাবারে এগুলো থাকে তাদের ফাংসনাল খাদ্য বলা হয়।

2.3 খাদ্যের প্রকারভেদ

উপরে উল্লেখিত পুষ্টিদ্রব্যগুলো খাবারে থাকবেই। কোন কোন খাবারে কোন কোনটি কম বেশী থাকে। সেই অনুযায়ী খাবারগুলোর শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। শ্রেণীগতভাবে খাদ্যকেও মোটামুটি চিহ্নিত করা হয়।

2.3.1 শর্করাবহুল খাদ্য

বলাবাহুল্য এই শ্রেণীর খাদ্যে সব পুষ্টিদ্রব্যই সাধারণভাবে থাকে। তবে শর্করাই বেশী পরিমাণে থাকে, সেই জন্য এদের শর্করা খাদ্যও বলা হয়। আমাদের খাবার শর্করা প্রধান হওয়ায় এই শ্রেণীর খাদ্যই খুব প্রয়োজনীয় এবং মানুষ এতেই বেশী বশ্য। চাল, গম, বার্লি, ভুট্টা এবং কয়েক রকমের মিলেট, যেমন—বাজরা, সরঘুম এই শ্রেণীর খাদ্য। এদের দানা শস্যও বলা হয়। সেদ্ধ বা ভেজে খাওয়া হয়, এদের থেকে গুড়ো বা অন্যান্য রকমভেদ জিনিসও করা হয়। এদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ শর্করাজাতীয় খাদ্যাংশ, ৮ থেকে ১০ শতাংশ প্রোটিন, ১-৪ শতাংশ চর্বি, ১৪-২০ শতাংশ জল এবং ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ প্রায় ১০ শতাংশ থাকে।

2.3.2 ডাল বা লেগিউম

এও দানাশস্য, তবে এতে প্রোটিন বেশ বেশী থাকে, ২০-৬০ শতাংশ। কিন্তু বৃক্ষজ প্রোটিন বলে এর জৈবিক মূল্য কম থাকে মাছ-মাংস-ডিম থাকে। নিরামিষাশীদের জন্য এরাই প্রোটিনের ভরসা।

এদের প্রোটিনের জৈবিক মূল্য কম কারণ কোন এসেন্সিয়াল এ্যামাইনো অম্লের কম পরিমাণ থাকা। তবে এদের নিজেদের মধ্যেই যদি মিশ্রণ তৈরী করা যায়, জৈবিক মূল্য বাড়ানো যেতে পারে। কোন ডালের এম্যাইনো এ্যাসিডের কমতি অন্য ডাল পুষিয়ে দিতে পারে। যদি জৈবিক মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া যায় তবে এগুলো গরীবের প্রোটিন হয়ে উঠতে পারে, যেহেতু এদের দাম মাছ, মাংস, ডিম থেকে অনেক কম। একটু দুধ মিশিয়ে দিলে নিরামিষ প্রোটিনগুলোর জৈবিক মূল্য অনেক বেড়ে যাবে—খাবারে দুধ-ভাত ও মাছ-ভাতের প্রচলন খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছিল।

2.3.4 ফল ও সব্জী

ক্যালরী দেয় এমন পুষ্টিদ্রব্য শর্করা-প্রোটিন-চর্বি প্রায় থাকে না যদিও এরা ভিটামিন ও খনিজ দরকারের বেশীর ভাগটাই সরবরাহ করে থাকে। আর বিশেষতঃ ফল খাবারের আনন্দ ও সতেজতা, স্বাদ ও গন্ধ, ঠাণ্ডার ভাব এগুলো দেয়। সব্জী স্যালাড করে কিছুটা অন্ততঃ খেলে ভাল ফলের মত, বেশীর ভাগ রান্না করে (সেদ্ধ, ভাজা ও ওভেনে বেক করে) খাওয়া হয়—কিছু কিছু সব্জীতে ক্যালরী ত পাওয়া যায়ই, ফলের মত আনন্দ, সতেজতা, স্বাদ ও গন্ধও পাওয়া যায়। এই খাদ্যের কোন কোন দ্রব্যে ফাইবার বেশি থাকে, বস্তুতঃ ফাইবারের জন্যই বৃহদন্ত্র নিয়মিত পরিস্কার রাখার জন্য বা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রচুর পরিমার সব্জী এবং ফলের বিধান দেওয়া হয়ে থাকে।

2.3.5 দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য

যেমন সবারই জানা আছে, খাদ্য হিসাবে দুধ সত্যিই চমৎকার। এর চর্বি (মাখন) ও প্রোটিন (কোজন) এদের নিজেদের শ্রেণীতে শ্রেষ্ঠ ভাবা যেতে পারে। অনেক ভিটামিনও খনিজ দুধে আছে। প্রাণদায়ী হিসেবে প্রকৃতি দুধের সৃষ্টি করেছে সব প্রাণীর বাচ্চাদের বাঁচার দরকারে। অন্যান্য পুষ্টিদ্রব্য ছাড়াও দুধের ভিটামিন 'এ' ও রিবোফ্লেভিন এবং উৎকৃষ্ট রূপের ক্যালসিয়াম থাকায় সব বয়সে আদর্শ স্বাস্থ্য রক্ষা, হাড়ের বৃদ্ধি, মজবুতি ও বার্ধক্যের ভঙ্গুরতা নিবারণ এবং দীর্ঘজীবন দুধ দিতে পারে।

কদাচিৎ 'ল্যাকটোজের অসহনীয়তা' দেখতে পাওয়া যায় কোন কোন দুধখাইদের মধ্যে। এটা একটা জন্মগত (বা জিনগত) অপূর্ণতা। ল্যাকটোজ অনুঘটকের অভাবে হয়। তখন দুধের শর্করা ল্যাকটোজকে পরিবর্ত্তিত করে বা কমিয়ে দিয়ে দুধ ব্যবহার করতে হয়। কারণ কোন অবস্থাতেই দুধ বাদ দেওয়া যায় না—বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ ওকোন কোন রোগীর বেলায়। দই, সন্দেশ, ছানা খাওয়া যায় দুধের বিকল্প বা নতুন খাবার হিসাবেও।

2.3.6 ফাইবার

সমস্ত পুষ্টিদ্রব্য জড় করা খাবার বা সিন্থেটিক খাবার আমরা খাই না। আমরা খাই প্রাকৃতিক খাদ্যদ্রব্য যাতে পুষ্টির সঙ্গে ফাইবারও থাকে। ফাইবার খাদ্যনালী পরিষ্কার রাখে, মলত্যাগ সুষ্ঠুভাবে রাখে। ফাইবার সেলুলোজজাতীয় জলে অদ্রবনীয় হয় সাধারণতঃ, জলে গলে অথবা তরল তেমনও কিছু অল্প পরিমাণ থাকে। তবে ফাইবার জারিত হয় না, মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

2.3.7 জল

নিজে যদিও কোন পুষ্টি দেয় না, শরীরের সব কাজেই জলের দরকার। জল পুষ্টিদ্রব্য বটেই সেইজন্য। বলাবাহুল্য জলের মান পানীয় জলের হবে, তাতেই নিরাপদ হবে। একেবারে বিশুদ্ধ জল হবে না, খনিজ লবণ থাকতে হবে, কোন জীবাণু বা ভাইরাস একদম থাকবে না। জীবাণুবাহিত রোগ জল দ্বারা বিশেষভাবে হয়ে থাকে। জলবাহিত খনিজ আমাদের পুষ্টির প্রয়োজন মেটায়, তাই ডিসটিল্ড জল আমরা খেতে পারি না।

2.4.1 সুষম খাদ্য

সব পুষ্টিদ্রব্য সুপারিশের নিম্ন সীমার মধ্যে থাকলে সেই খাবারকে সুষম খাদ্য বলা হয়। খাদ্য সুষম হওয়া বাঞ্ছনীয়, নতুবা খাবারের পরিপূর্ণ কাজ হয় না শরীরের ও স্বাস্থ্যের স্বার্থে। এ যেন টিমের কাজ—একজন মেম্বারও না থাকলে বা কমজোরী থাকলে টিমের কাজ বা সাফল্য হয় না।

সারাদিনের হিসাবে বলা হলেও প্রত্যেক খাবারই নিজস্বভাবে সুষম হবে। মধ্যাহ্ন ভোজন বা নৈশভোজন প্রধান খাবার হিসাবে ত সুষম হবেই, প্রাতঃরাশ ও টিভিন এদেরও সুষম হলে ভাল। অসম খাদ্য পাওয়া যেতে পারে তবে এক বা দুই ঘন্টার মধ্যে অন্য খাবার যেন অভাবটা পুরণ করে দেয় যাতে সামুল্যে সুষম হয়।

2.5 পুষ্টিদ্রব্য বিশ্লেষণ

কাঁচা খাদ্য বা খাবার কি রকম হল জানার জন্য পুষ্টিদ্রব্য বিশ্লেষণ করে জানতে হবে। খাদ্যে সব পুষ্টিদ্রব্যই এমনিতে থাকে, তবে পরিমাণ কম-বেশি হতে পারে। সেটা জানতে হয়, কখন কখন পুরো খাবারকেও বিশ্লেষণ করে জানতে হয় কোন পুষ্টিদ্রব্য কত পরিমাণে আছে। পুষ্টিদ্রব্যের মান বা প্রকারভেদও জানতে হয়। যেমন, প্রোটিন কি পরিমাণে আছে এবং প্রোটিন-এর মান এবং জৈবিক মূল্য কতটুকু, আবশ্যিক এ্যামাইনো এ্যাসিডগুলো কি কি পরিমাণে আছে। চর্বিরও মান বিশেষ করে অসম্পৃক্ত অম্ল কত কত আছে জানা দরকার—ওমেগা ৩ এবং ওমেগা ৬ অম্ল কি পরিমাণে আছে। শর্করা জাতিতে সুগার কত এবং কি কি, মনো, ডাই, ওলিগো ও পলিস্যাকারাইড কত জানা দরকার। ১৫-১৬টা ভিটামিন ও খনিজ লবণ কত কত আছে জানাও দরকার। জল ও ফাইবারও বিশ্লেষণ করে জানতে হবে কত কত আছে।

খাদ্য বিশ্লেষণ একটা বড় রকমের বৈজ্ঞানিক কাজ। এর জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রদেশ সরকারের এবং মিউনিসিপ্যালিটির বড় বড় লেবরেটোরী আছে। কর্মিদের মধ্যে অনেকে পুষ্টি বিশেষজ্ঞ থাকেন।

2.5.1 পুষ্টিগুণ জানা

খাদ্য বিশ্লেষণ খুব দরকারী কাজ। খাদ্য যাতে সপুষ্টি থাকে এবং নিরাপদ হয়, ভেজাল না হয় তার জন্য সরকারের আইন আছে। সেই আইনে বিশ্লেষণ খাদ্য পরিদর্শকের আনা নমুনা পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেন আইন অনুযায়ী। খাদ্য যদি মান অনুযায়ী না হয়, ভেজাল হয়, বা নিষিদ্ধ বস্তু খাবারে থাকে। তবে অপরাধ হয় এবং মামলার পর বিচার হয়।

খাদ্যের মান ও প্রবিধান রচনার মধ্যে ভেজাল নিরোধের কথা বলা হয়েচে সেখানেও খাদ্য বিশ্লেষণের নেহাৎ দরকার। সেখানে এই বড় ব্যাপারে হাত দেওয়া হয়নি, তবে একেবারে সাধারণ কিছু ভেজাল ধরার টেস্ট যা অতি সাধারণ লোক বা গৃহিনীরাও রান্নাঘরে করতে পারবেন মজা হিসাবে এদের কয়েকটা দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য, নিজের সাধারণ জ্ঞান হওয়া ছাড়াও খাদ্য পরিদর্শক বা অন্য কর্তাব্যক্তিদের জানানো। তাতে উৎস মুখে বিধান নেবার সুবিধা হবে এবং পরিশ্রম সোজাসুজি নিয়োগ করা যাবে ও নিষ্ফলতার রেট কমে যাবে।

2.5.3 খাদ্যের পুষ্টিমূল্য

খাদ্যের অনেক অংশের মধ্যে বেশিরভাগই মানুষের (এবং অন্য প্রাণীদেরও) পুষ্টির জন্য দরকার হয়। কিন্তু কিছু অংশ আছে যারা সোজাসুজি লাগে না। জল নিশ্চয়ই পুষ্টিতে লাগে তবে আমরা জলের জন্য কোন প্রধন খাবার খাই না, যদিও জল এবং পানীয় গ্রহণ করে থাকি। তেমনি ফাইবার-এর জন্য বিশেষ খাবারের দরকার পড়তে পারে কোষ্ঠকাঠিন্যজাতীয় অবস্থায় বা অসুখে। জল (ময়শ্চার) ও ফাইবার বিশ্লেষণ করা হয়। জলের কম-বেশিতে খাবারের স্থায়িত্ব বোঝা যায় ; তাছাড়া সাধারণতঃ জল বাদ দিয়ে শুকনো ওজন দরকার হয় খাদ্যমূল্য ও খাদ্য ভোজনের পরিমাণ হিসেব করার জন্য।

খাবারের এই মূল্যগুলি এবং নানা রকম ভিটামিনও খনিজের পরিমাণের বেশ কিছু বিবরণও টেবিল গাইড টু এপ্লাইড নিউট্রিশন, মুখার্জী ও লোধ প্রণীত—এই বই-এ দেওয়া আছে।

2.5.4 দৈনিক খাবার কেমন হবে

দৈনিক খাবার কি কি হবে এবং কত পরিমাণে তা নিয়ে অনেক অনেক ভাবনা-চিন্তা করা হয়েছে। যা যা বলা হয়েছে তা ঐ সমস্ত গবেষণারই ফলশ্রুতি। খুব সম্প্রতি সুস্থ মানুষ তবে রক্তে কিছুটা কলেস্টেরল বেশী আছে এদের জন্য দৈনিক খাবারের ভাবনা করা হয়েছে ; সেটা দেখা যাচ্ছে সাধারণভাবে সবার জন্যই প্রযোজ্য।

(১) প্রোটিন জাতীয় ঃ মোট ক্যালরীর চাহিদার ১৫ শতাংশ ক্যালরী প্রোটিন থেকে গেলে ভাল।

(২) শর্করাজাতীয় (বেশির ভাগই কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট হবে, চিনিজাতীয় হবে না) ঃ মোট ক্যালরীর চাহিদার ৬০ শতাংশ শর্করা খাবার হওয়া উচিত।

(৩) চর্বিজাতীয় ঃ (ক) সম্পৃক্ত (স্যাচুরেটেড)—৭ শতাংশ মোট ক্যালরীর।

(খ) একাধিক অসম্পৃক্তি (পি.ইউ.এফ.এ) ঃ মোট ক্যালরীর ১০ শতাংশ পর্যন্ত, লিনোলেইক এ্যাসিড (১৮ : ২ এন-৬)—মোট ক্যালরীর ৩ শতাংশ, লিনোলেনিক এ্যাসিড (১৮ : ৩ এন-৩)—মোট ক্যালরীর ০.২৫-০.৫৪ শতাংশ, আইকোসাপেন্টানোইক এসিড (২০ : ৫ এন-৩) ও ডকোসাহেক্সানেইক এ্যাসিড—০.১৫ শতাংশ মোট ক্যালরীর। এন-৬ ও এন-৩ এর অনুপাত হবে ৪।

(গ) ফাইবার ঃ দৈনিক ২০-৩০ গ্রাম।

(ঘ) কোলেস্টেরল ঃ ২০০ মিলিগ্রামের কম।

2.5.5 পুষ্টি লেবেল

আজকাল অনেক খাবারই প্যাক করা হয় উন্নত প্রথায়। প্যাক করলে লেবেলও থাকবে। লেবেলে আইনতঃ কিছু কিছু দরকারী তথ্য থাকবে, যেমন—নির্মাতার নাম ও ঠিকানা, ব্যাচ নম্বর ও তারিখ, খাবারের পরিমাণ, আইনগ্রাহ্য নাম ইত্যাদি। তার উপরে, যদিও অবশ্য পালনীয় নয়, পুষ্টির উল্লেখ কিছু কিছু ব্যাপারে করতে হবে যাতে ভোক্তার প্রয়োজন হতে পারে, যেমন—ক্যালরী কত, সুগার কত, সোডিয়াম কত ইত্যাদি। তাছাড়া আইনে কিছু কিছু নিষেধ আছে তারা দেখতে হবে, যেমন রং মেশানো হয়েছে কিনা বা অন্য কোন ক্যামিকেল ইত্যাদি। এসবই লেবেলে জ্ঞাতব্য হিসাবে দিতে হবে।

2.6.2 খাদ্যে বিষক্রিয়া

প্রকৃতি তৈরী করে রেখেছে এমন জিনিষ থেকেই খাদ্য পাওয়া যা, যেমন—উদ্ভিজ্জ প্রধানতঃ, তাছাড়া মাছ ও মাংস (জন্তু ও পাখি) আছে, অন্যান্য প্রাণীও আছে। ওদেরকে কেবল মনুষ্যভক্ষ্য করেই প্রকৃতিতে সৃষ্ট হয়েছে এমন ভাবার কারণ নাই। প্রত্যেক প্রাণীরই নিজস্ব প্রয়োজন আছে সৃষ্টিতে সন্তুলন, পরিবেশে ভারসাম্য, খাদ্য-খাদক, পরস্পর নির্ভরতা হয়ত এমন কিছু কিছু কারণ। অনেক তথাকথিত খাদ্যই খাওয়ার অনুপযুক্ত, সামান্য কয়েকটি উপযুক্ত এবং বাকীগুলো এমন যে এদের মধ্যে কিছু মন্দকারী বা বিষক্রিয়াকারী রাসায়নিক অল্পবিস্তর থাকে। এই শেষোক্ত তৃতীয় শ্রেণী অনেক খাদ্যদ্রব্যই খাবার হিসেবে ব্যবহার করতে হয় কারণ খাদ্য সাধারণভাবে অপ্রতুল। প্রথমশ্রেণীর দ্রব্য (উদ্ভিদ ও প্রাণী) খাওয়া হয় না বিষক্রিয়ার জন্যই। কোন কোন বিষকারী বা বিপজ্জনক রাসায়নিক থাকে বলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি, নানারকম রোগ, এমনকি মৃত্যুও হয়। ঐ রাসায়নিকগুলোকে বিষ বা টক্সিক দ্রব্য বলা হয়। খাদ্যে তিনভাবে বিষাক্ত বা টক্সিক দ্রব্য আসতে পারে—

(১) প্রকৃতিজাতভাবে

(২) খাবার তৈরী করা এবং মজুত করা বা ধরে রাখার মধ্যে এগুলো তৈরী হয়

(৩) একেবারে বাইরে থেকে আসা—

(ক) ইচ্ছে করে প্রযুক্তির খাতিরে মেশানো হয়, যেমন—রং এন্টিঅক্সিডেন্ট, প্রিজারভেটিভ ইত্যাদি।

(খ) খাবারের জন্য নয়, অন্য দরকারে ব্যবহৃত রাসায়নিকের অযাচিত উপস্থিতি, যেমন—পেষ্টিসাইড, সার, এ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদির লেগে থাকা অংশ।

2.6.1 খাদ্যের বিষের নিষ্ক্রিয়করণ

জীবন রসায়নে খাদ্যের জারণ যেমন আছে তেমনি বিষের নিষ্ক্রিয় করাও আছে, নতুবা খাদ্যের সুফল পাওয়া সম্ভব ছিল না। খাদ্যাংশ যেমন অক্সিডাইজ হয়ে ওদের উপকারী কাজ করে, বিষ বা টক্সিন পদার্থগুলোও অক্সিডাইজ হওয়ার কারণে পোলার হয়ে জলে গুলে যায় এবং কিডনী দিয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন খাদ্যাংশ বা খাদ্যাংশের জারিত অংশের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনের পর বিষ বা অক্সিডাইজড বিষ একইভাবে প্রস্রাবের সঙ্গে বা অন্য কোনভাবে শরীরের বাইরে আসতে বাধ্য হয়।

2.7 অপুষ্টির অনিষ্ট

(১) শরীরের বৃদ্ধি কম হয়, ওজন কম থাকে।

(২) শরীরের দৈর্ঘ্যও কম হয়। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং অন্যান্য জৈব জিনিস পুষ্টি থেকে কম পাওয়া বা না পাওয়ার জন্য হাড় লম্বা মোটা ও শক্ত হয় না ; সুতরাং দৈর্ঘ্য এবং ওজনও কম। গবেষণালব্ধ জ্ঞানে দৈর্ঘ্য ও ওজন বয়সের সঙ্গে কিরকম বাড়বে তার হিসেবের টেবিল আছে। যেটা মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে অপুষ্টি আছে।

(৩) বলাবাহুল্য শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবগুলোই অপুষ্টিতে ঠিক ঠিক বাড়ে না এবং কার্য্যধারায়ও নিম্নমানের হবে। চোখ, মস্তিস্ক, লিভার, হার্ট, কিডনীর মত অপরিহার্য্যরূপে দরকারী প্রত্যঙ্গ খারাপ হয় বলে জীবনের সমূহ বিপদ, তাছাড়া হাত, পা, পেশীও নিচু দরের হয়। তাই অপুষ্ট মানুষ পরিশ্রমী বা ভাল খেলোয়াড় হতে পারে না। একটা প্রবাদই বলা হয়, 'অপুষ্টি ব্রেন ও ব্রন দুইই মেরে দেয়'।

(৪) প্রায় সব অসুখই জেঁকে বসতে পারে অপুষ্টিতে। বীজাণু সংক্রমণতা বেড়ে যায়, তাই আমাদের যে প্রায় আশিভাগ অসুখই সংক্রমণজনিত সেগুলোও বেড়ে যেতে পারে। যক্ষা রোগে, অপুষ্টি আগে হয়ে জমি তৈরী করে যক্ষার বীজাণু সংক্রমণের ও সবাই জানে, বাচ্চাদের হৃৎপিণ্ড খারাপ হয় অপুষ্টিতে (রিউমেটিক হার্ট) এবং সঙ্গোতিক প্রোটিন অনুপুষ্টিতে কোয়াশিওরকর ও মেরাসমাস হয়।

(৫) অপুষ্টির জন্য শরীরের জীব রসায়নদের তৈরী ব্যাহত হয়। যেমন, এন্টিবডি—যার অভাবে বীজাণু সংক্রমণতা বাড়ে এবং হরমোন—যাদের অনেক কাজ করতে হয়। একটা কাজ হল শরীরের সন্তুলিত বৃদ্ধি ও লাবণ্য বৃদ্ধি ; সেইজন্য অপুষ্ট মানুষ দেখতে সুন্দর হতে পারে না।

(৬) অপুষ্টি মানবিক অধিকারের মধ্যে যদি নিজস্ব গাফিলতি বা অজ্ঞতার জন্য না হয় সেই ক্ষেত্রে দেশকে মানুষের দরকার দেখতে হবে যাতে মানুষ নিজস্ব পরিশ্রমে অপুষ্টির হাত থেকে রেহাই পেতে পারে সেই সেই সুযোগ তৈরী করে দিতে হবে দেশকে। অনেকে এটাকে প্রাণীর মৌলিক অধিকার এবং উপভোক্তাদের পবিত্র অধিকার বলেও মনে করে।

(৭) দেশবাসী পুষ্ট হলে দেশেরও ভাল। দৈনিক কাজ বা পরিশ্রম বেশী হয়; মৃত্যু বার্দ্ধক্যের অপারগতা দেশের উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

(৮) দেশের হিসেবে, সামান্য পুষ্টিদ্রব্য কম খাওয়ার জন্য অসুখ হওয়ার পর চিকিৎসা খরচ বা হাসপাতাল খরচ প্রায়ই ঐ পুষ্টিদ্রব্যের দামের থেকে অনেক বেশী হয়--এটা পেনীজ্ঞানী পাউন্ড নির্বোধ গোছের অকর্ত্তব্য।

(৯) খুব বেশিদিন ধরে অথবা অনেক পুরুষে অপুষ্টি চলতে থাকলে জিন পরিবর্ত্তনও হতে পারে বলে অনেক মনে করেন। অন্য সব প্রভাব একই তবু উন্নত অনুন্নত শ্রেণীর শারীরিক পার্থক্য অনেকটা অপুষ্টিজনিত হতে পারে।

(১০) খেলোয়াড় ও যোদ্ধাদের শারীরিক সক্ষমতা ভারতীয়দের তুলনায় অনেক দেশের বেশী। চীনা ও জাপানীদের বর্ত্তমান শারীরিক উন্নতি দেখা গেছে। এগুলো পুষ্টির সুফল নিশ্চয়ই।

(১১) পুষ্টিদ্রব্য কম হলে কি কি অসুখ হতে পারে তা মোটামুটি জানা আছে, আরও ভবিষ্যতে জানা যাবে গবেষণা দ্বারা। প্রোটিনের অপুষ্টি থাকলে অনেক অস্বাস্থ্যজনিত বিরূপতা বেড়ে বেড়ে অসুখ হয় আগে বলা হয়েছেযে চর্বির অপুষ্টির জন্য ক্যালরীর অভাবও অন্যান্য জীবনরাসায়নিক অসুবিধার পর আবশ্যিক ফ্যাটি অম্লর অভাবে চর্মরোগ। শর্করার কমতি খুব হয় না, হতেও পারে। মস্তিষ্কে গ্লুকোজ সরবরাহ কম হলে অসুখ ও সমূহ বিপদ। ভিটামিন 'এ'র অভাবে চোখের ও শ্বাসনালীর অসুখ ছাড়াও অনেক প্রক্রিয়াগত অসুখ। ভিটামিন 'বি'দের অভাবে গুচ্ছের অসুখ। ভিটামিন 'সি'র অভাবে স্কার্ভি ও অন্যান্য। ভিটামিন 'ডি' না থাকলে বাচ্চাদের রিকেট ও বয়স্কদের প্রক্রিয়াগত রোগ। ভিটামিন 'কে' না থাকলে রক্তপাত হয়ে মানুষ মারা যেত। প্রায় সেই রকম প্রত্যেক খনিজ (সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাংগানিজ, লৌহ, তাম্রর, নিকেল, কোবাল্ট, সিলেনিয়াম, ক্রোমিয়াম) এদের আলাদা আলাদা প্রভাব আছে- অভাবে বিশৃঙ্খলা ও অসুখ হয়, যেমন-লোহার অভাবে রক্তাল্পতা, ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড়ের বৃদ্ধি না হওয়া এবং আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড এগুলো হতে পারে।

(১২) উল্টোদিক দিয়েও পুষ্টিজ্ঞান হয়। কি কি পুষ্টিদ্রব্যের কি কি কাজ ও উপকারিতা পুষ্টিবিজ্ঞানের অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়। পুষ্টিদ্রব্যের অভাব হলে এই সব জীবনদায়ী প্রক্রিয়া হতে পারে না।

2.8 সারাংশ

পুষ্টি ঠিক ঠিক না হলে মানুষের ওজন, দৈর্ঘ্য সৌন্দর্য্য, কাজ করবার ক্ষমতা, খেলাধূলায় ও মস্তিষ্কের নৈপুন্য, রোগ ও সংক্রমণ ক্ষমতা এবং ভাল স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কোনটাই হয় না। সমাজ বা দেশের স্তরেও ক্ষতি হয়- উৎপাদন ক্ষমতা কম হয়- অসুস্থতার জন্য হাসপাতালের খরচ বেশী হয়, এমনকি যে যে পুষ্টিদ্রব্যের যে যে পরিমাণ অভাবে অপুষ্টি হল এদের দামের থেকেও বেশী; অকাল মৃত্যু বা কম আয়ুর জন্য দের কাছ থেকে পুরো সুবিধা দেশ পেল না, ইমিউনিটিরও অসুবিধা হয়, দেশে সংক্রামক রোগের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে, জাতীয় সৌন্দর্য মার খায় এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দেশের সুনাম হয় না ইত্যাদি।

খাবারের পুষ্টিদ্রব্য বিচার করতে গিয়ে এ্যান্টিঅক্সিডেন্টকেও এক শ্রেণীর পুষ্টিদ্রব্য বলে উল্লেখ করা হল;

খুবই প্রয়োজনীয় এরা —সেইজন্য চা ও রঙ্গীন শাকসব্জী উল্লেখযোগ্য খাবারে বা পথ্যে কি কি ধরনের প্রাকৃতিক খাদ্য থাকবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। খাবার কেমন হবে বলতে গিয়ে সুষম খাদ্যের ধারণা করা দরকার — আর. ডি. এ. অনুযায়ী পুষ্টিদ্রব্য থাকলেই সেই খাবারকে সুষম খাদ্য (ব্যালেন্সড ফুড) বলা যাবে। আর. ডি. এ. টেবিল দেওয়া আছে—সেই অনুযায়ী বিচার করতে হবে। প্রত্যেক খাদ্যেরই পুষ্টিগুণ আছে কম-বেশী। বেশী পুষ্টি থাকলে কম পুষ্টির খাবারে মিশিয়ে আর ডি. এ. অবধি নিয়ে আসা যায়। খাদ্য বিশ্লেষণ এবং পুষ্টি বিশ্লেষণ করে খাদ্যে পুষ্টিদ্রব্য কি কি আছে তার একটা বড় টেবিল দেওয়া আছে, আর. ডি. এর. ও টেবিল দেওয়া আছে। প্রক্রিয়াজনিত কিছু অনিষ্ট হতেও পারে পুষ্টিদ্রব্যে — এ স্বল্প আলোচনা আছে। অপুষ্টি শুধু পুষ্টির অভাবেই নয়, বিষকারী দ্রব্যও বিষক্রিয়া করে, স্বাস্থ্যেরও সরাসরি কোন পুষ্টিদ্রব্যের হানি করেও অনিষ্ট করতে পারে। শরীর কিছু কিছু পরিমাণ বিষকারী বা বিষাক্ত দ্রব্যকে নির্বিষ করতে পারে—অবশ্য এর জন্য কিছু কিছু ভিটামিন, এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ক্যালরী ইত্যাদির খরচের বোঝা শরীরকে বহন করতে হয়।

খাদ্যের জীবন বিদ্যা, জারণ, উৎসেচকের কার্য্যপ্রণালী, অপুষ্টি বা বিষকারকতার জন্য ইমিউনিটির বিষক্রিয়া বা বিরূপতা ইত্যাদিও পুষ্টিসংক্রান্ত ব্যাপারে দরকারী।

2.9 অনুশীলনী

(১) পুষ্টিদ্রব্যগুলির নাম বলুন।

(২) জল, ফাইবার ও এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কতখানি পুষ্টিদ্রব্য বিচার করুন।

(৩) তাপবিদ্যার ক্যালরী ও পুষ্টিবিজ্ঞানের ক্যালরী এক কিনা আলোচনা করুন।

(৪) খাবারের প্রকারভেদে কি কি প্রকার খাবার খেতেই হয়?

(৫) ভিটামিনগুলোর কি কি প্রয়োজনীয়তা?

(৬) খনিজ দ্রব্য (মিনারেল) কি রকমভাবে দরকারী?

(৭) কাঁচা খাবার খাওয়ার পর ওর কি কি রাস্তায় গতি হয়?

(৮) অপুষ্টিতে কি কি শারীরিক অনর্থ হয়?

(৯) বিষক্রিয়া করে এমন দুইটি পদার্থের নাম বলুন যারা খাবারে থাকতেও পারে।

2.10 গ্রন্থপঞ্জী

1. Robinsonn, D.S. : Food Biochemistry and Nutritive Value, 1987, John Wiley & Sons, New York.
2. Osborne, D. R. and Voogt, P. : Analysis of Nutrients in Foods, 1978, Academic Press, London.

3. Somogyi, J. C. : Nutrition and Technology of Foods for Growing Humans, 1973, S. Karget, London.

4. Mudambi, S. R. and Rajagopal, M.V. : Fundamentals of Foods and Nutrition, 1990, Wiley Eastern Ltd., Kolkata..

5. Serimshaw, N. S. and Wallerstein : Nutrition Policy Implementation, 1982, Plenum Press, London.

6. Antia, E. P. and Abraham, P. : Clinical Dietetics and Nutrition, 2000, Oxford University Press, Oxford.

7. Birch G. G. and Parker K. J. : Food and Health : Science and Technology, 1980, Applied Science Publisher Ltd. London.

8. McDivitt, M. E. and Mudambi, S. R. : Human Nutrition Principles and Application in India, 1973 Prentice Hall of India P. Ltd., Niw Delhi.

9. Winick, M. : Nutrition and Development, 1972, John Wiley & Sons, London.

10. Beaton, G. H. and McHenry, E. W. : Nutrition–A Comprehensive Treatise, 1964, Academic Press, London.

11. Linder, M. C. : Nutritional Biochemistry and Metabolism, 1981, Elsevier, Amesterdam.

12. Pyke, R. L. and Brown, M.L. : Nutrition–An Integrated Approach, 1967, Wiley Eastern P. Ltd., New Delhi.

13. Mukherjee, S. and Lodh, S. C. : A Guide to Applied Nutrition, 1999, Granthalaya P. Ltd., Kolkata.

একক 3 □ খাদ্যের বিষ-বিষয়ক বিজ্ঞান (টক্সিকোলজী)

গঠন ঃ

3.0 উদ্দেশ্য

3.1 প্রস্তাবনা

3.2 খাদ্যের প্রকৃতিগত বিষকারী দ্রব্য

- 3.2.1 গলগণ্ডকারী (গয়টরোজেন)
- 3.2.2 এ্যালারজেন
- 3.2.3 লেকটিন
- 3.2.4 এনজাইমরোধক বা এ্যান্টিএনজাইম
- 3.2.5 এন্টিভিটামিন ও এ্যান্টিমেটাবলাইট
- 3.2.6 সায়নোজেন গ্লাইকোসাইড
- 3.2.7 ল্যাথিরোজেন
- 3.2.8 কারসিনোজেন, মিউটাজেন ও টেরাটোজেন
- 3.2.9 মাইকোটক্সিন
- 3.2.10 অন্যান্য বিষকারী

3.3 কিছু উপকারী রসায়ন

- 3.3.1 খাদ্যের ম্যানেজমেন্ট

3.4 অপ্রাকৃতভাবে আসা বিষকারী দ্রব্য

- 3.4.1 র‍্যানসিডিটি
- 3.4.2 অম্লতা
- 3.4.3 প্রোটিনজাত বিষকারক

3.5 জেনোবায়োটিক বিষকারী

- 3.5.1 খাবারে মেশানো রাসায়নিক
- 3.5.2 রেসিডিউ
- 3.5.3 পরিবেশ থেকে

3.6 বিষক্রিয়া

3.6.1 এল ডি-৫০

3.6.2 সাব-এাকিউট বা ক্রনিক টেস্ট

3.6.3 সবচেয়ে দরকারী প্রত্যঙ্গের কার্য্যকারিতার পরীক্ষা

3.6.4 জীব রসায়ন পরীক্ষা

3.6.5 জিনোটক্সিসিটি টেস্ট

3.7 এ ডি আই (এ্যাক্সেপ্টেবল ডেইলী ইনটেক)

3.8 খাবার থেকে পাওয়া (খাদ্যবাহিত) রোগ

3.8.1 উপরে বর্ণিত (১.৪ এবং ১.৫) বিষকারী দ্রব্য দ্বারা বিষক্রিয়া

3.8.2 খাদ্যবাহিত জীবাণু বা ভাইরাস দ্বারা অনেক রোগ

3.9 সারাংশ

3.10 অনুশীলনী

3.11 গ্রন্থপঞ্জী

3.0 উদ্দেশ্য

খাদ্যে বিষ বা বিষক্রিয়াকারী কিছু কিছু রাসায়নিক যৌগ থাকে স্বাভাবিকভাবেই, যেমনভাবে পুষ্টিদ্রব্যও থাকে। কিছু পুষ্টিদ্রব্য যা নেহাৎই প্রয়োজনীয় এরাও বিষক্রিয়া করতে পারে বেশী পরিমাণে গৃহীত হলে পরে। কিছু কিছু বিষকারী রাসায়নিক ছিল না তবু তৈরী হয় আমাদেরই জন্য, যেমন রান্না বা অন্য কোন প্রক্রিয়ার সময়; ষ্টোর করে রেখে দিলে, ঠিক ঠিক সংরক্ষণ না করলে। আরও কিছু বিষকারী বাইরে থেকে আসে, যেমন ইচ্ছে করে দরকার মত কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য অল্প পরিমাণে খাবারে মেশালে (এ্যাডিটিভ); কাঁচা খাদ্য চাষ করার সময় বা পশুপালনে ব্যবহৃত রাসায়নিক শেষ খাবারে বা পথ্যে চলে আসতে পারে—এরা বেশী পরিমাণে থাকলে বিষকারী; আর পরিবেশ (জল, বায়ু ও মাটি) দূষণ ত হতেই পারে— খাবার এদের থেকে পাওয়া যায় এদের মধ্যে থাকা বিষকারী দ্রব্য খাবারেও আসতে পারে। এই সমস্ত বিপত্তির আলোচনা করাই এই পাঠের উদ্দেশ্য।

3.2 খাদ্যের প্রকৃতিগত বিষকারী দ্রব্য

মানুষের বিষকারী প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্য আছে। এদেরকে কয়েকটা শ্রেণীতে, মানুষের উপর ক্রিয়ার ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে; কখনও বা রাসায়নিক চরিত্রের ভিত্তিতেও।

3.2.1 গলগণ্ডকারী (গয়টরোজেন)

কয়েক রকম রাসায়নিক আছে যারা থাইরয়েড গ্রন্থির কাজে বাধা দেয়, থাইরক্সিন নামক হরমোন শরীর তৈরী করতে বাধা পায়। যেমন গ্লুকোসাইনোলেট ভেঙে গয়টরোজেন জাতীয় জিনিষ তৈরী হয়। বাঁধাকপি, সরষে ও ক্রুসিফার জাতীয় গাছে এ জিনিষ বেশী হয়। গয়টরোজেন ছাড়াও থাইরক্সিন তৈরী হতে বাধা হতে পারে, খাদ্যে আয়োডিন কম থাকলেও। থাইরক্সিন কম হলে গলগন্ড হয়।

3.2.2 এ্যালারজেন

খুবই জানা আছে সবার, অনেক খাবারেই এ্যলার্জী হয়। এতে অনেক রকম শারীরিক কষ্ট হয়, মারাত্মক না হলেও ক্লেশকারী। এরা প্রোটিন জাতীয়, এ্যান্টিবডির সঙ্গে ক্রিয়া করে ক্রমান্বয়ে হিস্টামিন তৈরী করে; যা এই অশুখের মুল। তাই হিস্টামিন বিরোধী ঔষুধের আবিষ্কার ও ব্যবহার হতে হয়েছে। উন্নত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় জিন ইঞ্জিনিয়ারিং করে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতেও পারে খাতা-কলমে; তবে এর অভাবে গাছের ক্ষতি মারাত্মক হয় কি না দেখতে হবে—হয়ত এতে গাছই বাঁচল না।

3.2.3 লেকটিন

এ একটা অদ্ভুত জিনিষ। অনেক কাজ করে, তার মধ্যে মানুষের কিছু অসুবিধা, হয়ত অসুখও হয়। এরাও সাধারণতঃ প্রোটিন।

3.2.4 এনজাইমরোধক বা এ্যান্টিএনজাইম

এরা জৈব অনুঘটকের কাজে বাধা দেয়। যেমন সয়াবিন ও অনেক ডালে এান্টিট্রিপসিন আছে, যেগুলো সেদ্ধ করলে নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এগুলো কাঁচা খেতে নেই তবে অঙ্কুরোদ্গমের সময় নষ্ট হয় বলে অঙ্কুরিত ছোলা মটর ইত্যাদি পাওয়া যায়।

3.2.5 এ্যান্টিভিটামিন ও এ্যান্টিমেটাবলাইট

এরা ভিটামিন ও মেটাবলাইটদের বিরুদ্ধে কাজ করে।

3.2.6 সায়নোজেন গ্লাইকোসাইড

এদের থেকে হাইড্রোসায়ানিক এ্যাসিড (মারাত্মক বিষ) তৈরী হয় ও বিষক্রিয়া করে। কিছু কচু এবং টেপিওকাতে থাকে। এদের কেটে কিছুক্ষণ রেখে দিলে অনুঘক দ্রারা ভগ্ন হওয়ার পর অম্ল মিডিয়ামে হাইড্রোসায়ানিক এ্যাসিড বেরিয়ে যায়।

3.2.7 ল্যাথিরোজেন

এরা স্নায়ুর বিষ। খেশারী ডালে (Lathyrus sativus) থাকে বলে শ্রেণীর এই নাম। খেশারী ডালে থাকে বি ও এ এ (বিটা ওক্স্যালিল এ্যামাইনো এ্যালানিন)। এটা এ্যান্টিমেটাবলাইটও, এ্যালানিনের এন্টি প্রাথমিকভাবে হয় বলেই হয়ত স্নায়ুর বিষ বা অন্য বিষক্রিয়া করে। সেদ্ধ চাল তৈরী করার মত সেদ্ধ (পার-বয়েলিং) করে শুকিয়ে ডাল তৈরী করলে অনেকটা বিষ বেরিয়ে যেতে পারে।

3.2.8 কারসিনোজেন, মিউটাজেন ও টেরাটোজেন

এগুলি জিনকে বদলে দেয়। তাতে যথাক্রমে নানরকমের ক্যান্সার, চেহারা বা ফিনোটাইপ বদল এবং আকৃতি (হাড়ের খাঁচার কোন অংশ) অন্যরকম হতে পারে।

3.2.9 মাইকোটক্সিন

খুব বিপজ্জনক বিষ, কয়েকরকম ছত্রাক থেকে হয়। আফলাটক্সিন মানুষ গরু ও মুরগীর মারাত্মক লিভারের বিষ।

3.2.10 অন্যান্য বিষকারী

হেমোগ্লুটিন, সাইকাসিন, সেপোনিন, গসিপল, ফ্যাবিজম, এস্ট্রোজেন, স্টিমুল্যান্ট ও ডিপ্রেস্যান্ট, লিভার ও কিডনী বিষ, কিলেটিং (ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের বাঁধন) এজেন্ট, ফ্ল্যাটাস (ডালে থাকা ওলিগো স্যাকারাইড), টক্সিক এ্যালকালয়েড (যেমন আমানিটিন যা এক ধরনের আমানিটা ছত্রাকে বা মাশরুমে থাকে বলে সেই ছত্রাক খেলে মৃত্যুও হতে পারে), ম্যারিনটক্সিন (কয়েক ধরনের সামুদ্রিক মাছ থাকে যেমন পাফার মাছে টেট্রোডোটক্সিন ও কয়েকটা শেলওয়লা মাছে শেলফিস পয়জনিং হয়) ইত্যাদি।

3.3 কিছু উপকারী রসয়ান

উপরে বর্ণিত বিষগুলি ত আছেই তবে কিছু কিছু উপকারী জিনিষও থাকে খাদ্যে, যেমন ক্যান্সার বিরোধী, রক্তে গ্লুকোজ কমানো (যেমন করলা, মেথী এতে অজানা রসায়ন), দরকার মত উত্তেজক (যেমন চায়ের ক্যাফিন) ইত্যাদি। খাবারে কিছু স্বাস্থ্যের উপকারী জিনিষ আছে যেগুলিকে নিউট্রাসিটিক্যাল বলা হয় যারা পুষ্টি দেয় এবং ঔষধেরও কাজ করে। টমেটোতে এ্যাস্পিরিনের বিকল্প অথচ একেবারে নিরাপদ পি-৩ হালে আবিষ্কৃত হয়েছে।

3.3.1 খাদ্যের ম্যানেজমেন্ট

বিষকারী দ্রব্য যাতে এ ডি আই (এ্যাক্সেপ্টেবল ডেইলি ইনটেক)-এর বেশী না হয় (যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জানা বা বোঝা আছে) দেখতে হবে। খাবার তো পরিত্যাগ করা যায় না, তাই সাবধানতা অবলম্বন করে বাঁচতে হবে।

3.4 অপ্রাকৃতভাবে আসা বিষকারী দ্রব্য

খাবার তৈরী করবার সময় এবং রাখার সময় নতুন করে কিছু কিছু বিষকারী তৈরী হতে পারে।

3.4.1 র‍্যানসিডিটি

এটা তেলে হতে পারে। তেলের অসমৃক্ত অম্লের সঙ্গে অক্সিজেন ক্রিয়া হওয়ার হাইড্রোপারওক্সাইড এবং পর পর ক্রমান্বয়ে ছোট ছোট অক্সিজেন সমৃদ্ধ যৌগের সৃষ্টি হয়, যেমন এ্যালডিহাইড, কিটোন, অম্ল ও এষ্টার। এদের সবার গন্ধ মিলে মিশে এক রকমের গন্ধ তৈরী হয় যাকে র‍্যানসিডিটি বলা হয়। এটা অনেকেরই চেনা গন্ধ। এত বিষকারী এবং পচা বা নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সংযুক্ত জ্ঞানে সবার অবাঞ্ছিত, তাছাড়া এতে কয়েকটা ভিটামিন অক্সিজেন সহযোগে নষ্ট হয়।

3.4.2 অম্লতা

অনেক খাদ্যদ্রব্যই বেশী সময়ে জল, তাপ ও কিছু খনিজ (যেমন লোহা ও তামা) সহযোগে অম্ল হয়ে যায়। বিশেষ করে প্রোটিন ও চর্বি ত অম্ল পদার্থ দ্বারা তৈরী। সময় ক্রমে ক্রমে রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক (অনুঘটকের জন্য) উপায়ে অম্লের উদ্ভব হয়। অম্ল খুব বেশী না হলেও বিষকারী বটে।

3.4.3 প্রোটিনজাত বিষকারক

বেশী তাপে বিশেষতঃ ক্ষার (খাবার সোডা) থাকলে প্রোটিন থেকে কিছু বিপদ তৈরী হয়, যেমন রেসিমাইজেশন (এল থেকে ডি এ্যামাইনো অম্ল), আইসোপেপটাইড এই ধরনের অন্য কিছু। এদের থেকে প্রোটিনের পুষ্টি ত পাওয়া যায়ই না, বরং এরা নানাভাবে বিষকারী। সুতরাং বেশী তাপ (যেমন তেলে বেশী তাপে অনেকক্ষণ ভাজা) এবং সোডার ব্যবহার বর্জনীয়। তবে বেশী তাপ অল্প সময় (এইচ টি এল টি) যেমন প্রেশার কুকার চলতে পারে।

3.5 জেনোবায়োটিক বিষকারী

শরীর যা জীবনবিজ্ঞানের সিস্টেমে (বাইরে থেকে আমদানীকৃত) বিষ সৃষ্টিকারী এরা।

3.5.1 খাবারে মেশানো রাসায়নিক

নানারকমের রাসায়নিক অল্প পরিমাণে খাবারে মেশানো হয় কোন কোন প্রযুক্তির দরকারে। যেমন রং, স্বাদ ও গন্ধ দ্রব্য, প্রিজারভেটিভ, এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, কিছু দ্রব্য নানা কাজের জন্য ব্যবহৃত যেমন ইমালশন করা, স্থায়ীত্ব বাড়ানো, পরিষ্কার করা ইত্যাদি।

3.5.2 রেসিডিউ

খাদ্যে খামারে উৎপাদন করার সময় ব্যবহৃত রাসায়নিক। যেগুলো খাদ্যে আসুক কেউ চায় না, তবুও অনিচ্ছাকৃত

হলেও এসে যায়। যেমন কীটনাশক থেকে, সার থেকে, গরুকে দেওয়া ঔষুধ বা এ্যান্টিবায়োটিক থেকে ইত্যাদি। বলাবাহুল্য এইগুলো সাধারণভাবে বিষকারী। কীটনাশকের রেসিডিউ ইতিমধ্যেই অনেক বিপদের কারণ হয়েছে, কারণ কীটনাশক কীটের নাশ করলেও অন্য প্রাণকেও বিষাক্ত করতে পারে।

3.5.3 পরিবেশ থেকে

কৃষি, শিল্প, গৃহস্থালী, খনিজ, খাবারের পাত্র বা প্যাক বিশেষতঃ প্লাস্টিক, রেডিওএ্যাক্টিভ দূষণ ইত্যাদি থেকে বিষকারী পদার্থ আসতে পারে। এ্যাসপারজিলাস এবং অন্য কয়েকটি ছত্রাক মেরে মাইকোটক্সিন তৈরী হয় খাবারে, যেমন আফলাটক্সিন। পরিবেশের বায়ু, জল ও মাটি দূষিত হয়; এই তিনটি থেকেই খাবার জন্মায়, সুতরাং খাবারে বিষ এসে যায়।

3.6 খাবার থেকে পাওয়া (খাদ্যবাহিত) রোগ

3.5.1 খাদ্যবাহিত জীবাণু বা ভাইরাস দ্বারা অনেক রোগ

বিষক্রিয়া শরীরের পক্ষে সব রকমের বিপদই ডেকে আনতে পারে। শারীরিক বা মানসিক (মানসিক রোগও সাধারণতঃ শারীরিক কারণে হয়ে থাকে) যে কোন রোগই বিষক্রিয়াতে হয় অথবা উল্টোভাবে কোন রোগই কোন কারণে এলে একে বিষক্রিয়া বলা হয়। রক্ত, চোখ, চামড়া, লিভার, কিডনী-হার্ট বা মস্তিষ্ক, বায়োকেমিক্যাল বা জৈব বিপত্তি, কর্মক্ষমতা (ফাংসনালিটি) কম—কোন ক্ষেত্রে বেশি যেমন হাইপার-এ্যাকটিভিটি, জিনঘটিত অসুখ ও পরিবর্তন, শরীরের বৃদ্ধি, প্রজনন ক্ষমতা ও বাচ্চাকে খাওয়ানো ইত্যাদির অনিষ্ট হতে পারে বিষক্রিয়াতে।

খাদ্য (বা জল) বাহিত বিষক্রিয়া জনিত রোগ হয় বিশেষ করে জীবাণু ও ভাইরাসের জন্য। কলেরা হয় ভিব্রিও জাতীয় জীবাণুর জন্য; আন্ত্রিক রোগ হয় এ্যামিবা, অন্যান্য প্রোটোজোয়া ও শিগেলার জন্য, জ্বর জাতীয় অসুখ টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড ওর ওদের জীবাণুর জন্য; ভাইরাস বা কোন বিশেষ জীবাণুর জন্য হেপাটাইটিস বা জন্ডিস। এছাড়া রাসায়নিক বিষক্রিয়া হয় জলবাহিত আর্সেনিক ও ফ্লুরিনের জন্য। এগুলো নির্দিষ্ট সহ্যমাত্রা থেকে বেশী হলে সে জল বর্জ্জনীয়—শোধন করে মাত্রা কমিয়ে ব্যবহার করতে হয়।

খাদ্যে বিটা বা গামা বিকিরণ দেয় এ রকম অবস্থা থাকলে, যেমন রেডিওএ্যাকটিভিটি বা রেডিওনিউক্লাইড থাকলে, কঠিন অসুখ হতে পারে। কোষ নষ্ট হতে পারে বা জিন সম্বন্ধীয় বিপর্যয় হতে পারে যাকে বলা যায় 'র‍্যাডিয়েশন ডেমেজ'।

খাদ্যবাহিত জীবাণু নানারকমের এবং এরা নানারকম অসুস্থতারও জন্ম দেয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা খাদ্য জীবাণুবিদ্যা অংশে করা হয়েছে।

3.9 সারাংশ

খাবারের ত খুব দরকার, বিশেষ করে লোকসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। কাঁচা খাবারে বিশেষতঃ উদ্ভিদ

খাবারে প্রাকৃতিকভাবেই বিষকারী দ্রব্য থাকে। যেখানে কম থাকে যা শরীর সহ্য করতে পারবে সেই খাবারই খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া কাঁচা খাবার তৈরী বা চাষ করা থেকে আরম্ভ করে পথ্য বানানো পর্যন্ত অনেক প্রক্রিয়া করা হয়। সংগ্রহোত্তর প্রক্রিয়া (পোস্ট-হারভেস্ট প্রক্রিয়া), গুদামজাত করা (স্টোরেজ), খাদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং বা খাদ্য প্রযুক্তি, প্যাকিং, স্টোরেজ ও বিতরণ এবং সবশেষে ভোক্তাদের রান্নাঘরের প্রক্রিয়া ইত্যাদি করার জন্য প্রযুক্তিগত বা রাসায়নিক ব্যবহারজনিত নানারকমের বিষকারী দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। এইগুলি সাবধানতা বা উল্টো প্রযুক্তি দ্বারা কমিয়ে সহ্যসীমার মধ্যে আনতে পারলেই সেই খাদ্য গ্রহণ করা হবে, নতুবা বর্জন। সেই বিষগুলোক জানার চেষ্টা হয়। যতখানি থাকল সেই পরিমাণ ঐ রাসায়নিকের এ ডিআই-এর মধ্যে থাকতেই হবে। তখন গ্রহণ করা যেতে পারে সেইটুকু বিষের ভার। এতে শরীরের অনিষ্ট হয় না, শরীর সহ্য করে যায়। বলাবাহুল্য অন্যদিকে, এগুলো কমাবার চেষ্টা অবশ্য করা হয়।

3.10 অনুশীলনী

(১) রান্না প্রক্রিয়া থেকে কি কি বিষক্রিয়া হতে পারে?

(২) চাষের জমিতে কীটনাশক এবং ম্যালেরিয়া নিরোধে কীটনাশক ব্যবহার করাতে কাঁচা খাবার ও পথ্য (টেবিল খাবার)-এ কি বিপত্তি হতে পারে?

(৩) খাদ্যবাহিত ও জলবাহিত রোগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখুন

(৪) এল ডি-৫০ এই টেস্টটা কি?

(৫) খেশারী ডালে স্বাভাবিকভাবে যে টক্সিন থাকে তার নাম, তজ্জনিত অসুখের নাম ও কোন প্রক্রিয়ায় একে কমানো যায় কিনা বলুন।

(৬) এ ডি আই কি এবং এর ব্যবহার কি? পরিমাণ-এর নীচে থাকলে কোন বিষও খাওয়া যেতে পারে—এই কথার সত্যতা আছে কি?

3.11 গ্রন্থপঞ্জী

1. Cliver, D. O. : Foodborne Diseases, 1990, Academic Press, Inc., New York.
2. Ariens, E. J., Simonis, A. M. and Offermeier, J. : Introduction to General Toxicology, 1979, Academic Press, New York.
3. Ayres, J. C. and Kirschman, J. C. : Impact of Toxicology on Food Processing, 1981, Avi Publishing Co., Westprot, Conn.
4. Taylor, S.L. and Seanlan, Ra A. : Food Toxicology–A Perspective on the Relative Risks, 1989, Marcel Deker, Inc., New York.
5. Stanley, E. M. : Toxicological Chemistry, 1989, Lewis Publishers, Inc., Chelsea, Mich.

একক 4 □ খাদ্যের মান ও প্রবিধান (রেগুলেশন)

গঠন ঃ

4.0 উদ্দেশ্য

4.1 প্রস্তাবনা

4.2 মান মানদন্ড (স্ট্যান্ডার্ড)

4.3 মান সংরক্ষণ (কোয়ালিটি কন্ট্রোল)

4.3.1 মান সংরক্ষণের প্রক্রিয়া

4.3.2 প্রক্রিয়ার মধ্যে মান সংরক্ষণ (ইন-প্রসেস কোয়ালিটি কন্ট্রোল)

4.3.2.1 স্ট্যাটিস্টিক্যাল কোয়ালিটি কন্ট্রোল (এস কিউ সি)

4.3.2.2 বিপজ্জনক অবস্থার বিশ্লেষণ ও সংকটমাত্রা (এইচ এ সি সি পি)

4.3.2.3 আই এস ও ৯০০০

4.4 প্রবিধান (রেগুলেশন)

4.4.1 অপমিশ্রণ নিরোধ আইন

4.4.1.1 আগর্মার্ক

4.4.1.2 ফ্রুট প্রডাক্ট অর্ডার (এফ পি ও)

4.4.1.3 মিট প্রডাক্টস্ অর্ডার

4.4.1.4 ভেজিটেবল অয়েল প্রডাক্টস্ (রেগুলেশন) অর্ডার (ভি ও পি ও)

4.4.1.5 সলভেন্ট এক্সট্রাকটেড অয়েলস, ডিঅয়েল মিল এন্ড এডিবল ফ্লাওয়ার (কন্ট্রোল) অর্ডার, এডিবল অয়েলস প্যাকেজিং (রেগুলেশন) অর্ডার এবং পালসেস, খাবারর তৈলবীজ ও এডিবল অয়েলস্ (স্টোরেজ, কন্ট্রোল) অর্ডার

4.4.1.6 কফি এ্যাক্ট ও টি এ্যাক্ট

4.4.1.7 ব্যুরো অব্ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড

4.4.1.8 উপভোক্তা সংরক্ষণ আইন (কনজিউমার প্রোটেকশন এ্যাক্ট)

4.4.1.9 স্ট্যান্ডার্ড ওজন ও মাপের (প্যাক করা দ্রব্য) রুলস

4.5 ভেজাল খাবারে বিপদ

4.5.1 খাদ্যের নিরাপত্তা

4.6 সারাংশে

4.7 অনুশীলনী

4.8 গ্রন্থপঞ্জী

4.0 উদ্দেশ্য

খাদ্যের মান কী হবে এবং এর মধ্যে খাদ্যের বৈশিষ্ট্য ও নিরাপত্তা থাকবে এটা সাধারণতঃ ঠিক করা হয়ে থাকে। উপভোক্তা কী চায় খাদ্য থেকে তা জানা যায়। সেই অনুযায়ী খাদ্যের প্রাসঙ্গিক গুণগুলি সাধারণতঃ প্রয়োগশালায় নির্ণয় করে মানের বিচার করা হয়। মান বিচার করে খাদ্য নিরাপদ কিনা, খাদ্য আইনানুগ কিনা এবং দরকার মত কেনাবেচার চুক্তি অনুযায়ী হল কিনা এই সমস্ত জানা যায়।

মান সংরক্ষণ (কোয়ালিটি কন্ট্রোল), খাদ্যের গুণ ও নিরাপত্তার জন্য যে যে আইন আছে তাদেরও চালনার পন্থা এবং খাদ্য কেনাবেচার চুক্তি বিচারের জন্য খাদ্যের মান ঠিক করতে হবে যেহেতু আইনের ব্যাপার আছে, এর দরকার খুব বেশী যারা খাদ্য নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেন তাদের কাছে।

4.1 প্রস্তাবনা

খাদ্যের মান এবং প্রবিধান ঠিক করতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে খাদ্য কি রকম হবে অর্থাৎ উপভোক্তারা কি চায় খাদ্যে। বলা যেতে পারে খাবার হবে সত্যনিষ্ঠ পরিচয়ের স্বাদিষ্ট, পুষ্টিকর এবং নিরাপদ. এই দাবীগুলো পূরণ করার জন্য মান ঠিক করে দিতে হবে। খাদ্যের যে রাসায়নিক, পদার্থগত এবং জীববিজ্ঞানগত গুণাবলী আছে তাদের মধ্য থেকে যে যে গুণগুলি সাধারণতঃ প্রয়োগশালাতে নির্ণয় করলে প্রার্থিত দরকারগুলি পাওয়া যাবে, সেই গুণগুলি ঐ খাদ্যের ব্যাপারে এক-একটি নির্দেশ (স্পেসিফিকেশন)। এই রকম নির্দেশগুলি লিষ্ট করার পর লিস্টটি যদি দেশের মধ্যে গ্রাহ্য হয় তবে সেটা হবে মৌলিক নির্দেশ (স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন) এবং এটাই সহজভাবে বলা যায় 'মান'। যেমন, দুধ গরু বা মোষ থেকে পাবার পর যেন জলমিশ্রিত না হয়। দুধের চর্বির পরিমাণ এবং শুকনো পদার্থের পরিমাণ জল মেশালে কমে যাবে, সুতরাং এই দুটি নির্দেশ (স্পেসিফিকেশন) হিসেবে চলতে পারে।

খাদ্যের মান বস্তুনিষ্ঠ (অবজেক্টিভ) হবে এবং ল্যাবরেটরীতে পরিমাপযোগ্য হবে। ব্যক্তিগত (সাবজেক্টিভ) হলে চলবে না। যে কোন জিনিষের, পশুর ও (এমন কি মানুষেরও) সেবা কার্য্যের মান আছে। মান হচ্ছে এদের পরিচয় ও গুণগত বিচার করার উপায়। কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি না, থাকলে কত পরিমাণ এইসব জানতে হয়। কাপড়, কাগজ বা ক্যামিকেল কিনতে হলে, পশুপাখী কাজে লাগতে গেলে অথবা কোন কর্ম্মচারীকে কাজ করাতে গেলে ওদের প্রত্যেকের বিভিন্ন ব্যাপারে মান কত সেটা জানতে হবে।

4.2 মান ও মানদন্ড (ষ্ট্যান্ডার্ড)

খাবারের মধ্যে ধরা যাক তেলের মান ঠিক করতে গেলে প্রথমেই তেলের পরিচয় জানা দরকার। তারপর তেলটা খাঁটি এবং ভেজালবিহীন কিনা এবং নির্দিষ্ট খাঁটি তেল সরেশ কিনা বা কোন খারাপ গন্ধ আছে কিনা এই সমস্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে জানবার জন্য ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা দরকার। এই মান বা গুণগুলোর পরীক্ষার ফর্দ্দ করলেই এইটা হবে ঐ তেলের মানদন্ড বা ষ্ট্যান্ডার্ড।

4.3 মান সংরক্ষণ (কোয়ালিটি কন্ট্রোল)

মানদন্ড অনুযায়ী বিশ্লেষণ করেই খাদ্যের ব্যবহার; বিশেষ করে কেনাবেচা করতে হয়। বিশ্লেষণ কার্য্যপ্রণালী খুব দরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে। বিশ্লেষণ বিজ্ঞান রসায়নশাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান ও প্রাণবিজ্ঞান (বিশেষতঃ বীজাণু বিজ্ঞান) দ্বারা চালিত হয়। কোন মান বিশ্লেষণ করে জানা যায় কোন জিনিষ আছে কি না, ওর পরিমাণ কত এবং কি কি বীজাণু আছে ও ওদের সংখ্যা ইত্যাদি জানা যায়। দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় ঃ গরুর দুধের মানের মধ্যে আছে এর টোটাল সলিড 8.5% র কম হবে না, মাখন 3.5 এর কম নয় (মোষ, ছাগল ও ভেড়ার দুধ, মাখন তোলা দুধ, টোনড দুধ, দুধের গুঁড়ো এবং কনডেন্সড দুধ ইত্যাদির মান কিছুটা অন্য রকম); খাদ্য তেলের কয়েকটি ধর্ম বিশ্লেষণ নিয়ে তৈরী মানের মধ্যে আছে স্যাপনিফিকেশন ভ্যালু, আইয়োডিন ভ্যালু, এ্যাসিড ভ্যালু, বি আর ইত্যাদি এবং কোন কোন ভেজালের অনুপস্থিতি ইত্যাদি কিন্তু বিভিন্ন তেলে বিভিন্ন রকমের; মশলাতে অন্যান্য দরকার ছাড়াও স্বাদ-গন্ধ, ধূলোবালি, অনিষ্টকারী জিনিষ, বিষকারী ধাতু দেখতে হয়; জলে বীজাণু ও ধাতু দেখতে হয়।

4.3.1 অপমিশ্রণ নিরোধ আইন

খাদ্যের গুণ ও নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য আইন করা হয়েছে। এই আইনের নাম 'খাদ্যের অপমিশ্রণ নিরোধক আইন'। ইংরাজী নাম 'প্রিভেন্সন অব্ ফুড এ্যাডালটারেশন এ্যাক্ট'-এর দরকারী শব্দগুলোর আদ্যাক্ষর দিয়ে সংক্ষিপ্ত নাম পি এফ্ এ (পি এফ্ এ এ্যাক্ট এবং পি এফ্ এ রুলস্)।

প্রকৃত মানের খাদ্যের জোগান জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে অপরিহার্য্য। ব্যক্তি, সমাজ ও সরকার এই ব্যাপারে অবহিত হলেও এর পর্যালোচনা ও পুনরালোচনা সময়ে সময়ে দরকার।

খাদ্যের মান বা উপযুক্ততা কী রকম হবে? শরীরের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন বিবেচনা করেই এই মান নির্ধরণ করতে হবে। খাবার হবে পুষ্টিদায়ক (রুচিগ্রাহ্য ও সুখকর ত বটেই) ও নিরাপদ। পুষ্টি সবাই জানেন, খাদ্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবনায় প্রথম পদক্ষেপই পুষ্টি—'ফুড ভ্যালু' কিন্তু এই নিরাপত্তাটি কি? আগেত পিওর ফুড চাওয়া হত। কিন্তু খাদ্যের উৎকর্ষের দরকারেই নানা রাসায়নিক ব্যবহার করতে হয়, নানা রাসায়নিক কৃষিকাজ, পশুপক্ষী পালন এবং পরিবেশ থেকে আসতে বাধ্য। এর জন্যে খাবার নষ্ট করে ফেলা যায় না। আবার এর জন্যে খাদ্যকে পিওরও বলা যায় না। তাছাড়া, পিওর খাবারেও অনেক সময় ছোটখাট বিপদ থাকতে পারে। সুতরাং খাদ্যে বাইরে থেকে আসা এবং স্বাভাবিকভাবে থাকা রাসায়নিককে সহ্য করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত এরা কোন বিপদ না ঘটাতে পারে, খানিকটা পরিমাণ এই ধরনের রাসায়নিক আমাদের শরীর সাধারণভাবে সহ্য করতে পারে। সুতরাং আমরা বলি খাদ্য নিরাপদ হতে হবে। এই নিরাপত্তার বন্দোবস্ত মান নির্ধারণের দ্বারা করতে হবে।

ন্যূনতমভাবে এই দুইটি মানক প্রয়োজন ছাড়া তৃতীয় প্রয়োজন হয় ক্রেতার ইচ্ছা পূরক সাধারণভাবে এই তিন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্যই খাবারের মান ঠিক করা হয়েছে। যে যে অবস্থার খাদ্যে এই প্রয়োজনগুলো না মেটে সেই খাদ্যকে ভেজাল বলা হয়েছে। উপরোক্ত আইনে, যার নাম ভেজাল নিরোধ আইন। এই আইনে ভেজালের সংজ্ঞা ঠিক করা হয়েছে খুব বৃহৎ অর্থে—যেমন, যে ধরনের বস্তু বা মানের জিনিষ হওয়ার কথা তা না হলে; অন্য কোন ভিন্ন জিনিষ মেশালে, প্রক্রিয়াজনিত কারণে খাদ্যমান বা গুণ কমলে, অস্বাস্থ্যকর অবস্থায়

তৈরী বা রাখা হলে; নোংরা পচা পোকাধরা মরা বা অসুস্থ পশু থেকে প্রস্তুত অথবা অন্যভাবে মানুষের খাদ্যের অনুপযুক্ত হলে, স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক কিছু (উপযুক্ত পরিমাণে) থাকলে; অননুমোদিত রং বা অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ থাকলে বা অনুমোদিত বা ঠিক বস্তুতে অনুমোদিত পরিমাণে না থাকলে; খাদ্য নির্দিষ্ট মাপের মধ্যে না থাকলে এ সবই ভেজালের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া, লোকে যাতে ভুল বর্ণনা বা লেবেলের জন্য না ঠকে, অপবর্ণন (misbranding) নামে আরেকটি অকরণীয় বিষয়ের উল্লেখ আছে এই একই আইনে। অপবর্ণন কাকে বলে এবং কখন বহবে তারও বিবরণ আছে। তা ছাড়া, আরও কিছু কিছু কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য সম্বন্ধেও উল্লেখ আছে। এই অকরণীয় বিষয়গুলোযুক্ত খাদ্য বিক্রি করা বা বিক্রয়ের জন্য তৈরী করা, গুদামজাত করা, পরিবেশন করা অথবা আমদানী করা ইত্যাদি অপরাধের মধ্যে পড়বে। এই অপরাধের কি শাস্তি হবে তারও উল্লেখ আছে। সাধারণভাবে ৬ মাস ১ বছরের জেল এবং কমপক্ষে এক হাজার টাকা জরিমানা একই সঙ্গে হতে পারে। বিশেষ কারণে এর কিছু কম বা অনেক বেশীও হতে পারে, বা সামান্য ব্যতিক্রম হতে পারে পর্যাপ্ত কারণে।

খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য সঙ্গত কারণেই চেষ্টার অন্ত নাই। একই সঙ্গে মান ঠিক ঠিক করে রাখারও চেষ্টা দরকার। খাদ্যের মান ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারলে এইগুলো সহজেই রক্ষা করা যায়, যদি অসাবধানতা বা অসাধুতা এসে না পড়ে।

এছাড়াও আরও কয়েকটি আইন চালু আছে খাবারের গুণাগুণ বিচার করার জন্য। এইগুলো দ্বারা খাদ্যের মান, গুণাগুণ, উৎকর্ষ বা ভেজাল বোঝা যায়।

4.4 ভেজাল খাবারের বিপদ

খাদ্য বিশ্লেষণ একটি বিরাট কাজ, অনেক শিক্ষা ও প্র্যাকটিসের প্রয়োজন। বড় বড় ল্যাবরেটরী স্থাপন করতে হয় যাতে অনেক যন্ত্র, মেসিন ও এ্যাপারেটাস কিনতে হয়। ডাইরেক্টার থেকে আরম্ভ করে ল্যাবরেটরী এ্যাটেন্ডন্ট অবধি টেকনিক্যাল ষ্টাফ এবং অফিস এসবের বন্দোবস্ত করতে হয়। যদিও এর কোন বিকল্প নেই তবু বড় এবং বেশী কাজ হাতে নেবার আগে প্রাথমিক কিছু টেষ্ট করে বুঝে রীতিমত কাজে হাত দেওয়া যেতে পারে। এই প্রাথমিক কাজকে স্ক্রিনিং টেষ্টও বলা হয়। যেমন, ফুড ইনস্পেক্টরের হাতে বেশী কাজ অথবা খরচের কম টাকা থাকার জন্য বেশী নমুনা নিতে পারে না টেষ্ট করার জন্য; আবার যে নমুনাগুলো নিল তারও অনেকগুলো ভালই হয়ে গেল। এতে ওর চেষ্টার সমূহ ফল পাওয়া গেল না— পুরো পরিশ্রম সফল হল না বলা যায় (যদিও এটা সমাজের পক্ষে ভালই হল)। যদি সহজ ও অল্প সময়ের স্ক্রিনিং টেষ্টে কোনো খাবারের নমুনা সন্দেহজনক পাওয়া যায়, তবে এই ব্যাপারে ভালভাবে অগ্রসর হওয়া যায় এবং খাদ্য পরিদর্শককে অসঙ্গতির কথা বলে দেওয়া যেতেও পারে। নীচের কয়েকটা টেষ্ট খুব সহজ ও তাড়াতাড়ি হয় এবং গৃহিণী ও স্কুলে প্র্যাক্টিক্যাল করে এমন ছাত্ররাও করতে পারবে।

খাবারের নাম	ভেজাল	প্রক্রিয়া	বিশেষ কথা
১. দুগ্ধজাত দ্রব্য (ক) দুধ	জল	(ক) ল্যাকটোমিটার দুধে ডোবালে রিডিং ২৬-এর কম হবে না।	০-৪০ ডিগ্রীতে দাগ
		(খ) হেলান দেওয়া পালিশ দ্রব্য (যেমন কাঁচ) এতে এক ফোঁটা দুধ রাখলে সেটা ওখানেই থাকবে, পড়লে আস্তে আস্তে পড়বে দাগ রেখে। জলো দুধ ঝট করে পড়বে ও দাগ থাকবে না।	মাখন তোলা দুধ হলে বা দুধে কোন ঘন জিনিষ মেশালে এই টেষ্ট হবে না।
	স্টার্চ	দুই এক ফোঁটা আয়োডিন দ্রবণ যেমন টিংচার আয়োডিন দিলে দুধ গাঢ় নীল রং ধরবে।	
	মাখন তোলা	ল্যাকটোমিটার ২৬-এর বেশী দেখাবে যদিও ঘনও হতে পারে।	
(খ) ছানা, পনীর, খোয়া ও এদের দ্রব্য	স্টার্চ	একটু জিনিষ জলে গুলে গরম করে উপরোল্লিখিত আয়োডিন টেষ্ট করে গাঢ় নীল রং দেখা যাবে	
(গ) ঘি	বনস্পতি ও মার্জারিন	ঘিতে অল্প মিউরিটিক (বা হাইড্রো-ক্লোরিক) অ্যাসিড একটা টেষ্টটিউবে গরম করে, কয়েক দানা চিনি দিয়ে ২/৪ মিঃ দাঁড়ানোর পর দেখতে হবে। নীচের অ্যাসিডে খুব কড়া লাল রং দেখা যাবে	বনস্পতি ও মার্জারিন আইনতঃ মেশানো অল্প তিল তেলের মধ্যে থাকা সিসেমলিনের জন্য। কোন কোন রং মেশালেও এমন হতে পারে চিনি না মেশালে ও।
	ম্যাশ আলু, রাঙ্গা আলু বা অন্য কোন স্টার্চ	আগের মত আয়োডিন টেষ্ট করলে নীল রং পাওয়া যাবে	

[Contd.

খাবারের নাম	ভেজাল	প্রক্রিয়া	বিশেষ কথা
(ঘ) মাখন	বনস্পতি ও মার্জারিন	ঘিতে যেমন টেস্ট করা হয়েছে।	
	স্টার্চ জাতীয়	ঘিতে যেমন টেস্ট করা হয়েছে।	
(ঙ) তেল ও চর্বি	শেয়ালকাঁটা তেল	টেস্টটিউবে অল্প তেল ও নাইট্রিক এ্যাসিড দিয়ে বেশ ঝাঁকিয়ে রেখে দিতে হবে। লালবাদামী বা হলুদ রং এ্যাসিডে দেখা যাবে	স্যাংগুইনারিন বা এর ডাইহাইড্রা যৌগ থাকার জন্য। রং থাকলে বাধা হতে পারে বা অন্য রংও দেখাতে পারে।
	খনিজ তেল	২ মি.লি. তেলে ৫ গুণ পটাশ, এ্যালকোহল ও জলের মিশ্রণ দিয়ে, কনিক্যাল ফ্লাস্কে রেখে, জলের বাথে ১৫মিঃ গরম করে, ১০ মি.লি. জল মেশাতে হবে। অস্বচ্ছতা দেখালে খনিজ তেল আছে।	খনিজ তেল স্যাপনিফাইড হয় না এবং জলে মেশে না বলেই অস্বচ্ছতা।
	ক্যাস্টর তেল	(ক).পেট্রোলিয়াম ইথার তেলকে স্বচ্ছ দ্রব করে কিন্তু ক্যাস্টর তেলকে করে না, সুতরাং অস্বচ্ছতা দেখায়।	ক্যাস্টার তেল এ্যালকোহলে দ্রব্য কিন্তু অন্য তেল নয়।
		(খ) ১ মি.লি. তেল ও ১০ মি.লি. এ্যাসিড দেওয়া পেট্রোলিয়াম ইথার মিশিয়ে অল্প পরিমাণ এ্যামোনিয়াম মলিবটেড দিলে সাদা অস্বচ্ছতা হবে।	
২. মিষ্টিদ্রব্য			
(ক) চিনি	চক পাওডার	নমুনা জলে গুলে চক নীচে পড়বে	
(খ) পাউডার চিনি (খান্দসারী)	সোডা	গোলা নমুনায় এ্যাসিড দিলে বুদবুদ সৃষ্টি হবে।	
	চক পাওডার	উপরোক্ত টেস্ট এখানেও হবে।	
(গ) মধু	চিনির সিরাপ	সিরাপে জল থাকে বলে মধুতে ভেজানো সলতে জ্বলবে না। যদিও জলে পট্‌পট্‌ আওয়াজ হবে। খাঁটি মধুতে (অল্প জল থাকা সত্ত্বেও) এমনটি হবে না।	

[Contd.

খাবারের নাম	ভেজাল	প্রক্রিয়া	বিশেষ কথা
(ঘ) মিষ্টান্ন, আইসক্রীম ও পনীর	মেটানিল ইয়েলো	জলের দ্রবণে ঘন হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড দিলে লাল রং হবে।	মেটানিল ইয়েলো খাবারের একটি নিষিদ্ধ রং।
	স্যাকারিন	(ক) এর জন্য মিষ্টি স্বাদ অনেকক্ষণ জিভে লেগে থাকবে। (খ) জলের দ্রবণে অল্প এ্যাসিড দেওয়ার পর ১০ মি.লি. ইথারে ঝাঁকাতে হবে আলাদা করা ইথার দ্রবণ শুকিয়ে নিলে অবশিষ্ট মিষ্টি লাগবে জিভে।	
৩. ডাল	খেশারী	ডালের গুঁড়োয় ডাইলিউট হাইড্রো-ক্লোরিক এ্যাসিড দিয়ে ফুটন্ত জলে ১৫ মিঃ রাখলে লাল রং হবে।	কৃত্রিম রং বা মেটানিল ইয়োলো থাকলে গরম করার আগেই রং হবে।
বেসন	খেশারীর ডালের গুঁড়ো	ঐ	
৪. মশলা			
(ক) গোলমরিচ	পেঁপের বিচি	রেক্টিফাইড স্পিরিট দিলে এগুলো (এবং অপুষ্ট গোলমরিচ) ভেসে উঠবে।	
	খনিজ তেল (কোটিং)	আগে এর টেষ্ট বলা হয়েছে।	
(খ) সরষে	শেয়ালকাঁটা বীজ	(ক) দুটোর আকৃতিগত পার্থক্য খালি চোখে বা আতস কাঁচে ধরা যায়। (খ) ফিল্টার পেপারে ২/৩টা বীজ ক্রাস করে এক ফোঁটা পেট্রোলিয়াম ইথার দেওয়ার পর তথায় ফ্লুরোসেন্স দেখা যাবে।	স্যাংগুইনারিন ও ডাইহাই—ড্রোস্যাংগুইনারিনের জন্য।
(গ) গুঁড়োমশলা	ষ্টার্চ বা ষ্টার্চ আছে এমন কোন গুঁড়ো	আয়োডিন টেষ্ট (আগে বলা হয়েছে)	
	নুন	জলের দ্রবণ ফিল্টার করে সিলভার নাইট্রেট ও নাইট্রিক এ্যাসিড দিলে সাদা প্রেসিপিটেট্ পড়ে।	

[Contd.

খাবারের নাম	ভেজাল	প্রক্রিয়া	বিশেষ কথা
হলদি গুঁড়ো	রঙীন করাতের গুঁড়ো	কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড দিলে হলদি লাল হবে কিন্তু জল দিয়ে পাতলা করলে রং মিলিয়ে যাবে। মিলিয়ে যাবে না যদি মেটানিল ইয়েলো বা অন্য কোন রং থাকে।	করাতের গুঁড়ো মাইক্রোস্কোপেও ধরা যায়।
	চক বা সোপস্টোন গুঁড়ো	টেস্টটিউবে অল্প জলে কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড দিলে বুদবুদ বা ভুরভুরি হবে।	
	জলে দ্রবণীয় কৃত্রিম রং।	নীচে লঙ্কা গুঁড়োর টেষ্টের মতই।	
	তেলে দ্রবণীয় কৃত্রিম রং	ঐ	
লঙ্কা গুঁড়ো	সুরকি গুঁড়ো, নুন, ট্যাল্ক বা সোপষ্টোন	একটি গ্লাসে জল দিলে লঙ্কা থেকে রং যদি জলে আসে তবে কৃত্রিম রং আছে। নীচের পড়া গুঁড়োতে হাতে করকরে যদি লাগে তবে সুরকি, বালি থাকবে, আর সাদা নরম মোলায়েম হলে ট্যাল্ক বা সোপষ্টোন হবে।	
	জলে দ্রবণীয় কৃত্রিম রং	এক গ্লাস জলে ছড়িয়ে দিলে রং থাকলে রঙীন ট্রেল শুদ্ধ গুঁড়ো পড়তে থাকবে।	
	তেলে দ্রবণীয় কৃত্রিম রং	সলভেন্ট ইথার এর দ্রবণে হাইড্রো-ক্লোরিক এ্যাসিড দিলে নীচের জলীয় স্তরে লাল বা হলুদ রং হবে।	
হিং	সোপষ্টোন, মাটি বা খনিজ	জলে ঝাঁকানোর পর এগুলো নীচে পড়বে।	
জাফরান	ভুট্টার, মোচার পাঁপড়ি কৃত্রিং রং	খাঁটি জাফরান সহজে ভাঙবে না, কৃত্রিম নমুনা ভাঙবে। এ্যালকোহল দ্রবণে কনসেন্ট্রেটেড হাইড্রো ক্লোরিক এ্যাসিডে লাল জাতীয় রং হবে।	
৫. অন্যান্য খাবার নুন	সাদা পাথরের গুঁড়ো	জলে গুলে সাদা পাউডার নীচে পড়বে।	

[Contd.

খাবারের নাম	ভেজাল	প্রক্রিয়া	বিশেষ কথা
চা পাতা	করা হয়ে গেছে এমন চা ও ডালের তুষ রং করে	ব্লটিং বা ফিল্টার পেপারে ছড়ানো চা-এর জল ছিটালে রং ধরবে। ধুয়ে ফেল্লেও রং থেকে	
কফি	মেশিনের লৌহ চূর্ণ চিকোরী	ছোট ম্যাগনেট ঘোরালে লাফিয়ে এসে লেগে যাবে। জলের উপরে ছাড়লে চিকোরী শীঘ্রই ডুবতে থাকে এবং ক্যারামেলের জন্য রং-এর স্টীক দেখা যাবে।	
	তেঁতুল ও খেজুর বীজ	ব্লটিং বা ফিল্টার পেপারে ছড়িয়ে ১% সোডা দিয়ে ভিজিয়ে দিলে লাল লাল ছোপ হবে।	
৬. সুপারী ও পানমশলা	স্যাকারিন	খুব বেশী ও স্থায়ী মিষ্টত্ব।	
	মেশানো রং	জল দিলে রঙ্গীন হবে।	
খয়ের	চক	জলীয় দ্রবণে কনসেন্ট্রেটেড এ্যাসিড দিলে বুদবুদ হবে।	
রূপোর তবক	এ্যালুমিনিয়াম	(ক) আগুনে পোড়ালে রূপো কুঁকড়ে যাবে কিন্তু নিজস্ব চকচকে রং-এর গোলক হবে। এ্যালুমিনিয়াম অক্সিডাইজ হয়ে কালো হয়ে যাবে।	
		(খ) হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডে রূপো থেকে সাদা টারবিডিটি বা প্রেসিপিটেট্ হবে, অন্যটিতে নয়।	
		(গ) কয়েক ফোঁটা কনসেন্ট্রেটেড নাইট্রিক এ্যাসিড রূপোকে গলিয়ে দেবে, এ্যালুমিনিয়ামকে নয়।	
৭. ভিনিগার	মিনারেল এ্যাসিড	মেটানিল ইয়েলো ইন্ডিকেটার পেপার লাল হয় মিনারেল এ্যাসিডে।	

4.5.1 খাদ্যের নিরাপত্তা

খাদ্য কেমন হবে? পুষ্টিকর ত বটেই।

খাদ্য স্বাদিষ্ট হবে, আনন্দদায়কও। খাদ্য ত ওষুধের মত গেলা যাবে না।

খাদ্য কি অবিমিশ্র (পিওর) হবে? অতীতে খাদ্যের যত আইন হত ওদের পিওর ফুড এ্যাক্ট নামে চালানো হত। কিন্তু তৈরী করা খাবার বা প্রক্রিয়াকৃত খাবারত অবিমিশ্র হতে পারে না কিছু অন্য জিনিষ মেশানোর জন্য এই খাবারকে অবিমিশ্র বলা যায় না। যেমন, পানীয় জল অবিমিশ্র হতে পারে না, ডিস্টিল করা বা আয়ন এক্সচেঞ্জ রেপিন দ্বারা প্রক্রিয়াকৃত (ডি-আয়নাইজড) জল পান করা চলে না— কিছু গুলে থাকা খনিজ জলে থাকবেই, বেশী থাকবে না বা হার্ড হবে না। সুতরাং জল বা খাদ্য পিওর হবে না। হবে নিরাপদ।

প্রত্যেক খাদ্য আইনেই, বিশেষতঃ পি এফ এ আইনে খাদ্য যাতে নিরাপদ হয় অর্থাৎ স্বাস্থ্যের হানিকর না হয় তার বিস্তৃত প্রবিধান করা আছে। নিরাপত্তা বিপন্ন হলেই খাদ্যকে ভেজাল ধরা হবে।

খাদ্যে বিপদকারক বা বিষয়কারী দ্রব্য প্রকৃতি থেকে আসতে পারে, প্রক্রিয়া ও সংরক্ষণের সময় তৈরী হতে পারে, ইচ্ছে করে কোন দরকারে মেশানো যেতে পারে ; পরিবেশ ও পাত্র থেকে আসতে পারে এবং জীবাণু বা ওদের থেকে তৈরী মেটাবলাইট হতে পারে। এগুলো যদি হয় এবং নিরাপত্তা বিঘ্ন হয়, তবে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। বিষকারী দ্রব্যগুলোর এ্যাকসেপ্টেবল ডেইলি ইনটেক এবং তার থেকে খাবারের সর্বোচ্চ পরিমাণ জানা যায় বা বেশী খাবারে থাকতে পারবে না। জীবাণুও নিরাপদ পরিমাণের বেশী হবে না।

4.6. সারাংশ

খাদ্যের এক-একটা গুণ বা প্রপার্টি (পরিমাপযোগ্য এবং খাদ্যের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক হতে হবে) সাধারণতঃ ল্যাবরেটরীতে পরিমাপ করলে ঐ ঐ গুণের মান পাওয়া যাবে। ঐগুলো একত্র করলে পুরো মান বা স্পেসিফিকেশন তৈরী হল। এ দ্বারা খাদ্যের (বা যে কোন জিনিষের) পরিচিত এবং গুণ (ভাল না মন্দ, তাই বা কতখানি) জানা যায়। গ্রহণযোগ্য এবং ব্যবহারযোগ্য হলে একে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন বা সংক্ষেপে স্ট্যান্ডার্ড। এই স্ট্যান্ডার্ড আইনের বিচারের জন্য দরকারী, ভেজাল নিরোধ, ভালমন্দ বিচার, কেনাবেচা বা চুক্তিতেও স্ট্যান্ডার্ড দরকারী। দেশের প্রধান খাদ্য আইন গুণ ও নিরাপত্তা বিচারের জন্য দরকারী, এর সম্বন্ধে বলা হয়েছে। আরও কয়েকটি প্রচলিত আইনও বিবৃত করা হয়েছে। খাদ্য পুষ্টিকর (যা থেকে সব রকমের পুষ্টিদ্রব্য এবং দরকার মত ক্যালরী বা শক্তি পাওয়া যাবে) এবং নিরাপদ (স্বাস্থ্যের হানিকর হবে না কোনভাবেই) হবেই। এতে কোন রেহাই নেই।

4.7. অনুশীলনী

(১) খাদ্যের (বা যে কোন বস্তুর) মান কি? স্ট্যান্ডার্ড কি? ব্যক্তিনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ বিচার কি?

(২) ভেজাল নিরোধক আইনের রূপরেখা বলতে পারবেন?

(৩) ভেজাল ও অপব্যাখ্যা (মিসব্রান্ডিং) কি?

(৪) খাবারের নিরাপত্তা কি?

4.8 গ্রন্থপঞ্জী

1. Lamprecht, J.L. ISO 9000, Marcel Dekker, New York, 1992.
2. *Prevention of Food Adulteration Act & Rules*, Eastern Book Co. Kolkata, 2002,
3. *Compendium of Food Analysis*, Directorate General of Health Services, Government of India, New Delhi.
4. *Food Analysis*, Bureau of Indian Standards, New Delhi.
5. *Official & Tentative Methods*, Assn, Official Analytical Chemists, USA.

একক 5 □ খাদ্যে জীবাণুঘটিত বিষক্রিয়া (ফুড মাইক্রোবায়লজী)

গঠন

5.0 উদ্দেশ্য

5.1 প্রস্তাবনা

5.2 জীবাণুঘটিত বিষক্রিয়া

5.2.1 স্ট্যাফাইলোকক্কাসজনিত খাদ্যে বিষক্রিয়া

5.2.2 স্ট্রেপ্টোকক্কাসজনিত খাদ্যে বিষক্রিয়া

5.2.3 বটুলিসম্ অথবা বটুলিনাল খাদ্যে বিষক্রিয়া

5.2.4 ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফ্রিঞ্জেন্স খাদ্যে বিষক্রিয়া

5.2.5 ব্যাসিলাস সিরিয়াস খাদ্যে বিষক্রিয়া

5.2.6 ভিব্রিও প্যারাহেমোলাইটিকাস খাদ্যে বিষক্রিয়া

5.2.7 ইস্‌চেরিসিয়া কোলি খাদ্যে বিষক্রিয়া

5.2.8 ভিব্রিও প্যারাহেমোনলোইটিকাস খাদ্যে বিষক্রিয়া

5.2.9 সিজেল্লা ফ্লেক্সনেরি খাদ্যে বিষক্রিয়া

5.2.10 ইয়েরসিনিয়া এনটারোকোলাইটিকা খাদ্যে বিষক্রিয়া

5.2.11 কমপাইলোব্যাক্টর জেজুনি খাদ্যে বিষক্রিয়া

5.3 খাদ্যবাহিত বীজাণুঘটিত অসুস্থতা

5.3.1 স্ট্যাফাইলোকক্কাল গ্যাসট্রোএনটারিটিস

5.3.2 স্ট্রেপ্টোকক্কাস ফিকালিসজনিত অসুস্থতা

5.3.3 বটুলিসম্

5.3.4 ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফ্রিঞ্জেন্সজনিত অসুস্থতা

5.3.5 ব্যাসিলাস সিরিয়াসজনিত অসুস্থতা

5.3.6 সালমোনেল্লা টাইফিমিউরিয়ামজনিত খাদ্যের কারণে অসুস্থতা

5.3.7 ইস্‌চেরিসিয়া কোলিজনিত খাদ্যে কারণে অসুস্থতা

5.3.8 ভিব্রিওসিস

5.3.9 সিজেল্লোসিস

5.3.10 ইয়েরসিনিওসিস

5.3.11 কমপাইলোব্যাক্টেরিওসিস

5.4. মাইকোটক্সিন

5.5. আফলাটক্সিন

5.6. সারাংশ

5.7. অনুশীলনী

5.8. গ্রন্থপঞ্জী

5.2. জীবাণুঘটিত বিষক্রিয়া

খাদ্যে বিষক্রিয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রথমে আবিষ্কার এবং পর্যালোচনা করেন বিজ্ঞানী জে.ডেনিস ১৮৯৪ সালে। এর পরে বিজ্ঞানী বার্বার ১৯১৪ সালে আরও বিস্তৃতভাবে এই সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করেন। প্রধানতঃ ব্যাক্টেরিয়াজনিত বিষক্রিয়াই এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য। খাদ্যে বিষক্রিয়া এবং বিষক্রিয়াজনিত অসুস্থতা একে অপরের পরিপূরক। খাদ্যে বিষক্রিয়া বলতে সাধারণভাবে বোঝায় যে খাদ্যে উপস্থিত বিষ গ্রহণ করার ফলে জীবদেহে অসুস্থতার লক্ষণ।

5.3 খাদ্যবাহিত বীজাণুঘটিত অসুস্থতা

জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া) দ্বারা সৃষ্ট বিষাক্ত পদার্থযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করার ফলে রোগ সৃষ্টি হয় এবং অসুস্থতা দেখা যায়। সাধারণভাবে একেই খাদ্যজনিত অসুস্থতা বলে। এই অসুস্থতার ফলে মানবদেহে বিভিন্ন রকম লক্ষ পরিলক্ষিত হয়। পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর দ্বারা সৃষ্ট রোগ এবং রোগের কারণে অসুস্থতা ও তার লক্ষণ নীচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হ'ল।

5.3.1 ষ্ট্যাফাইলোকক্কাল গ্যাসট্রোএনটারিটিস

ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস অরাস নামক জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবেই এই গ্যাসট্রোএনটারিটিস রোগ হয়। এই রোগের লক্ষণগুলো সাধারণতঃ সংক্রামিত খাদ্যগ্রহণের 4 ঘণ্টার মধ্যেই ফুটে ওঠে এবং এর ফলে অসুস্থতা দেখা যায়। এই রোগের উপসর্গ বা লক্ষণগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য।

(i) বমি বমি ভাব ; (ii) বমি করা ; (iii) উদর সঙ্কোচন ; (iv) ডায়ারিয়া বা উদরাময় ; (v) মাথার যন্ত্রণা ; (vi) পেশীর সঙ্কোচন ; (vii) দুর্বল স্পন্দন।

এই রোগ এবং ফলস্বরূপ অসুস্থতা নিবারণের অন্যতম একটি হ'ল খাদ্যবস্তুকে 40 ডিগ্রী ফারেনহাইটের কম তাপমাত্রায় সংরক্ষিত করা অথবা 140 ডিগ্রী ফারেনহাইটের থেকে বেশী তাপমাত্রা প্রদান করে সংরক্ষিত করা।

5.3.2 ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস ফিকালিসজনিত অসুস্থতা

ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস ফিকালিসজনিত অসুস্থতাও এই পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে মানবদেহ আক্রান্ত হয়। এর ফলে যে সমস্ত উপসর্গ দেখা যায়, তা নীচে উল্লেখ করা হ'ল।

(i) বমি বমি ভাব ; (ii) বমি করা ; (iii) ডায়রিয়া বা উদরাময়।

5.3.3 বটুলিসম্

খাদ্যে ক্লস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে এই রোগ মানবদেহে পরিলক্ষিত হয়। এই রোগের ফলে মানবদেহে সংক্রামিত খাদ্য গ্রহণের 12 থেকে 72 ঘণ্টার মধ্যেই রোগের লক্ষণসমূহ ফুটে ওঠে এবং অসুস্থতা দেখা যায়। অসুস্থতাজনিত উপসর্গসমূহ নীচে উল্লেখ করা হ'ল।

(i) বমি বমি ভাব ; (ii) বমি করা ; (iii) মানসিক এবং শারীরিক ক্লান্তি ; (iv) মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করা ; (v) মাথার যন্ত্রণা ; (vi) ত্বকের শুষ্কতা, মুখ এবং গালের শুষ্কতা ; (vii) কোষ্ঠকাঠিন্য ; (viii) পেশীর অসাড়তা ; (ix) শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত হয়ে মৃত্যু ; (x) যুগ্ম দৃষ্টি।

এই রোগ নিবারণের অন্যতম একটি উপায় হ'ল সন্দেহজনক খাদ্যবস্তু, যা এই ব্যাকটেরিয়ারর দ্বারা আক্রান্ত তাকে 15 মিনিটের জন্য ফোটানো।

5.3.4 ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফ্রিঞ্জেন্সজনিত অসুস্থতা

এই ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে মানবদেহে অসুস্থতা প্রধানতঃ সংক্রামিত খাদ্য গ্রহণের 6 থেকে 24 ঘণ্টার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় 8 থেকে 12 ঘণ্টার মধ্যেও দেখা যায়। এই অসুস্থতার ফলে যে সমস্ত উপসর্গ দেখা যায় তা নীচে উল্লেখ করা হ'ল।

(i) উদরের যন্ত্রণা ; (ii) বমি বমি ভাব ; (iii) উদরাময় ; (iv) বমি করা ; (v) জ্বর হওয়া।

এই রোগ নিরাময়ের একটি উল্লেখযোগ্য উপায় হ'ল খাদ্যবস্তুকে ব্যবহার না করা পর্যন্ত খুব ভালোভাবে হিমায়িত অবস্থায় রাখা।

5.3.5 ব্যাসিলাস সিরিয়াসজনিত অসুস্থতা

এই ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে মানবদেহে অসুস্থতা প্রধানতঃ সংক্রামিত খাদ্য গ্রহণের 8 থেকে 16 ঘণ্টার মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 12 থেকে 13 ঘণ্টার মধ্যে উপসর্গগুলো ফুটে ওঠে। এই অসুস্থতাকে ও তার ফলে উপসর্গকে ডায়ারিয়াল উপসর্গ বলে। লক্ষণসমূহ নীচে উল্লেখ করা হ'ল:

(i) বমি বমি ভাব ; (ii) উদরের সঙ্কোচনজনিত যন্ত্রণা ; (iii) জলীয় মল।

এই সংক্রমণ প্রতিরোধের একটি সহজ উপায় হ'ল খাদ্যবস্তুকে ব্যবহার না করা পর্যন্ত যথেষ্ট ভালোভাবে সংরক্ষিত করা।

5.3.6 সালমোনেল্লা টাইফিমিউরিয়ামজনিত খাদ্যের কারণে অসুস্থতা

এই ধরনের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে অর্থাৎ সংক্রামিত খাদ্য গ্রহণের ফলে সালমোনেল্লোসিস নামের রোগ দেখা যায়। সাধারণতঃ এই জাতীয় খাদ্য গ্রহণের 24 ঘণ্টার মধ্যেই রোগের উপসর্গসমূহ দেখা যায়। উপসর্গসমূহ নীচে উল্লেখ করা হ'ল।

(i) অন্ত্রে সংক্রমণ এবং বমি বমি ভাব ; (ii) বমি করা ; (iii) উদরপীড়া ; (iv) ডায়ারিয়া ; (v) জলীয়, সবুজ, জঘন্য দুর্গন্ধযুক্ত মল ; (vi) অশক্ততা ; (vii) পেশীর দুর্বলতা ; (viii) মূর্ছা ভাব ; (ix) বিশ্রামহীনতা ; (x) পেশীসমূহের আকস্মিক সঙ্কোচন ; (xi) আচ্ছন্ন ভাব বা জড়তা ইত্যাদি।

এই লক্ষণগুলি সাধারণতঃ 2 থেকে 3 দিন পর্যন্ত থাকে। এর ফলে রোগীর 2 থেকে 6 দিনের মধ্যে মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটে। রোগ নিরাময়ের বিভিন্ন উপায়গুলি নিম্ন রূপ।

(i) সংক্রামিত খাদ্যকে 12 মিনিটের মধ্যে 140 ডিগ্রী ফারেনহাইট বা 66 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা প্রদান করা।

(ii) সংক্রমণ প্রশমন করার জন্য খাদ্যবস্তু প্রস্তুতিকালীন যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

(iii) সংক্রামিত খাদ্যে উপস্থিত সালমোনেল্লা স্পিসিসের ব্যাকটেরিয়াকে পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতির দ্বারা ধ্বংস করা।

5.3.7 ইস্‌চেরিসিয়া কোলিজনিত খাদ্যের কারণে অসুস্থতা

এই ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত খাদ্য গ্রহণের ফলে মানবদেহে গ্যাসট্রোএনটারিটিস নামক রোগ দেখা যায়। সাধারণতঃ সংক্রামিত খাদ্য গ্রহণের 8 থেকে 24 ঘণ্টার মধ্যে এনটারোটক্সিন (ST এবং LT) উৎপন্ন হয় এবং রোগের উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়।

এই রোগের প্রধান উপসর্গ হ'ল (i) ডায়ারিয়া ; (ii) বমি বমি ভাব ; (iii) জ্বর ; (iv) মাথাধরা ; (v) উদর সঙ্কোচন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

5.3.8 ভিব্রিওসিস

ভিব্রিওসিস রোগ দেখা যায় ভিব্রিও প্যারাহোমালাইটিকাস নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বার সংক্রামিত খাদ্য গ্রহণের ফলে। এটি একটি গ্যাসট্রোএনটারিটিস জাতীয় রোগ। সাধারণতঃ সংক্রামিত খাদ্য গ্রহণের 3 থেকে 76 ঘণ্টার মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এই ধরণের অসুস্থতা 1 থেকে 8 দিন পর্যন্ত থাকে। অসুস্থতা সংক্রান্ত উপসর্গসমূহ নীচে উল্লেখ করা হ'ল.

(i) ডায়ারিয়া ; (ii) উদর ও পেশীর সঙ্কোচন ; (iii) বমি বমি ভাব ; (iv) কাঁপুনি ভাব ; (v) দুর্বল ভাব ; (vi) মাথাধরা ; (vii) বমি করা ইত্যাদি।

5.3.9 সিজেল্লোসিস

সিজেল্লা ফ্লেক্সনেরি নামক জীবাণুর দ্বারা সংক্রামিত খাদ্য গ্রহণ করার ফলে এই রোগ দেখা যায়। এই রোগ সাধারণতঃ সংক্রামিত খাদ্য গ্রহণের 6 থেকে 12 ঘণ্টার মধ্যে দেখা যায়।

এই রোগের প্রধান উপসর্গগুলি হ'ল (i) ডায়ারিয়া ; (ii) বমি বমি ভাব ; (iii) বমি করা ; (iv) উদর সঙ্কোচন ইত্যাদি।

5.3.10 ইয়েরসিনিওসিস

এই রোগ হওয়ার মুখ্য কারণ হ'ল ইয়েরসিনিয়া এনটারোকোলাইটিকা নামক জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া) দ্বারা সংক্রামিত খাদ্য গ্রহণের ফলে। ইয়েরসিনিয়া এনটারোকোলাইটিকার বৃদ্ধি –2 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে শুরু করে 45 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইয়েরসিনিওসিস আসলে এক ধরনের গ্যাসট্রোএনটারিটিস জাতীয় রোগ। সাধারণতঃ সংক্রামিত খাদ্য গ্রহণের 24 ঘণ্টার পর থেকেই এই রোগের উপসর্গগুলি পরিলক্ষিত হয়। এই রোগের উপসর্গসমূহ নীচে উল্লেখ করা হ'ল।

(i) ফ্যারিনজাইটিস বা গলবিলপ্রদাহসমূহ উপসর্গ ; (ii) ডায়ারিয়া ; (iii) জ্বর জ্বর ভাব ; (iv) বমি করা ; (v) মাথা ধরা ; (vi) উদরপীড়া।

5.3.11 কমপাইলোব্যাক্টেরিওসিস

কমপাইলোব্যাকটর জেজুনি নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রামিত খাদ্য গ্রহণ করার ফলে এই রোগ পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত ঃ 24 ঘণ্টার মধ্যেই সংক্রামিত খাদ্যে এনটারোটক্সিন অর্থাৎ ক্লস্ট্রিডিয়াম জেজুনি টক্সিন (CJT) উৎপন্ন হয় এবং রোগের উপসর্গসমূহ ফুটে ওঠে।

উপসর্গগুলির মধ্যে (i) উদরপীড়া বা উদর সংকোচন ; (ii) ডায়ারিয়া ; (iii) মাথাধরা ; (iv) জ্বর জ্বর ভাব ; (v) অসুস্থতা বা অস্থিরতা ভাব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পাস্তুরাইজেশন নামক তাপমাত্রা প্রদান সংক্রান্ত পদ্ধতির দ্বারা খাদ্যবস্তুতে অবস্থিত এই ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এই রোগ নিরাময় করা যেতে পারে।

5.6 সারাংশ

সর্বশেষে সমস্ত বিষয়টি অধ্যায়ন করে আমরা খাদ্যে বিষক্রিয়া, বিষাক্ত পদার্থযুক্ত বা টক্সিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করার ফলে অসুস্থতা এবং অসুস্থতাজনিত উপসর্গসমূহ সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারি। এছাড়াও মোল্ড নামক ছত্রাকের প্রভাবে উৎপন্ন মাইকোটক্সিন এবং আফলাটক্সিন সম্বন্ধেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। সামগ্রিকভাবে

বিভিন্ন ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া এবং মোল্ড জাতীয় জীবাণু দ্বারা খাদ্যবস্তু সংক্রমণ সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারি।

5.7. অনুশীলনী

১. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

(i) ষ্ট্যাফাইলোকক্কাল গ্যাসট্রোএনটারিটিস রোগের জন্য দায়ী—— নামক —— —— ——।

(ii) ক্লস্টিডিয়াম বটুলিনাম নামক —— —— ——আকারের ব্যাকটেরিয়া নামক রোগের জন্য দায়ী।

(iii) ব্যাসিলাস সিরিয়াস একটি —————— উৎপাদক।

(iv) সালমোনেল্লা টাইফিমিউরিয়াম নামক —— —— —— আকারের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগের নাম ——।

(v) সিজেল্লা ফ্লেক্সনেরি একটি ——উৎপাদক এবং ——রোগের জন্য দায়ী।

(vi) ভিব্রিওসিস রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়াটি একটি —— ——আকারের ব্যাকটেরিয়া।

(vii) ইয়েরসিনিওসিস রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়ার নাম —— ——।

২. একাধিক H_2 উত্তরের মধ্যে সঠিকটি বাছুন ঃ

(i) ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস অরাস একটি—

(a) এক্সোটক্সিন ; (b) এনটারোটিক্সিন ; (c) এণ্ডোটক্সিন ; (d) মাইকোটক্সিন উৎপাদক।

(ii) ইস্‌চেরিসিয়া কোলি দ্বারা সৃষ্ট টক্সিনের নাম —

(a) ST ; (b) HT ; (c) B_1 ; (d) M_2

(iii) কমপাইলোব্যাকটর জেজুনি দ্বারা সৃষ্ট টক্সিনের নাম —

(a) ST ; (b) LT ; (c) আফলাটক্সিন ; (d) CJT

(iv) অ্যাসপারজিলাস ফ্লেভাস একটি টক্সিন উৎপাদক। এর নাম —

(a) মাইকোটক্সিন ; (b) নিউরোটক্সিন ; (c) আফলাটক্সিন ; (d) সিজাটক্সিন।

(v) দুধে আফলাটক্সিনের সর্বোচ্চ পরিমাণ —

(a) 1 ppb ; (b) 2.6 ppb ; (c) 0.5ppb ; (d) 1.7ppb

(vi) ব্যাসিলাস সিরিয়াস একটি —

(a) গ্রাম পজিটিভ কক্কাস জাতীয় ব্যাকটেরিয়া ; (b) গ্রাম নেগেটিভ রড জাতীয় ব্যাকটেরিয়া ; (c) গ্রাম পজিটিভ রড জাতীয় ব্যাকটেরিয়া।

(vii) কোষ্ঠকাঠিন্য উপসর্গের জন্য দায়ী বীজাণুর নাম —

(a) ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস ফিকালিস ; (b) ইস্‌চেরিসিয়া কোলি ; (c) ক্লস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম ; (d) সিজেল্লা ফ্লেক্সনেরি।

5.8 গ্রন্থপঞ্জী

1. Frozier, W.C. : *Food Microbiology.*
2. Jay, J.H. : *Modern Microbiology.*
3. Prescott & Dunn : *Industrial Microbiology.*
4. Banwart, G.T. : *Basic Food Microbiology.*
5. Pelezar, H.J. and Robert : D. : *Microbiology.*
6. Underkoffler and Hickey : *Industrial Fermentation.*

একক 6 □ বীজাণুঘটিত পচন (পিউট্রিফেকশন) ও ফার্মেন্টেশন

গঠন

6.0 উদ্দেশ্য

6.1 প্রস্তাবনা

6.2 খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের পচন

6.2.1 শস্য এবং শস্যজাত দ্রব্যের পচন

6.2.1.1 কেক এবং অন্যান্য বেক্‌ড পদার্থের পচন

6.2.1.2 ম্যাকারোনির পচন

6.2.2 চিনি এবং চিনিজাত দ্রব্যের পচন

6.2.2.1 চিনির পচন

6.2.2.2 ঝোলাগুড় এবং সিরাপের পচন

6.2.2.3 মধুর পচন

6.2.3 শাকসব্জী এবং ফলের পচন

6.2.4 দুধ এবং দুধজাত দ্রব্যের পচন

6.2.5 মাংসদ্রব্যের পচন

6.2.5.1 বায়বীয় বা অক্সিজেনের উপস্থিতির পচন

6.2.5.2 বায়ু বা অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে পচন

6.2.6 মাংসজাত দ্রব্যের পচন

6.2.7 মাছ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক খাদ্যের পচন

6.2.8 ডিম এবং পোল্ট্রীর পচন

6.2.8.1 ডিমের পচন

6.2.8.2 পোল্ট্রীর পচন

6.2.9 ক্যান বা টিনের পাত্রে সংরক্ষিত খাদ্যের পচন

6.3. খাদ্যের সন্ধান (ফুড ফার্মেন্টেশন)

6.3.1 খাদ্য জীবাণুবিদ্যায় জীবাণুসমূহের উপকারী ভূমিকা

6.3.2 সন্ধানজাত খাদ্য শিল্প

6.3.3 রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতিতে সন্ধান

6.3.4 এনজাইম বা উৎসেচক প্রস্তুতি

6.3.5 ঈষ্টের ভূমিকা
6.3.6 মোল্ডের ভূমিকা
6.3.6.1 জৈব অ্যাসিড প্রস্তুতি
6.3.6.2 সন্ধানজাত খাদ্য প্রস্তুতি
6.3.7 অ্যাক্টিনোমাইসেটিসের ভূমিকা
6.4. সারাংশ
6.5. অনুশীলনী
6.6. গ্রন্থপঞ্জী

6.0 উদ্দেশ্য

ফার্মেন্টেশন বা সন্ধান প্রক্রিয়া একটি জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন বা ঘটনা। জীবাণুর উপস্থিতিতে জীবাণু দ্বারা সংশ্লেষিত এনজাইম বা উৎসেচকের সহায়তায় অনুকূল পরিবেশ তথা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের আনুকূল্যে (যথা বাহ্যিক পরিবেশ সহায়ক সূচক– তাপমাত্রা, চাপ, ঘূর্ণন মাত্রা, আন্দোলন মাত্রা ইত্যাদি এবং আভ্যন্তরীণ পরিবেশ সহায়ক সূচক –pH অর্থাৎ অম্লভিত্তিক বা ক্ষারকীয় মাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেনের ঘনত্ব, বহির্গত কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ, ইত্যাদি) একটি জটিল যৌগিক পদার্থের অপেক্ষাকৃত সরল পদার্থে রূপান্তরকে সাধারণভাবে সন্ধান প্রক্রিয়া বলে। যেহেতু এই প্রক্রিয়াটিতে জীবাণু এবং উৎসেচকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ সেইজন্য এই পরিবর্তনকে জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন বলে।

6.2 খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের পচন

6.2.1 শস্য এবং শস্যজাত দ্রব্যের পচন

(১) ময়দার পচন ঃ অল্প মাত্রায় ময়দা ভিজে গেলে পচন শুরু হয়। শতকরা ১৫ ভাগ আর্দ্র অবস্থার মোল্ডের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। যদি আর্দ্র ভাব ১৭ ভাগের বেশী হয়, তবে মোল্ড এবং ব্যাক্টেরিয়া উভয়েরই বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

(২) পাঁউরুটির পচন ঃ মোল্ড হচ্ছে পাঁউরুটির পচনে সব থেকে গুরুত্ব জীবাণু। পাঁউরুটিতে মোল্ড দ্বারা পচনক্রিয়ার নাম হচ্ছে মোল্ডিনেস। মিউকর বিভিন্ন ধরনের মোল্ড এই পচনক্রিয়ার জন্য উল্লেখ্যযোগ্য।

ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা পাঁউরুটির পচনক্রিয়াকে রোপিনেস বলে। রোপিনেসে প্রধানত ঃ হয় পেকটিনেজ নামক এনজাইম বা উৎসেচকের সহায়তায় ময়দার প্রোটেনের আর্দ্রবিশ্লেষণের প্রভাবে। এছাড়াও অ্যামাইলেজ নামক এনজাইম বা উৎসেচকের প্রভাবে স্টার্চের চিনিতে রূপান্তরিত হওয়া রোপ তৈরী হওয়ার অন্যতম একটিকারণ। সোডিয়াম বা ক্যালসিয়াম প্রোপিয়োনেট বা সরবিক অ্যাসিড জাতীয় সংরক্ষক নির্দিষ্ট মাত্রায় ব্যবহার করে পাঁউরুটির পচন রোধ করা যেতে পারে।

6.2.1.1 কেক এবং অন্যান্য বেক্‌ড পদার্থের পচন

এই সকল পচনের ক্ষেত্রেও মোল্ড নামক জীবাণু উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এইসব পদার্থের পচনরোধ করতে সোডিয়াম বা ক্যালসিয়াম প্রোপিয়োনেট বা সরবিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়।

6.2.1.2 ম্যাকারেনির পচন

ম্যাকারোনির পচন সাধারণভাবে বোঝা যায় ম্যাকারোনির বেশী ফুলে ওঠার কারণে। এই ফুলে ওঠার মুখ্য কারণ হচ্ছে গ্যাস উৎপাদন এবং গ্যাস উৎপাদনের কারণ হচ্ছে একরকম ব্যাক্‌টেরিয়ার সংক্রমণে পচনের জন্য অন্যতম আর একটি মোল্ড জাতীয় জীবাণু।

6.2.2 চিনি এবং চিনিজাত দ্রব্যের পচন

6.2.2.1 চিনির পচন

চিনির পচন প্রধানতঃ গাম বা আঠা এবং পিচ্ছিল ভাব দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিছু ব্যাক্‌টেরিয়া এই ধরনের পচনের জন্য দায়ী।

এছাড়াও কিছু ঈস্টের প্রজাতি এই জাতীয় পচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

6.2.2.2 ঝোলাগুড় এবং সিরাপের পচন

কম তাপমাত্রায় জীবাণু সংক্রমণের ফলে গ্যাস উৎপাদন হয় এবং এক্ষেত্রে কিছু ঈস্ট এবং ব্যাক্‌টেরিয়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

6.2.2.3 মধুর পচন

মধুতে চিনির পরিমাণ অত্যন্ত বেশী (70–80%) । ইহার অম্লত্ব (pH–3.2–4.2) এই পদার্থের পচনের মূল কারণ কিছু ঈস্টের উপস্থিতি। সম্থানজনিত পচনে প্রধানতঃ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস, ইথাইল অ্যালকোহল এবং কিছু অনুদ্বায়ী অম্ল উৎপন্ন হয়, যার ফলে মধুতে খারাপ গন্ধ পাওয়া যায়।

6.2.3 শাকসব্জী এবং ফলের পচন

(1) ব্যাক্‌টেরিয়াজনিত নরম পচন (Bacterial Soft Rot) : শাকসব্জী এবং ফলে ব্যাক্‌টেরিয়াজনিত পচনে দায়ী ব্যাক্‌টেরিয়াগুলি হোল আরউইনিয়া ক্যারোটোভোরা (Erwinia carotovora) এবং সিউডোমোনাস মারজিনালিস (Pseudomonas marginalis) । প্রধানতঃ পেকটিনজাতীয় শর্করার সম্থান প্রক্রিয়ার ফলে এই পচন ঘটে। এর ফলে শাকসব্জী এবং ফলের স্যাঁতশেঁতে ভাব এবং দুর্গন্ধি লক্ষ্য করা যায়।

(2) ধূসর মোল্ডজনিত পচন (Gray Mold Rot : শাকসব্জী এবং ফলে মোল্ডজনিত পচনে মূলতঃ দায়ী বটরাইটিস সিনেরা (Botrytis cinera) নামের এক জাতীয় মোল্ড। এই মোল্ডের ধূসর রঙের মাইসেলিয়াম (কোষের সমষ্টি) দেখা যায়। এই মোল্ডের বৃদ্ধি অধিক আর্দ্রতা এবং উষ্ণ তাপমাত্রায় পরিলিক্ষিত হয়।

(3) রাইজোপাসজনিত নরম পচন (Rhizopus Soft Rot) : এই পচনের জন্য প্রধানতঃ রাইজোপাস প্রজাতির বিভিন্ন জীবাণু এই পচনের ফলে ফল এবং শাকসব্জীর নরম ও মন্ডজাতীয় অবস্থা তৈরী হয়। সমস্ত ফল এবং শাকসব্জীতে এই মোল্ডের পেঁজাতুলোর মতো বৃদ্ধি হয় তৎসহ ছোট এবং কালো ছোপ দেখা যায়।

(4) আম্লিক পচন (Sour Rot) : প্রধানতঃ বিভিন্ন ধরনের শাকসব্জী যেমন-- পেঁয়াজ, রসুন, টম্যাটো, মিষ্টিকুমড়ো, গাজর, লেটুস, শসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই পচন দেখা যায়।

(5) নীল মোল্ডের পচন (Blue Mold Rot) : কিছু ছত্রাকের বৃদ্ধিতে ফল এবং শাকসব্জীতে এই জাতীয় পচন দেখা যায়। এই জাতীয় ছত্রাকের অসংখ্য স্পোরের i(Spores) উপস্থিতির জন্য এই নীল রঙের সৃষ্টি হয়।

(6) কালো মোল্ডজনিত পচন (Black Mold Mot) : শাকসব্জী এবং ফলে এই ধরনের পচনের ফলে উৎপন্ন কালো রঙের জন্য দায়ী হোল ছত্রাকের অসংখ্য স্পোরের (Spores) উপস্থিত।

(7) গোলাপী মোল্ডজনিত পচন (Pink Mold Rot) : এই জাতীয় পচনে গুরুত্বপূর্ণ মোল্ডের নাম ট্রাইকোথেসিয়াম রোসিয়াম (Trichotheciun roseum) । স্পেসার সমষ্টির (Spores) উপস্থিতিই এই গোলাপী রঙের কারণ।

(8) সবুজ মোল্ডজনিত পচন (Green Mold Rot) : প্রধানতঃ ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম প্রজাতির (Cladosporium sp.) কিছু জীবাণু এবং অন্যান্য কিছু রঙের স্পোরবিশিষ্ট ছত্রাকের প্রজাতি যেমন ট্রাইকোডারমা (Trichoderma) এই জাতীয় পচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এছাড়াও পিচ্ছিল ভাব এবং টক হয়ে যাওয়ার জন্য কিছু স্যাপ্রোফাইটিক ব্যাক্টেরিয়ার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

6.2.4 দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের পচন

দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের পচন বা খারাপ হয়ে যাওয়াকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

(1) রোপিনেস (Ropiness)

(2) ক্ষার উৎপাদন (Alkali Production)

(3) গন্ধের পরিবর্তন (Change of Flavour)

(ক) টক বা অম্ল গন্ধ (Sour or Aciduc Flavour)

(খ) তেতো গন্ধ (Bitter Flavour) : দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যে প্রোটিন এবং ফ্যাট জাতীয় পদার্থের ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে এই জাতীয় গন্ধের সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও দুধে উপস্থিত কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থ ল্যাকটোজের ভেঙ্গে যাওয়াতেও এই ধরনের গন্ধ উৎপন্ন হয়।

(গ) পোড়া বা ক্যারামেলের গন্ধ (Burnt/Caramel Flavour)

(ঘ) শালগম জাতীয় গন্ধ (**Turnip-like Flavour**) : ইস্‌চেরিচিয়া কোলি (Escherichia coli) এবং সিউডোমোনাস ফ্লুরেসেন্স নামক ব্যাক্‌টেরিয়ার বৃদ্ধিজনিত কারণে দুধে এই ধরনের গন্ধের সৃষ্টি হয়।

(ঙ) যবজাতীয় গন্ধ (**Malty Flavour**)

(চ) আলুজাতীয় গন্ধ (**Potato-like Flavour**) :

(ছ) মাছ জাতীয় গন্ধ (**Fishy Flavour**)

(4) যেমন বর্ণ বা রঙের পরিবর্তন (**Change of Colour**)

(ক) নীল দুধ (**Blue Milk**)

(খ) হলুদ দুধ (**Yellow Milk**)

(গ) লাল দুধ (**Red Milk**)

(ঘ) বাদামী দুধ (**Brown Milk**)

6.2.5.1 বায়বীয় বা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পচন (Spoilage under Aerobic Condition) :

মাংসের বর্ণ বা রঙের পরিবর্তনও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মাংসের লাল রঙ পরিবর্তিত হয়ে মাঝে মাঝে সবুজ, ধুসর বা বাদামী রঙে পরিণত হয়। পারঅক্সাইড জাতীয় যৌগ এবং হাইড্রোজেন সালফাইড তৈরী হওয়ার ফলে এই পরিবর্তন হয়। ল্যাক্টোব্যাসিলাস প্রজাতি (Lactobacillus sp.) এবং লিউকোনস্টক প্রজাতির (Leuconostoc sp.) ব্যাক্‌টেরিয়ারা এই ঘটনার জন্য দায়ী।

মাংসের মধ্যে উপস্থিত ফ্যাট বা স্নেহজাতীয় পদার্থের জারণের ফলে দুর্গন্ধ বা পচন গন্ধের সৃষ্টি হয়। স্নেহজাতীয় পদার্থের এইরূপ ভেঙ্গে যাওয়া বা বিশ্লেষণকে লাইপোলিসিস (Lipolysis) বলে। লাইপোলিসিসের ফলে প্রধানত ঃ জৈব অ্যালডিহাইড এবং জৈব অ্যাসিড তৈরী হয় এবং এরাই দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে। দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী ব্যাক্‌টেরিয়াগুলির মধ্যে সিউডোমোনাস প্রজাতি (Pseudomonas sp.) এবং অ্যাক্রোমোব্যাক্‌টর (Achromobacter) প্রজাতির নাম উল্লেখযোগ্য।

মাংসের উপরিভাগের রঙ পরিবর্তনের জন্য কিছু রঞ্জিতে ব্যাক্‌টেরিয়ার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। লাল ছোট হয় প্রধানতঃ সেরাসিয়া মারসিসেন্স (Serratia marcescens) উপস্থিত থাকায় কারণে। মাংসের উপরি তলের নীল রঙের কারণ হচ্ছে সিউডোমোনাস সিনসিয়ানিয়া (Pseudomonas synceanea) নামক রঞ্জিত ব্যাক্‌টেরিয়ার সংক্রমণ= সংরক্ষিত গরুর মাংসের হলুদ রঙের জন্য দায়ী ব্যাক্‌টেরিয়ার প্রজাতিরা হোল মাইক্রোকক্কাস প্রজাতি (Micrococus sp.) এবং ফ্লেভোব্যাক্‌টেরিয়াম প্রজাতির (Flavobacterium sp.) ব্যাক্‌টেরিয়া। সংরক্ষিত গরুর মাংসের সবুজাভ নীল বা বাদামী ছোপের জন্য দায়ী ব্যাক্‌টেরিয়া হোল করিনিব্যাক্‌টেরয়াম লিভিডাম (Corynebacterium lividum)।

বায়ুর উপস্থিতিতে বিভিন্ন ইস্টের প্রভাবে ব্যাক্টেরিয়ার মতো একই ধরনের ঘটনা। যেমন (1) পিচ্ছিলতা, (2) লাইপোলিসিস, (3) দুর্গন্ধ উৎপাদন এবং (4) বর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

মোল্ড বা ছত্রাকের প্রভাবে মাংসের মধ্যে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি পরিলক্ষিত হয় ঃ

(ক) চটচটে ভাব (Stickiness) : মাংসের উপরিভাগের এই জীবাণুর সংক্রমণে চটচটে ভাব দেখা যায়।

(খ) কালো ছোপ (Black Spot) : এই বর্ণ পরিবর্তনের জন্য দায়ী হোল ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম হারবারাম (Cladosporium herbarum) নামক ছত্রাকের সংক্রমণ।

(গ) সাদা ছোপ (White Spot) : এই রঙ পরিবর্তনে সাহায্যকারী ছত্রাকগুলি হোল স্পোরোট্রিকাম কারনিস (Sporotrichum carnis) এবং জিওট্রিকাম প্রজাতি (Geotrichum sp.) ।

(ঘ) সবুজ ছোপ (Green Patches) : মাংসের এই রং পরিবর্তনে পেনিসিলিয়াম প্রজাতির (Penicillium sp) বিভিন্ন ছত্রাকজাতীয় জীবাণু যেমন- পেনিসিলিয়াম এক্সপানসাম (Penicilluim expansum), পেনিসিলিয়াম অ্যাসপারুলাম (Penicillim asperulum sp.), পেনিসিলিয়াম অক্সালিকাম (Penicillium oxalicum) গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে।

এছাড়াও স্নেহ জাতীয় পদার্থের ভাঙ্গনে এবং দুর্গন্ধি যেমন, ছাতা ধরা বা বাসী গন্ধ উৎপাদনে ও মাংসের খারাপ স্বাদের ক্ষেত্রেও মোল্ড বা ছত্রাকজাতীয় জীবাণু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

6.2.5.2 বায়ু বা অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে পচন (Spoilage under Anaerobic Condition) :

1. টক ভাব (Sourness) : ব্যাক্টেরিয়ারা এইসব অ্যাসিড উৎপন্ন করে ও যার ফলে টক ভাবের সৃষ্টি হয়।

2. পচন (Putrefaction): মাংসের এই ধরনের পচন প্রধানতঃ বায়ুর অনুপস্থিতিতে প্রোটিনের ভাঙ্গনে দুর্গন্ধযুক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস, ইনডোল (জৈব যৌগ), স্ক্যাটোল (জৈব যৌগ), অ্যামোনিয়া এবং অ্যামিনজাতীয় জৈব যৌগের উৎপাদনের মাধ্যমে হয়। ক্লসট্রিডিয়াম প্রজাতির *(Clostridium sp.)* ব্যাক্টেরিয়া এবং সিউডোমোনাস প্রজাতি *(Pseudomonas sp.)* ও অ্যাক্রোমোব্যাক্টর প্রজাতির *(Achromobacter sp.)* ব্যাক্টেরিয়া এই জাতীয় পচনের জন্য দায়ী।

6.2.6 মাংসজাত দ্রব্যের পচন ঃ

(1) **হ্যামবার্গার (Hamburger) :** এই মাংসজাত দ্রব্যের পচন কম তাপমাত্রায় টক ভাবের উৎপত্তি দ্বারা নির্দেশিত হয়।

(2) **বেকন (Bacon) :** বেকন একটি মাংসজাত দ্রব্য এবং এর পচনের জন্য প্রধানতঃ মোল্ডজাতীয় জীবাণুই দায়ী।

(3) **গরুর উরু বা রাং (Beef Hams) :** গরুর উরু বা রাং-এর পচনকে যথাক্রমে স্পঞ্জজাতীয় আকার,

টক ভাব, রঙের পরিবর্তন ইত্যাদি বিভিন্নভাবে নির্দেশিত করা যায়। বায়ুর অনুপস্থিতিতে সন্ধান প্রক্রিয়ায় জারের ভিতরে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় ও মাংস দ্রব্যের পচন শুরু হয়।

(4) **বোলগনা, ফ্রাঙ্কফুর্টার এবং শূয়োরের মাংসের সসেজের পচন (Spoilage of Bologna, Frankfurters and Pork Sausage) :** বোলগনা হচ্ছে এক ধরনের সন্ধান প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন মাংসজাত দ্রব্য। জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের প্রক্রিয়াকরণের ফলে সৃষ্ট জন্য এই মাংসের নাম ফ্রাঙ্কফুর্টার। শূয়োরের মাংস নানারকম প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তৈরী করে শূয়োরেরই অন্ত্রে (নলিকায়) ঢুকিয়ে দিয়ে বেলুনের মতো করে এঁটে দেওয়া হয়। এইভাবে শূয়োরের মাংসের সসেজ তৈরী করা হয়। এইসব মাংসজাত দ্রব্যগুলির পচনকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন— (ক) পিচ্ছিলতা, (খ) টকে যাওয়া এবং (গ) সবুজ হয়ে যাওয়া।

(ক) **পিচ্ছিলতা (Sliminess) :** এই পিচ্ছিল ধরনের পচন প্রধানতঃ এই জাতীয় মাংস দ্রব্যগুলির বর্হিভাগে দেখা যায়। পচনকারী ব্যাকটেরিয়ার অসংখ্য কোষ একসঙ্গে যুক্ত হয়ে বর্হিভাগে ধূসর বর্ণের আঠালো ভাব সৃষ্টি করে।

(খ) **টকে যাওয়া (Sourness) :** প্রধানতঃ ব্যাসিলাস থার্মোস্ফ্যাকটা *(Bacillus themosphacta)* নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে এই টক ভাবের উৎপত্তি হয়। সাধারণভাবে ল্যাক্টোজ এবং অন্যান্য শর্করা জাতীয় উপাদান এই জীবাণুর প্রভাবে জৈব অ্যাসিড যেমন ল্যাকটিক অ্যাসিড, ফার্মিক অ্যাসিড, অ্যাসেটিক অ্যাসিড ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয় এবং টক বা অম্লত্বের সৃষ্টি করে।

(গ) **সবুজ হয়ে যাওয়া (Greening) :** প্রধানতঃ সংরক্ষিত এবং প্রক্রিয়াজাত মাংস দুটি কারণে সবুজ হয়ে যায়। প্রথমটি হচ্ছে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H_2O_2) উৎপাদনের ফলে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস (H_2S) উৎপন্ন হওয়ার ফলে। দুটি ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে ল্যাক্টোব্যাসিলাস ভিরিডিসেন্স *(Lactobacillus viridescens)* নামক ব্যাকটেরিয়া দায়ী।

6.2.7 মাছ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক খাদ্যের পচন

মাছের রঙের পরিবর্তন ও পচনের ব্যাপারে একটি অন্যতম বিষয়। মাছের হলুদ বা সবুজাভ হলুদ রঙের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়া হোল সিউডোমোনাস ফ্লুরেসেন্স *(Pseudomonas flurescens)* লাল বা গোলাপী রঙের জন্য দায়ী হোল সারসিনা প্রজাতি *(Sarcina sp.)*, মাইক্রোকক্কাস প্রজাতি *(Micrococcus sp.)* অথবা ব্যাসিলাস প্রজাতির *(Bacillus sp.)* ব্যাকটেরিয়া। মাছের চকোলেট বাদামী রঙের সৃষ্টিকারী জীবাণু হোল কে ধরনের স্পোর সৃষ্টিকারী (Asporogenous) ঈস্ট।

সামুদ্রিক খাদ্য (Sea food) : সামুদ্রিক খাদ্য বলতে এখানে মুখ্যতঃ সামুদ্রিক মাছের ব্যাপারে আলোচিত হবে। প্রধানতঃ বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছ এবং তৎসহ সামুদ্রিক খাদ্যের পচন এখানে আলোচনার বিষয়বস্তু।

(1) **চিংড়ি (Shrimp) :** চিংড়ি মাছের ক্ষেত্রে পচন সৃষ্টিকারী মুখ্য ব্যাকটেরিয়ার প্রজাতি হোল অ্যাক্রোমোব্যাক্টার প্রজাতি *(Achromobacter sp.)*।

(2) **গলদা চিংড়ি (Lobsters) :** সামুদ্রিক মাছ গলদা চিংড়ির পচনক্রিয়ার জন্য দায়ী ব্যাক্টেরিয়ার প্রজাতিগুলি হোল সিউডোমোনাস প্রজাতি *(Pseudomonas sp.)* অ্যাক্রোমোব্যাক্টর প্রজাতি *(Achromobacter sp.)* ফ্লেভোব্যাক্টেরিয়াম প্রজাতি *(Flavobacterium sp.)* এবং ব্যাসিলাস প্রজাতির *(Bacillus sp.)* ব্যাক্টেরিয়াগুলি দায়ী।

(3) **কাঁকড়া (Crab) :** সামুদ্রিক কাঁকড়ার মাংসে শীতল তাপমাত্রায় প্রধানতঃ পচন ধরে সিউডোমোনাস প্রজাতি *(Pseudomonas sp.)* এবং অ্যাক্রোমোব্যাক্টর প্রজাতির *(Achromobacter sp.)* ব্যাক্টেরিয়ার জন্য। এছাড়াও অধিক তাপমাত্রায় প্রোটিয়াস প্রজাতির *(Proteus sp.)* ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতিতে পচনও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(4) **শম্বুকজাতীয় প্রাণী (Mollusks) :** পচনশীল ঝিনুকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যাক্টেরিয়ার গণসমূহের (Genus) উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

6.2.8 ডিম এবং পোল্ট্রীর পচন

6.2.8.1 ডিমের পচন

ডিমের ব্যাক্টেরিয়াজনিত পচনকে ব্যাক্টেরিয়াল রট্ (পচন) নামে অভিহিত করা হয়। এই ধরনের পচন নিম্ন প্রকার :

(1) **সবুজ পচন (Green Rot) :** প্রধানতঃ শীতল তাপমাত্রায় (0°C)। প্রাথমিক অবস্থায় ডিমের সাদা অংশ (Egg white) উজ্জ্বল সবুজ বর্ণে পরিবর্তিত হয়।

(2) **কালো পচন (Black Rot) :** ডিমকে আলোর সামনে ধরলে কখনও কখনও সম্পূর্ণ অন্ধকার দেখায় কারণ ডিমের হলুদ অংশ (Egg yolk) কালো বর্ণ ধারণ করে। যখন ডিম ভাঙ্গা হয় তখন ডিমের সমগ্র অংশটি কর্দমাক্ত বাদামী বর্ণের দেখায়। এই সময় হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের (H_2S) গন্ধ পাওয়া যায়।

(3) **গোলাপী পচন (Pink Rot) :** এই ধরনের পচন প্রধানতঃ সিউডোমোনাস প্রজাতির *(Pseudomonas sp.)*। ব্যাক্টেরিয়ার প্রভাবে হয়। এই পচনের ফলে ডিমের হলুদ অংশে (Egg yolk) গোলাপী আভাযুক্ত অধঃক্ষেপ এবং ডিমের সাদা অংশে (Egg white) গোলাপী বর্ণ লক্ষ্য করা যায়।

(4) **লাল পচন (Rot) :** এই ধরনের পচনে পচনকারী ব্যাক্টেরিয়ার নাম লাল রঞ্জকযুক্ত (Pigmented) সেরাসিয়া প্রজাতি *(Serratia sp.)*।

মোল্ডের প্রভাবে ডিমের পচন ঃ

(1) মোল্ডের সংক্রমণে ডিমের খোলা এবং ভিতরের দিকে ছোপ লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের ছোপকে সাধারণভাবে সূচী ছোপ (Pin spot) বলা হয়। পেনিসিলিয়াম প্রজাতির *(Penicillium sp.)* মোল্ড ডিমের ভিতরের অংশের হলুদ বা নীল বা কালো ছোপের জন্য দায়ী। ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম প্রজাতির (Cladosporium sp.) মোল্ড গোলাপী ছোপের জন্য দায়ী।

(2) ডিমের বিভিন্ন প্রকার বা প্রজাতির মোল্ডের দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার ফলে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়, তাকে মোল্ডিনেস বলে।

ডিমের অভ্যন্তর ভাগে ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণে খারাপ গন্ধের সৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যাপারটিও পচনের একটি অঙ্গ।

(1) ডিমের ছাতা ধরা বা পুরাতন গন্ধের উৎপত্তির কারণ হল, ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ।

(2) ডিমের খড়জাতীয় গন্ধের কারণ হল, এয়ারোব্যাক্টর ক্লোয়াসিয়া *(Aerobactor Cloacea)* ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ।

(3) ডিমের মাছজাতীয় গন্ধের কারণ হল ইসচেরিচিয়া কোলি *(Escherichia coli)* নামক ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ।

6.2.8.2 পোলট্রীর পচন

(1) নাড়ীভুড়ি বের করা মুরগীর মাংসের দশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (10°C) বা তার কম তাপমাত্রায় পচনের জন্য দায়ী ব্যাক্টেরিয়ার প্রজাতিরা হল সিউডোমোনাস প্রজাতি *(Pseudomonas sp.)* এবং অ্যারোমোব্যাক্টর প্রজাতি *(Achromobacter sp.)*। এছাড়াও কিছু ঈস্ট প্রজাতি যেমন টরুলোপসিস প্রজাতি *(Torulopsis sp.)* এবং রডেটরুলা প্রজাতির (Rhodotorula sp.) উদাহরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(2) দশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের (10°C) অধিক তাপমাত্রায় মাইক্রোকক্কাস প্রজাতি *(Micrococcus sp.)* অ্যাক্রোমোব্যাক্টর প্রজাতি *(Achromobactor sp.)* এবং ফ্লেভোব্যাক্টেরিয়াম প্রজাতির (Flavobacterium sp.) ব্যাক্টেরিয়াসমূহ মুরগীর মাংসের পচনের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকার পালন করে।

(3) বরফে সংরক্ষিত কাটা মুরগীর মাংসে অনেক সময় পিচ্ছিল ভাব এবং বাজে গন্ধ বা টক গন্ধ লক্ষ্য করা যায়। এই ঘটনার প্রধান কারণ সিউডোমোনাস প্রজাতি *(Pseudomonas sp.)* অ্যালকালিজেনেস প্রজাতি *(Alcaligenes sp.)* ইত্যাদি ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ।

6.2.9 ক্যান বা টিনের পাত্রে সংরক্ষিত খাদ্যের পচন

ক্যান বা টিনের পাত্রে সংরক্ষিত খাদ্যের পচনকে ব্যাক্টেরিয়ার প্রকারভেদ অনুযায়ী অনেক ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(1) **থার্মোফিলিক স্পোর উৎপাদনকারী** ব্যাক্টেরিয়ার প্রভাবে পচন ঃ

(ক) **সমতল টক পচন (Flat Sour Spoilage) :** এক ধরনের সমতল টক ব্যাক্টেরিয়ার প্রভাবে ক্যান বা টিনের পাত্রে সংরক্ষিত খাদ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবং পাত্রের আকারটি সমতল হয়। তাই এই ধরনের বিশেষ নামকরণ করা হয়েছে। এই ধরনের পচনের জন্য দায়ী ব্যাক্টেরিয়ারা হোল ব্যাসিলাস কোয়াগুল্যান্স (Bacillus coagulans), ব্যাসিলাস স্টিয়ারোথার্মোফিলাস (Bacillus stearothemophilus) এবং ব্যাসিলাস পেপো *(Bacillus pepo)*।

(খ) **থার্মোফিলিক অবায়বীয় পচন (Thermophilic Anaerobe Spoilage) :** এই ধরনের জন্য দায়ী ব্যাক্টেরিয়াদের অবায়বীয় থার্মোফিলিক ব্যাক্টেরিয়া বলে এবং এরা হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপাদন করে না। ক্লসট্রিডিয়াম থার্মোসাকারোলাইটিকাম *(Clostridium themosaccharolyticum)* নামক স্পোর উৎপাদনকারী অবায়বীয় থার্মোফিলিক ব্যাক্টেরিয়া শর্করাকে ভেঙ্গে অ্যাসিড এবং গ্যাস উৎপন্ন করে। এই অ্যাসিড উৎপাদনের ফলে পচা খাদ্যে টক গন্ধের সৃষ্টি হয়। গ্যাস প্রধানতঃ কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) এবং হাইড্রোজেন (H_2) গ্যাসের মিশ্রণ এবং এর প্রভাবে টিনের পাত্র ফুলে ওঠে এবং যদি বেশী তাপমাত্রায় দীর্ঘক্ষণ রাখা হয় তবে পাত্রের ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(গ) **সালফাইড ব্যাক্টেরিয়ার প্রভাবে পচন (Spoilage Caused by Sulfide Bacteria) :** টিনের পাত্রে সংরক্ষিত মটরশুটি, ভুট্টা ইত্যাদি খাদ্যের পচনের জন্য দায়ী হল ক্লসট্রিডিয়াম নিগ্রিফিকান্স *(Clostriduim nigrificans)*। এটি একটি সালফাইড ব্যাক্টেরিয়া। এই ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণের ফলে পচা ডিমের গন্ধের বা হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) গ্যাসের গন্ধের সৃষ্টি হয়।

6.4 সারাংশ

সমগ্র বিষয়টি অধ্যয়ন করে সন্ধান প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের পচন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে পারি। এছাড়াও খাদ্যজীবাণুবিদ্যায় ব্যাক্টেরিয়া, ঈস্ট, মোল্ড এবং অ্যাক্টিনোমাইসেটিসের গুরুত্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারি। সুতরাং সামগ্রিকভাবে খাদ্য-জীবাণুবিদ্যায় বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর সংক্রমণ এবং তাদের উপকারী ভূমিকা সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করতে পারি।

6.5 অনুশীলনী

1. শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) সন্ধান প্রক্রিয়া —এবং — দুই ভাবেই সম্পন্ন হয়।

(খ) বেকারস ঈস্ট উৎপাদনকারী জীবাণুর নাম —।

(গ) সন্ধান প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত দুটি উৎসেচকের নাম — এবং —।

(ঘ) মোল্ড দ্বারা পাঁউরুটির পচনকে বলে।

(ঙ) ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা পাঁউরুটির পচনকে — বলে।

(চ) ব্যাক্টেরিয়াজনিত নরম পচনের জন্য দায়ী ব্যাক্টেরিয়া হোল —।

(ছ) দুধের রোপিনেসের জন্য দয়ী ব্যাক্টেরিয়ার নাম —।

(জ) দুধের হলুদ রঙের পরিবর্তনের জন্য দায়ী ব্যাক্টেরিয়ার নাম —।

2. একাধিক উত্তরের মধ্যে সঠিকটি বাছুন ঃ

(1) মধুর পচনের জন্য দায়ী জীবাণুর নাম

(ক) ব্যাসিলাস প্রস্তুতি

(খ) জাইগোস্যাকারোমাইসেস প্রজাতি

(গ) ক্লসট্রিডিয়াম প্রজাতি

(ঘ) অ্যাসপারজিলাস প্রজাতি

(2) ম্যাকারোনির পচনের জন্য দায়ী মোল্ডের উদাহরণ হোল

(ক) রাইজোপাস প্রজাতি

(খ) পেনিসিলিয়াম প্রজাতি

(গ) অ্যাসপারজিলাস প্রজাতি

(ঘ) মোনিলা প্রজাতি

(3) দুধের তেতো গন্ধের জন্য দায়ী ব্যাক্টেরিয়ার নাম

(ক) সিউজোমোনাস প্রজাতি

(খ) মাইক্রোকক্কাস প্রজাতি

(গ) ব্যাসিলাস প্রজাতি

(ঘ) সালমোনেল্লা প্রজাতি

(4) মোল্ড বা ছত্রাকের প্রভাবে মাংসের মধ্যে দেখা যায়

(ক) লাল ছোপ

(খ) কালো ছোপ

(গ) হলুদ ছোপ

(ঘ) বাদামী ছোপ

(5) চিংড়ি মাছে পচন সৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়ার প্রজাতি হোল।

(ক) সিউডোমোনাস প্রজাতি

(খ) অ্যাক্রোমোব্যাক্টর প্রজাতি

(গ) ফ্লেভোব্যাক্টেরিয়াম প্রজাতি

(ঘ) ব্যাসিলাস প্রজাতি

(6) ডিমের কালো পচনের জন্য দায়ী ব্যাক্টেরিয়ার প্রজাতি হোল

(ক) ক্লস্ট্রিডিয়াম প্রজাতি

(খ) ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস প্রজাতি

(গ) সিউডোমোনাস প্রজাতি

(ঘ) ব্যাসিলাস প্রজাতি

(7) ডিমের খড় জাতীয় গন্ধের জন্য দায়ী সংক্রামক ব্যাক্টেরিয়া হোল

(ক) ক্লস্টিডিয়াম বটুলিনাম

(খ) করিনিব্যাক্টেরিয়াম লেপাস

(গ) এয়ারোব্যাক্টর ক্লোয়াসিয়া

(ঘ) ব্যাসিলাস সাবটিলিস

(8) ক্যানে সংরক্ষিত খাদ্যের অর্থাৎ মাংসের পচনের ফলে সৃষ্ট টক ভাবের জন্য দায়ী ব্যাক্টেরিয়ার প্রজাতি হোল

(ক) সালমোনেল্লা প্রজাতি

(খ) ক্লস্টিডিয়াম প্রজাতি

(গ) ব্যাসিলাস প্রজাতি

(ঘ) সিউডোমোনাস প্রজাতি

3. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(a) যোগার্ট ; (b) দুধের রঙ পরিবর্তন ; (c) থার্মোফিলিক স্পোর উৎপাদকারী ব্যাক্টেরিয়ার ক্যানে সংরক্ষিত খাদ্যে প্রভাব ; (d) অবায়বীয় বা অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে সন্ধান প্রক্রিয়া ; (e) শাকসব্জীর কালো মোল্ডজনিত পচন ; (f) দুধের পোড়া গন্ধ ; (g) ডিমের সবুজ পচন ; (h) ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা প্রস্তুত অ্যামাইলেজ।

6.6 গ্রন্থপঞ্জী

1. Frozier, W.C. : *Food Microbiology.*
2. Jay, J.H. : *Modern Microbiology.*
3. Prescott & Dunn : *Industrial Microbiology.*
4. Banwart, G.T. : *Basic Food Microbiology.*
5. Pelezar, H.J. and Robert : D. : *Microbiology.*
6. Underkoffler and Hickey : *Industrial Fermentation.*

একক 7 ☐ খাদ্য প্রযুক্তি

গঠন ঃ

7.0 উদ্দেশ্য

7.1 প্রস্তাবনা

7.2 খাদ্য সংরক্ষণ

- 7.2.1 শুষ্কীকরণ পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ
  - 7.2.1.1 নিরুদন ও সূর্যালোকে শুষ্কীকরণ
  - 7.2.1.2 যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুষ্কীকরণ
- 7.2.2 টিনের পাত্রে খাদ্য সংরক্ষণ
- 7.2.3 হিমায়ন পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ
- 7.2.4 তেজস্ক্রিয় বিকিরণের দ্বারা খাদ্য সংরক্ষণ
- 7.2.5 রাসায়নিক প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করে সংরক্ষণ
- 7.2.6 বায়ু পরিবেশ কন্ট্রোল করে সংরক্ষণ

7.3. ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে কারিগরী বিদ্যা

- 7.3.1 জেলি
- 7.3.2 জ্যাম
- 7.3.3 মার্মালেড
- 7.3.4 স্কোয়াস
- 7.3.5 আচার ও সস্
- 7.3.6 চাটনি

7.4 খাদ্যশস্যে কারিগরী বিদ্যা

- 7.4.1 চাল
- 7.4.2 ধান ও চাল হতে প্রস্তুত বিভিন্ন খাদ্যবস্তু
- 7.4.3 গম
- 7.4.4 ডাল

7.5 বেকারী শিল্প

7.6 এক্সপান্ডেড এক্সট্রুডেড খাদ্যসামগ্রী

7.7 মিষ্টান্ন প্রযুক্তি

7.8 খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেজিং

7.8.1 প্যাকেজিং প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আরও সংযোজনা
7.9 ডাল প্রযুক্তি
7.10 মশলা প্রযুক্তি
7.11 সারাংশ
7.12 অনুশীলনী
7.13 গ্রন্থপঞ্জী

7.0 উদ্দেশ্য

কাঁচা খাবার থেকে তৈরী খাবার অনেক প্রযুক্তি করতে হয় রান্নাঘর থেকে আরম্ভ করে ফ্যাক্টরী হয়ে ভোক্তার টেবিল পর্য্যন্ত। তবে শিল্প বা ইন্ড্রাস্ট্রী সম্বন্ধে এখানে কিছু কিছু আলোচনা করা হবে ; তাও মাত্র কয়েকটি বিষয়ে যাদের যৌক্তিকতা বেশী বলে মনে হয়েছে। খাবার ত নষ্ট হয়ে যায় ; সেইজন্য সংরক্ষণ করতে হয়। কি কি উপায়ে খাদ্য সংরক্ষিত হতে পারে সেটা জানা দরকার, যেমন বায়ু পরিবেশ কন্ট্রোল করেও। খাবার ত নানারকমের, ইন্ডাস্ট্রী অগুণতি। একেবারে কাঁচা খাবার থেকে কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য তৈরী করার এবং পরিশেষে তৈরী খাবারেরও ইন্ডাস্ট্রী হয়েছে। এদের থেকে বেছে কয়েকটি সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়ারও প্রচেষ্টা আছে। দেশ ও কালের সঙ্গে সাযুজ্য আছে, আপেক্ষিকভাবে কম হাই-টেক, এখানের লোকেরা মোটামুটি জানেও হয়ত নিজেরা করতেও পারে, ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি শিল্প— এ রকম বিবেচনায় আলোচনা করা হয়েছে এদের ঃ ফল প্রক্রিয়াকরণ ও নানারকম ফলজাত দ্রব্য, খাদ্যশস্যে কিছু কিছু সুবিদিত প্রক্রিয়া ও দ্রব্য, বেকারী শিল্প, এক্সট্রুডেড খাদ্যসামগ্রী, মিষ্টান্ন তৈরীর প্রযুক্তি এবং শেষে প্যাকেজিং।

7.2 খাদ্য সংরক্ষণ

7.2.1 শুষ্কীকরণ পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ

নিরুদন — কৃত্রিম উপায়ে শুষ্কীকরণ, নিরুদন বনাম সূর্যালোকের শুষ্কীকরণ, শুকনো খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, নিরুদন পদ্ধতি খাদ্য সংরক্ষণের সহায়ক।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফলের সূর্যালোকে শুষ্কীকরণ পদ্ধতি। যথা —কলা, আম ইত্যাদি। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুষ্কীকরণ—প্রত্যক্ষ তাপ সঞ্চালনের মাধ্যমে শুষ্কীকরণ যন্ত্র ও অপ্রত্যক্ষ তাপ সঞ্চালনের মাধ্যমে শুষ্কীকরণ যন্ত্র।

প্রত্যক্ষ তাপ সঞ্চালনের মাধ্যমে শুষ্কীকরণ যন্ত্র, যথা—

(1) Tray শুষ্কীকরণ যন্ত্র

(2) টানেল শুষ্কীকরণ যন্ত্র

(3) Fluidised bed শুষ্কীকরণ যন্ত্র

(4) স্প্রে জাতীয় শুষ্কীকরণ যন্ত্র

অপ্রত্যক্ষ তাপ সঞ্চালনের মাধ্যমে শুষ্কীকরণ যন্ত্র, যথা—

(1) ড্রাম জাতীয় শুষ্কীকরণ যন্ত্র

(2) বায়ুশূন্য শুষ্কীকরণ যন্ত্র

(3) Freeze শুষ্কীকরণ যন্ত্র

শুষ্কীকরণ ঃ

শুষ্কীকরণ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি থেকে অনুসরণ করা হয়েছে। যদিও আমরা এই পদ্ধতির কিছু অংশ আরো উন্নততর করতে সমর্থ হয়েছি। শুষ্কীকরণ হচ্ছে প্রচলিত খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি। আগুনের তাপে খাবারকে শুকনো করার পদ্ধতি বহু পূর্বেই মানুষ আবিষ্কার করে। আদিম মানুষও এই পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত ছিল। যদিও ১৭৯৫ খ্রীঃপূর্বে শুষ্ক উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শের দ্বারা সব্জী শুষ্কীকরণে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ প্রসঙ্গে এই ঘটনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে শুষ্কীকরণ পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ এবং টিনের পাত্রজাত করে খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি একই সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

7.2.1.1 নিরুদন ও সূর্যালোকে শুষ্কীকরণ

নিরুদন পদ্ধতিতে আবহাওয়ার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং একটি ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরিবেশ গড়ে তোলা হয়, যা শুষ্কীকরণের পক্ষে উপযোগী। অপরদিকে সূর্যালোকে শুষ্কীকরণ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। নিরুদ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শুকনো খাদ্যের গুণমাত্রা সূর্যলোক দ্বারা শুকনো খাদ্যের তুলনায় ভাল। তাছাড়া সূর্যালোকে খাদ্য শুকাতে যে পরিমাণ জায়গা লাগে তার থেকে নিরুদন প্রক্রিয়ায় খাদ শুকাতে অনেক কম জায়গা লাগে। তাছাড়া নিরুদন প্রক্রিয়ায় শুকানোর ফলে খাদ্যের পরিমাণ অনেক বেশী থাকে, কেন না সূর্যালোকে শুকানোর সময়ে স্বাভাবিক শ্বসনের কারণে প্রচুর পরিমাণ চিনি অপসারিত হয়। তাছাড়া যেহেতু সূর্যালোকে শুকাতে বেশী সময় লাগে সেহেতু স্বাভাবিক সন্ধান প্রক্রিয়াতেও বেশ কিছু পরিমাণ চিনি নষ্ট হয়। যদিও সূর্যালোকে খাদ্য শুকাতে কোন খরচা হয় না। এছাড়া প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য সূর্যালোকে খাদ্য শুকানো অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

শুষ্কীকৃত এবং নিরুদিন খাদ্যদ্রব্যের মাত্রা (Food value) অন্যান্য পদ্ধতিতে সংরক্ষিত খাদ্যের তুলনায় বেশী। তাছাড়া খাদ্য শুকাতে অনেক কম খরচ লাগে এবং অনেক কম পরিশ্রম।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফলের শুষ্কীকরণ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবার পদ্ধতির বর্ণনা—যথা কলা ও আম।

কলা ঃ পাকা শুকনো কলাকে বলা হয় 'Banana fig'। এর জন্য প্রথমে পাকা ফলের খোসা ছাড়িয়ে লম্বালম্বি করে কাটা হয়। এরপর সেই টুকরোগুলিকে SO_2 দ্রবণে ডুবিয়ে সূর্যালোক উপস্থিতিতে অথবা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুকনো হয়। কাঁচ কলাকে এরপর কিছুক্ষণ গরম জলে ডুবিয়ে খোসা ছাড়ানো হয়। তারপর খণ্ডীকৃত করা হয়। সেই খণ্ডগুলিকে শুকানো হয়। এরপর সেইগুলিকে ভাজা হয় অথবা রান্না করা হয়। শুকানোর পর কলার খণ্ডগুলিকে গুড়ো করে কলার পাউডার তৈরী করা যায়।

আম ঃ কাঁচা, সবুজ খণ্ডীকৃত আম সূর্যালোকে শুকানো হয়। সেই শুষ্কীকৃত আম, আমের পাউডার তৈয়ারীতে ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে স্বাদবর্ধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাকা আমের Pulp হাত দিয়ে চাপ দিয়ে

বার করা হয়। এরপর সেই আমের Pulp-তে অল্প চিনি যোগ করে বাঁশের মাদুরে বিছিয়ে শুকান হয়। একটি স্তর শুকান হলে তার উপরে আবার নতুন আমের pulp যোগ করে পুনরায় শুকান হয়। এই পদ্ধতি ততদূর পর্যন্ত চালান হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত শুষ্কীকৃত pulp -এর বেধ ১.২-২.৫ সেমি হয়। এই প্রকার শুষ্কীকৃত আমের pulp-এর রঙ হয় ঈষৎ হালকা হলুদাভ লাল। যদিও এই জাতীয় দ্রব্যের স্থায়িত্ব মাত্র কয়েকমাস, এর মূল কারণ হল পতঙ্গের আক্রমণ এবং দ্রব্যের নিজস্ব বর্ণের দ্রুত পরিবর্তন। যদিও এই সমস্ত ত্রুটিসমূহ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শুষ্কীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে দূর করা যায়।

7.2.1.2 যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুষ্কীকরণ

নিরুদন বা শুষ্কীকরণ যখন কোন যন্ত্রের মাধ্যমে করা হয় এবং যখন উত্তাপ সূর্যালোক ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যম থেকে পাওয়া যায় এবং সেই তাপ জল শুষ্কীকরণের কাজে ব্যবহৃত হয়, সেই পদ্ধতিকেই যান্ত্রিক শুষ্কীকরণ পদ্ধতি বলে। শুষ্কীকরণ পদ্ধতিতে তাপ এবং ভর উভয়েরই সঞ্চালন হয়। তাপ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যস্থিত জলে সঞ্চালিত হয় এবং তাপই সেই জলে বাষ্পীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় লীন তাপ সরবরাহ করে।

শুষ্কীকরণ যন্ত্র মূলত দুই প্রকার—

(1) বৃদ্ধতাপ জাতীয় শুষ্কীকরণ যন্ত্র, যেখানে উত্তপ্ত গ্যাস যন্ত্রের অভ্যন্তরে উত্তাপ বহন করে নিয়ে যায়। সেই উত্তপ্ত গ্যাস খাদ্যে অভ্যন্তরস্থ জলে তাপ সঞ্চালন করে জলের বাষ্পীভবন ঘটায় এবং সেই বাষ্পীভূত জলকে সেই উত্তপ্ত গ্যাস বহন করে নিয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই উত্তপ্ত গ্যাস বাতাসকে গরম করার মাধ্যমে তৈরী করা হয়।

(2) যেখানে তাপ সঞ্চালন কোন কঠিন তলের মাধ্যমে হয় এবং তাপ একটি ধাতব পাতের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যস্থিত জলে সঞ্চালিত হয় এবং খাদ্যদ্রব্যটি ধাতব পাতের উপরে রক্ষিত থাকে। সাধারণত খাদ্যদ্রব্যটি বায়ুশূন্য পাত্রে না থাকে, সেক্ষেত্রে পাত্র মধ্যস্থিত বায়ু সঞ্চালনের মাধ্যমে উদ্ভূত জলীয় বাষ্পকে দূর করা হয়।

আধুনিক যুগে তাপ সরবরাহকারী মাধ্যম হিসেবে ইনফ্রায়েড বিকিরণ অথবা মাইক্রোওয়েব বিকীরণের মাধ্যমেও করা হয়।

প্রত্যক্ষ তাপ সঞ্চালনের মাধ্যমে শুষ্কীকরণ যন্ত্র বিভিন্ন রকমের হয়। যথা— (1) Tray শুষ্কীকরণ যন্ত্র, (2) টানেল শুষ্কীকরণ যন্ত্র (3) Fluidised bed শুষ্কীকরণ যন্ত্র (4) স্প্রে জাতীয় শুষ্কীকরণ যন্ত্র।

ট্রে শুষ্কীকরণ যন্ত্রে খাদ্যদ্রব্যকে ঘন সন্নিবেশিত তারজালির উপর রাখা হয় এবং দ্রুত প্রবাহমান উষ্ণ বাতাসের মাধ্যমে শুকান হয়।

টানেল শুষ্কীকরণ যন্ত্রে একটি লম্বা টানেলের মধ্যে অনেকগুলি ট্রে বা র‍্যাককে চালানো হয়। তার উল্টো দিক থেকে উচ্চগতিসম্পন্ন উষ্ণ শুষ্ক বাতাসকে চালানো হয়।

Fluidised bed শুষ্কীকরণ যন্ত্র প্রকৃত পক্ষে একটি Pneumatic কনভেয়ার শুষ্কীকরণ যন্ত্র। এই যন্ত্রে উত্তপ্ত বাতাসকে খাদ্যদ্রব্যের মধ্য দিয়ে নীচে থেকে উপরের দিকে অত্যন্ত উচ্চ গতিবেগে চালনা করা হয়। এই বাতাসের গতিবেগকে এমন রাখা হয়, যাতে খাদ্যদ্রব্যাদি সেই উচ্চগতিসম্পন্ন বাতাসে প্রলম্বিত অবস্থায় থাকে।

স্প্রে শুষ্কীকরণ যন্ত্রে ঘন তরল খাদ্যদ্রব্যকে স্প্রে আকারে বিপরীত দিক থেকে আসা উচ্চগতিসম্পন্ন উষ্ণ

শুষ্ক বাতাসে সংস্পর্শে আনা হয় এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তরলীকৃত খাদ্যদ্রব্য শুষ্কীকরণের পর পাউডারের আকারে জমা হয়।

অপ্রত্যক্ষ তাপ সঞ্চালনের মাধ্যমে শুষ্কীকরণ যন্ত্র বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। (1) ড্রাম জাতীয় শুষ্কীকরণ যন্ত্র, (2) বায়ুশূন্য শুষ্কীকরণ যন্ত্র, (3) Freeze শুষ্কীকরণ যন্ত্র।

ড্রাম-জাতীয় শুষ্কীকরণ যন্ত্রে খাদ্যদ্রব্যকে পেষ্টের আকারে উত্তপ্ত ড্রামের গায়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। ড্রামের অভ্যন্তরে উচ্চ চাপ যুক্ত সম্পৃক্ত উচ্চ অংশে ষ্টীম চালানোর মাধ্যমে গরম করা হয়।

বায়ুশূন্য শুষ্কীকরণ যন্ত্রে বায়ুশূন্য স্থানে অত্যন্ত কম তাপমাত্রায় খাদ্যদ্রব্যকে শুকানো হয়।

Freeze শুষ্কীকরণ যন্ত্রে হিমায়িত খাদ্যদ্রব্যকে বায়ুশূন্য অবস্থায় শুকানো হয়।

7.2.2 টিনের পাত্রে খাদ্য সংরক্ষণ (ক্যানিং)

তাপের প্রয়োগে খাদ্য সংরক্ষণ ঃ প্রকৃতপক্ষে তাপ প্রয়োগে জীবাণু ধ্বংসের মূল কারণ হলো প্রোটিনের তঞ্চন এবং উৎসেচকের নিষ্ক্রীয়করণ। তাপ প্রয়োগে জীবাণু এবং তার স্পোরের ধ্বংসের মাত্রা, জীবাণুর প্রকৃতি, তার অবস্থা এবং পরিবেশের উপর নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে তাপ প্রয়োগ জীবাণু ধ্বংসের সময়ে তাপের পরিমাণ যে জীবাণু ধ্বংস করা হয়েছে তার প্রকৃতি অথবা অন্য কোন সংরক্ষণ পদ্ধতি সেই খাদ্যে অবলম্বিত হয়েছে কিনা তার উপর এবং সেই খাদ্যের উপর তাপের প্রভাবের উপর নির্ভরশীল। অণুবীক্ষণিক প্রাণীর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে সবচেয়ে তাপ সহনশীল। কিন্তু ইষ্ট ও মোল্ড গোত্রীয় প্রাণীগুলির তাপ সহনশীলতা অনেক কম। সুতরাং **তাপ প্রয়োগে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করাই সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।**

ব্যাকটেরিয়া স্পোরে তাপ সহ্য করার ক্ষমতা সাধারণ ব্যাকটেরিয়া কোষের তুলনায় অনেক বেশী। সুতরাং তাপ প্রয়োগে কোন জীবাণুকে ধ্বংসের সময়ে সেই জীবাণুর স্পোরকে ধ্বংস করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ তাপকেই 'সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় তাপ' বলা হয়। সাধারণত ১২১°C তাপমাত্রায় একটি জীবাণুকে ধ্বংস করতে যত মিনিট সময় লাগে, তাকেই সেই জীবাণু ধ্বংসের **Processing Time** বল। হয়।

জীবাণু ধ্বংসের প্রকৃতি লগারিদম জাতীয় হয় এবং একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ৯০ শতাংশ জীবাণুকে ধ্বংস করতে যে সময় লাগে, তাকে সেই জীবাণুর 'Decimal reduction' time বলে।

জীবাণু ধ্বংসে সময় ও উষ্ণতার সম্পর্ক

ব্যাকটেরীয় কোষ অথবা স্পোর ধ্বংসের সময় তাপমাত্রা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে হ্রাসপাপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে তাপ প্রয়োগে জীবাণু ধ্বংসের সময়ে তাপমাত্রা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসের সময় কমে যায়, তা নিম্নলিখিত টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে—

তাপ প্রয়োগে যে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করা হয়েছে, তার নাম Flat Spour-Bacteria.

তাপমাত্রা 0°C	সমস্ত স্পোরকে ধ্বংস করার সময় (সেকেণ্ড)
১০০	১২০০
১০৫	৬০০
১১০	১৯০
১১৫	৭০

একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় খাদ্যদ্রব্য মধ্যস্থিত ব্যাকটেরিয়ার ধ্বংসের সময় আরো কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যথা— (1) জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, (2) হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব (pH).

(1) যেহেতু আর্দ্রতাপ শুষ্ক তাপ অপেক্ষা জীবাণু ধ্বংসের কাজে অনেক বেশী কার্যকর, সেহেতু **আর্দ্র স্টীমের উপস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতায় জীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব।** উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে Bacillus Subtilis -এর জীবাণু স্পোরকে স্টীমের উপস্থিতিতে মাত্র ১২০°C তাপমাত্রায় ১০মিনিটে মারা সম্ভব। কিন্তু নিবুদিন গ্লিসারলের উপস্থিতিতে ঐ একই জীবাণু মারতে ১৭০°C তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট প্রয়োজন হয়।

(2) খাদ্যদ্রব্যের pH বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তাপ প্রয়োগের সময় বেড়ে যা হয়, তা নিম্নলিখিত টেবিলের মাধ্যমে বোঝান হয়েছে—

pH-এর প্রভাব Bacillus Subtilus জীবাণুর স্পোরের উপর—

pH	জীবাণু ধ্বংসের সময় (সেকেণ্ড)	pH	জীবাণু ধ্বংসের সময় (সেকেণ্ড)
৪.৫	২	৬.৮	১১
৫.৬	৭	৭.৬	১১

বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে টিনের পাত্রে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বিত হয়—

খাদ্যদ্রব্য বাছাই এবং আলাদা করা

↓

বাছাই করা খাদ্যদ্রব্য ভালো করে ধোয়া

↓

বাছাই করা খাদ্যদ্রব্যের খোসা ছাড়ান। যথা হাত দিয়েও তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে অথবা চুন জলের মাধ্যমে

↓

ব্ল্যানচিং-এর মাধ্যমে খাদ্য মধ্যস্থিত উৎসেচকের নিষ্ক্রিয়করণ

↓

এরপর খাদ্যদ্রব্যকে টিনের পাত্রে ভর্তি করা।

↓

টিনের পাত্র এবং খাদ্যদ্রব্যের মধ্যস্থিত জায়গা লবণ জল তথা চিনির জলীয় দ্রবণ দ্বারা পূর্ণ করা হয়।

↓

এবার পাত্রের মুখ আলতোভাবে ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করা হয়।

↓

এবার পাত্র মধ্যস্থিত বায়ুকে তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে বের করে দেওয়া হয়।

↓

এবার পাত্রের মুখের ঢাকনাকে শক্ত করে আটকে দেওয়া হয় বা সীল করে দেওয়া হয়। যাকে সীমিং অপারেশন বলে।

↓

তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে পাত্র মধ্যস্থিত খাদ্যদ্রব্যকে সংরক্ষিত করা হয়।

7.2.3 হিমায়ন পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ

একটি উন্নয়নশীল দেশে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নতিবিধানে খাদ্য সংরক্ষণ একান্ত জরুরী। ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে জনসংখ্যা ক্রমশঃ উর্ধ্বমুখী সেখানে জনসাধারণকে অধিক খাদ্য যোগান দেবার জন্য খাদ্যের অপচয় রোধ করে খাদ্য সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত সহজ এবং সুলভে হিমায়ন পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ একান্ত জরুরী।

প্রকৃতপক্ষে জীবাণুই খাদ্য নষ্ট করে (মূলত ব্যাকটেরিয়া)। জীবাণুরও বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য এবং অক্সিজেন প্রয়োজন। ব্যাকটেরিয়া বেঁচে থাকার জন্য সাধারণ তাপমাত্রা এবং সাধারণ অক্সিজেন চাপ দরকার। খুব সহজ এবং কার্যকরী পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ করার জন্য মধ্যস্থিত জীবাণুর বংশবিস্তার এবং কার্যক্ষমতাকে কমানো প্রয়োজন; যা খাদ্যের তাপমাত্রা কমানোর মাধ্যমে করা যেতে পারে। **0-8°C তাপমাত্রায় খাদ্যকে রাখলে বেশ কয়েকদিন ঠিক রাখা যায়।** এই পদ্ধতিকে ঠাণ্ডাকরণ বা **Chilling** বলা হয়। খাদ্যকে দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষিত রাখতে গেলে খাদ্যের **তাপমাত্রা –18°C-এর নীচে রাখার প্রয়োজন হয়।** এমন অবস্থায় ব্যাকটেরিয়ার **জীবনবৃত্তীয় কার্যকলাপ এবং বংশবিস্তার প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনাকে Deep বা চরম হিমায়ন বলে।**

হিমায়িক খাদ্যদ্রব্যকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য সেই খাদ্যদ্রব্যকে সেই তাপমাত্রায় রেখে একটি বিশেষ ধরনের যানবাহনের মাধ্যমে পাঠান হয়। সেই ধরনের যানবাহনকে **'Refrigerated Transport Vessel' অথবা Van** বলে।

হিমায়ন জীবানুর জীবনবৃত্তীয় কার্যকলাপকে প্রায় বন্ধ করে দেয়। কিন্তু উৎসেচকের কার্যকলাপকে কিছুটা মন্দীভূত করে। প্রকতপক্ষে উৎসেচকের কার্যকলাপকে সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য হিমায়নের পূর্বে খাদ্যদ্রব্যকে একটি সংক্ষিপ্ত আর্দ্র তাপপ্রয়োগ (Blanching) করা দরকার।

প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের মধ্যে প্রচুর জল থাকার জন্য খাদ্যকে ঠাণ্ডা করলে সেই জল 0 থেকে –3°C তাপমাত্রায় কঠিনভূত হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত খাদ্য অভ্যন্তরস্থ সমস্ত জল কঠিনভূত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্যের তাপন্তরা মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে, দ্রুত হিমায়ন পদ্ধতিতে (Quick freezing process) জলের কঠিনীভবন অত্যন্ত দ্রুত হয় এবং খাদ্যের তাপমাত্রা ৩০ মিনিট বা তার কম সময়ে 0 থেকে –3°C-এর মধ্যে চলে আসে এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন স্ফটিককৃত বরফের আকৃতি অনেক ছোট হয়। Air blast freezer বা উচ্চ গতিবেগসম্পন্ন হিমায়িত বাতাসের সংস্পর্শে হিমায়ন অথবা তরলীকৃত নাইট্রোজেন, বাতাস অথবা কার্বন ডাইঅক্সাইড-এর সাহায্যে এই ধরনের দ্রুত হিমায়ন (Quick freezing) করা সম্ভব।

প্রকৃতিগতভাবে হিমায়নকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা (1) Block freezing বা ব্লকের আকারে হিমায়নকরণ, (2) IQF (Individually quick frozen) process বা আলাদাভাবে প্রতিটি খাদ্যদ্রব্যের দ্রুত হিমায়ন পদ্ধতি।

দ্রুত হিমায়ন বা Quick freezing করার জন্য বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের নাম—

(1) Plat freezer–এই পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্যের block freezing করা যায়। ইহা একটি অপ্রত্যক্ষ হিমায়ন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য হিমায়নকারী পদার্থের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে না।

(2) (a) Air blast tunnel freezeer, (b) Air blast spiral freezer– ইহা একটি প্রত্যক্ষ হিমায়ন

পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্যকে স্বতন্ত্র সত্তা বজায় (IQF) রেখে হিমায়িত করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে উচ্চ গতিসম্পন্ন অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় বাতাসের সংস্পর্শে খাদ্যদ্রব্যকে হিমায়িত করা হয়।

(3) তরলীকৃত নাইট্রোজেন অথবা কার্বন ডাইঅক্সাইডের টানেল জাতীয় হিমায়ন যন্ত্র— এই পদ্ধতিতে অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় তরলীকৃত নাইট্রোজেন অথবা কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রত্যক্ষ সংযোগে খাদ্যদ্রব্যকে আনা হয়। এই পদ্ধতিতেও হিমায়িত হবার পর স্বতন্ত্র সত্তা বজায় (IQF) রাখা সম্ভব।

7.2.5 রাসায়নিক প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করে সংরক্ষণ

বেশ কিছু প্রিজারভেটিভ আছে যেগুলো ব্যবহার করলে পচনশীল খাদ্য কিছুদিন পর্যন্ত খাওয়ার যোগ্য থাকতেও পারে ; এমনকি এ্যান্টিবায়োটিকও ব্যবহার করার রিপোর্ট আছে। তবে এদের বিষক্রিয়াজনিত সমস্যা আছেই কমবেশী ; তাছাড়া খাবারে প্রয়োগ করার প্রযুক্তিগত এবং মূল্যগত অসুবিধাও আছে। নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ব্যবহারে সংরক্ষণের সাহায্য হয়, যেমন—জীবাণু ও পোকামাকড় হয় না এবং খাবারের পুষ্টিদ্রব্য অক্সিডাইজড্ হয় না।

তবে তৈরি খাবারে কোন কোন প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করতেই হয়। আইনতঃ গ্রাহ্য কিছু রাসায়নিক, যেমন—বেনজোয়িক, সালফিউরাস (সালফার ডাইঅক্সাইড), ল্যাকটিক, সরবিক ও প্রপিওনিক এ্যাসিড এবং এদের সোডিয়াম পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়াম লবণ, এছাড়া আরও কিছু রাসায়নিক এবং কোন কোন প্রাকৃতিক খাদ্যদ্রব্য।

7.2.6 বায়ু পরিবেশ কন্ট্রোল করে সংরক্ষণ—ফল, ফুল, সব্জী

আমাদের দেশে শতকরা ৩০ ভাগ ফল পচে নষ্ট হয়ে যায়। যদি সংরক্ষণ করা যেত এর অনেকটাই কাজে লাগত— তাতে দেশের কয়েক হাজার কোটি টাকার সাশ্রয় হত। ফল উৎপাদনে ভারতবর্ষ ব্রাজিলের পর দ্বিতীয়। উৎপাদনের শতকরা এক ভাগ প্রক্রিয়াজাত করা হয়। প্রক্রিয়াতে সোজাসুজি সংরক্ষণ হয়, আবার যে যে বস্তু তৈরি করা হয় এরাও দীর্ঘস্থায়ী। সুতরাং প্রক্রিয়াকৃত ফল দেশের খুব সুবিধা করে—মূল্যবান পুষ্টির ও আরামের খাবার এবং দামী জিনিষ ; দেশে খাওয়া যায়ই, বিদেশে রপ্তানীও করা যায়। ফলের অবস্থা খুব আশাপ্রদ না হলেও সব্জীর অবস্থা আরও খারাপ। উৎপাদনে পৃথিবীতে এক নম্বর হলেও প্রক্রিয়াজাত হয় খুবই কম ; এই জন্য দাম কম—চাষীরা পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য পায় না ; পুষ্টিদ্রব্য হিসেবে খাওয়া হয়, তবে ভারতবর্ষের প্রচুর লোক ও দারিদ্র্য সীমার নীচের গরীব লোকের আরও সাশ্রয় এর দ্বারা হলে ভাল হত। যাই হোক, প্রক্রিয়াকরণ কিন্তু খুব দরকার আরও অনেক বেশী বেশী করে। ফুল দেশের বাজারে ধীরে ধীরে ক্রয়-বিক্রয়ের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে। সে জন্য সংরক্ষণ ও প্যাকেজ করাতে নতুন নতুন প্রক্রিয়াকরণের শুরু হয়েছে—টাটকা, এবং কাট ফুলের বাজার ও রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে।

প্যাক করা অবস্থায় (সিল করা পাত্র বা প্লাস্টিক ফিল্মের প্যাকেটে) পরিবেশেরবায়ু ইচ্ছেমত প্রয়োগ করে ফল-ফুল-সব্জীর শেল্ফ লাইফ বাড়ানো যায়, যাতে দেশের বাজার ও রপ্তানীতে সুবিধা হবে এবং চাষীরা দাম পাবে।

এই রচনায় বায়ু পরিবেশ কন্ট্রোল করে সংরক্ষণের নমুনা হিসেবে টাটকা ফল প্যাকেটজাত করার প্রক্রিয়া

সম্বন্ধে আলোচনা করা হল। ফুল ও সব্জী একই প্রক্রিয়া। এরা তিন শ্রেণীই টাটকা অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। এই অবস্থায় এদের রেসপিরেশন হয় ; অর্থাৎ এদের জীবন্ত বলা যায়। অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। অক্সিজেন কমিয়ে দিলে বা অন্যটি কমে গেলে রেসপিরেশনের গতি কমে যাবে এবং তাতে স্থায়িত্ব প্রলম্বিত হবে—শেল্ফ-লাইফ বেড়ে যাবে। বন্ধ অবস্থায় রাখলে অক্সিজেন কমবে, ক্রমে আরও কমতে কমতে যাবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়বে, রেসপিরেশন রেট বাড়বে এবং স্থায়িত্ব বাড়বে। এইটা হল মডিফাইড এ্যাটমস্ফিয়ার প্যাকিং বা স্টোরেজ (এম এ পি)। কন্ট্রোলড এ্যাটমস্ফিয়ার প্যাকিং (সি এ পি)-এ দরকার মত অন্য গ্যাস ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। যেমন তাড়াতাড়ি পাকানো বা তৈরী করার জন্য অক্সিজেন কেরী করার দরকারে কার্বন ডাইঅক্সাইড, বা পাকানো (রং ধরানো বা মিষ্টত্ব বাড়ানো) এর জন্য অল্প ইথিলিন (যেমন শতকরা এক ভাগ) ব্যবহার করা হয়।

MA/CA পদ্ধতিতে ফল, ফুল, সব্জী, সংরক্ষণ

ভারতবর্ষের জলবায়ু ও মাটি ফল, ফুল, সব্জী উৎপাদনের খুবই সহায়ক হওয়ায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সারা বছরই বিভিন্ন ধরনের ফল সব্জী উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত উৎপাদিত পণ্য বর্ণে, স্বাদে, গন্ধে, অত্যন্ত লোভনীয়। ফলকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, ক্লাইমেকটারিক এবং নন-ক্লাইমেকটারিক।

ক্লাইমেকটারিক	নন-ক্লাইমেকটারিক
আপেল	আঙুর
কলা	কমলালেবু
আম	লেবু
পেঁপে	আনারস
পেয়ারা	লিচু
কাঁঠাল	
সবেদা	

পাকা ফল আমাদের অতি উপাদেয় এবং সুস্বাদু খাদ্য। বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের ফলে পাকা ফল তুলনায় নরম হয়, কাঁচা ফলের সবুজ রঙের পরিবর্তে লাল বা হলুদ রঙ পাওয়া যায় এবং ফলের নির্দিষ্ট গন্ধ পাকা ফলেই পাওয়া যায়। কাঁচা ফলের 'স্টার্চ' চিনিতে (বেশির ভাগ গ্লুকোজে) পরিণত হওয়ার জন্য পাকা ফল অনেক বেশী মিষ্টি লাগে। যদিও পাকা ফল অত্যন্ত সুস্বাদু, গাছ থেকে পেড়ে আনলে কিন্তু অতি সহজেই পচে নষ্ট হয়ে যায়। বিভিন্ন রকম বায়োকেমিক্যাল ও ফিজিওকেমিক্যাল পরিবর্তনের জন্যই ফল/সব্জী অতি সহজেই নষ্ট

হয়ে যায়। এছাড়া মাইক্রোবায়োলজিক্যাল এবং কীটপতঙ্গ দ্বারা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

কিন্তু যদিও ফল অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী, সব সময় চেষ্টা করা দরকার যে উৎপাদিত পণ্য ক্রেতার কাছে যেন টাটকা অবস্থাতেই পৌঁছে দেওয়া যায়।

ফলের নষ্ট হয়ে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ রেসপিরেশন। অক্সিজেন নিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ে। প্রাণের লক্ষণ, ক্ষারেরও বটে। ফল গাছ থেকে পেড়ে আনার পরেও রেসপিরেশন চলতে থাকে। এইজন্য O_2 -এর দরকার হয়। এবং রেসপিরেশন হার তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। সুতরাং গরমে রাখা অথবা আমাদের দেশের উৎপাদিত পণ্য তাড়াতাড়ি পাকবে এবং নষ্টও হবে। যাতে সহজেই নষ্ট না হয় সেইজন্য অবশ্যই সংরক্ষারের কথা ভাবা যেতে পারে।

বর্তমান সময়ে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কোন রকম রাসায়নিক প্রিজারভেটিভ বা এ্যাডিটিভ ছাড়া সংরক্ষণই সবার বেশী কাম্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে মডিফাইড ও কন্ট্রোলড এ্যাটমসফিয়ার (এমএ/সিএ) পদ্ধতিতে সংরক্ষণ একটি অত্যন্ত সফল এবং সময়োপযোগী সংরক্ষণ প্রক্রিয়া। এমএ/সিএ পদ্ধতি প্রয়োগ করার কারণগুলি এই রকম যেমন—

(1) এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে ফুল-ফল-সব্জীর শেল্ফ-লাইফ বাড়ানো যায়।

(2) উৎপাদিত পণ্যের অপচয় কমানো যায়।

(3) পদার্থের গুণমান বেশদিন বজায় রাখা যায়।

(4) দেশের এক প্রান্তের ফল-ফসল অন্য প্রান্তে অথবা বিদেশে পাঠানো যায়। ফলে দেশে ও বিদেশে চাহিদা বাড়ে।

(5) কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে।

কম তাপমাত্রায় (রিফ্রিজারেটার) ফল সংরক্ষণ সম্ভব কিন্তু অনেক ফলের ক্ষেত্রে নিম্ন তাপমাত্রায় চিল্ ইনজুরি ঘটে যায় ফলে ফল গ্রহণযোগ্যতা হারায়। উপরন্তু রিফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ।

বায়ুতে ২১% অক্সিজেন বর্তমাণ। যেহেতু ফলের রেসপিরেশনের জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন। যদি পুরো পরিমাণ অক্সিজেন কমিয়ে দেখা যায় তবে রেসপিরেশন ব্যাহত হবে এবং এর হারও কমে যাবে। হার কমলেও বেঁচে থাকার মত হার রাখা যায়। হার কমানোর ফলে পণ্যের সেল্ফ-লাইফ বাড়বে। এমএ/সিএ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এইভাবে অক্সিজেনের হার কমিয়ে ফল-সব্জী সংরক্ষণ করা হয়। কোন ফল, ফুল বা সব্জী যখন প্যাকেট-বন্দী করা হয় তখন রেসপিরেশনের ফলে অক্সিজেনের পরিমাণ প্যাকেটের ভিতরে কমতে থাকে। এইভাবে কোন পণ্য নিজেই এমএ তৈরী করতে আরম্ভ করে। অনেক ক্ষেত্রে অক্সিজেনের অনুপাত কমানোর জন্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস যেমন নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয়।

এমএর মত সিএর সাহায্যেও সংরক্ষণ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সংরক্ষিত স্থানের বায়ুর উপাদান গ্যাসগুলির অনুপাত প্রয়োজন অনুযায়ী সব সময় স্থির থাকে। এই কারণে অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির (বিশেষ করে গ্যাস যোগাড়, মাপা ও প্রয়োগ) দরকার হয় তাই সিএ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ এমএ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ অপেক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু অন্যান্য দিক বিচার করে এমএ/সিএ পদ্ধতিতে সংরক্ষণের জন্য এখন বিশ্বব্যাপী চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

নিম্নোক্ত টেবিলে কিছু নমুনা দেওয়া হল ঃ

ফল/সব্জী	কার্বন ডাইঅক্সাইড	অক্সিজেন
আপেল	২	২
অ্যাসপারাগাস	১০	১০
বাঁধাকপি	৫	২
গাজর	৪	৩
ফুলকপি	৫	২
টমেটো	২	৩

কিন্তু এই পদ্ধতির কয়েকটি অসুবিধাজনক দিকও আছে যেমন—

(1) প্রতিটি ফল/সব্জীর ক্ষেত্রে সংরক্ষণের তাপমাত্রা এবং গ্যাসের কম্পোজিশন আলাদা জৈব বৈচিত্র্যের জন্য।

(2) অতিরিক্ত অক্সিজেন অভাবে ফল/সব্জীতে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।

(3) প্রতিটি ফল/সব্জীর রেসপিরেশন হার আলাদা হওয়ায় প্যাকেজের জন্য ফিল্ম নির্দিষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে আলাদা।

এমএ প্যাকেজের (এম এ পি) জন্য সাধারণত গ্যাস আংশিক চলাচল করতে পারবে (সেমি-পারমিএবল) এই রকম ফিল্ম ব্যবহার করা হয়। তবে কি ধরনের এবং কি সাইজের প্যাকেজ করা দরকার তা নির্ভর করে ক্রেতা এবং বিক্রেতার উপর, প্যাকেটজাত ফল, ফুল, সব্জী handle করা খুবই সহজ, পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যায় হ্রাসে সাহায্য করে, খুচরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শ্রমের সাশ্রয় হয়। শুধু সংরক্ষণ নয়, পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যায় হ্রাসে সাহায্য করে, খুচরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শ্রমের সাশ্রয় হয়। শুধু সংরক্ষণ নয়, পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যায় হ্রাসে সাহায্য করে, খুচরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শ্রমের সাশ্রয় হয়। শুধু সংরক্ষণ নয়, পরিবহণের ক্ষেত্রেও এম এ পি অত্যন্ত উপযোগী। রেল এবং সড়ক এই দুইয়ের উপরই ভারতীয় পরিবহণ বিশেষভাবে নির্ভরশীল। পরিবহণের সময় বিশেষভাবে নজর রাখা দরকার তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার উপর। উদাহরণস্বরূপ লিচু পরিবহণের কথা বলা যেতে পারে। মজফ্ফরপুরের সাহী লিচু গুণমানে অত্যন্ত সেরা। সনাতন পদ্ধতিতে লিচু কাটের বাক্সে ভরে তার উপরে খাতা এবং খবরের কাগজ বিছিয়ে বেঁধে রেলের সাহায্যে দিল্লী এবং পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়। এতে ২৪-৩০ ঘন্টা সময় লাগে এবং ২০-২৫% অপচয় হয়। কিন্তু কাঠের বাক্সের পরিবর্তে পার্ক (পলি ইউরিথেন ফোম) বাক্স ব্যবহার করে দেখা গেছে লিচুর গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই ২ সপ্তাহ বাড়ানো যায়।

ফলের মতো ফুলের ক্ষেত্রেও এমএ/সিএ পদ্ধতিতে সংরক্ষর সম্ভব। এল ডি পি ই/পি পি ব্যবহার করে দেখা গেছে যে রজনীগন্ধা ফুলকে ৩-৪ সপ্তাহ, বেলফুল ৩-৫ দিন, জুঁই ফুল ৭-১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ সম্ভব।

সুতরাং এইসব প্রযুক্তির মাধ্যমে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সিএ/এমএ (সিল করা পাত্রে গ্যাসের পরিবেশ ঠিক করে)। স্টোরেজ একটি অতি কার্যকরী সংরক্ষণ পদ্ধতি ; তবে যেহেতু প্রতিটি ফল, সব্জী, ফুল নিজস্বতায় পৃথক তাই এই পদ্ধতিতে কাজে লাগাতে আরো গবেষণারে প্রয়োজন আছে।

7.3 ফল প্রক্রিয়াকরণশিল্পে কারিগরী বিদ্যা

দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্নভাবে ফল প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। নিম্নে কিছু প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি ও উৎপাদিত দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হল ঃ

7.3.1 জেলি

জেলি একপ্রকার অর্ধকঠিন চটচটে অর্ধস্বচ্ছ খাদ্যবস্তু যা ফলের রস ও চিনি একত্রে জ্বাল দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। এর সঙ্গে অ্যাসিড (অ্যাসকরবিক অ্যাসিড বা সাইট্রিক অ্যাসিড), খাদ্যে অনুমোদিত রঙ ও গন্ধ এবং খাদ্য সংরক্ষক হিসাবে রাসায়নিক যেমন সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট বা পটাশিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট যোগ করা হয়।

প্রস্তুত-প্রণালী ঃ

(1) জেলি প্রস্তুতির জন্য পাকা ও কাঁচা উভয় প্রকার পেয়ারাই একত্রে নেওয়া হয়। পাকা পেয়ারা প্রস্তুত জেলিতে সুগন্ধ আনে এবং কাঁচা পেয়ারা জেলির দৃঢ়তা আনে। কাঁচা পেয়ারায় পেক্‌টিন বেশী থাকে যা জেলির বিশেষ প্রকারের গঠনের জন্য দায়ী। জেলি প্রস্তুতির সময় যে কাঁচা পেয়ারা নিতে হবে তা হবে সবুজ অথচ সম্পূর্ণ পরিণত পেয়ারা।

(2) সমস্ত পেয়ারা ভাল করে ধুয়ে নিয়ে ওজন করে নিতে হবে।

(3) ছোট ছোট টুকরো করে নিতে হবে (স্টেনলেস স্টীলের ছুরির সাহায্যে)।

(4) ফলের টুকরোগুলি স্টীম জ্যাকেটেড প্যান (Steam jacketted pan) এ দিয়ে, জল দিয়ে, অল্প সাইট্রিক অ্যাসিড দিতে হবে। আধঘণ্টা সিদ্ধ করার পর পরিস্কার কাপড়ের সাহায্যে সিদ্ধ ফলের নির্যাস নিষ্কাশন করা হল।

(5) নিষ্কাশিত নির্যাস-এ পেক্‌টিনের পরিমাণ পরিমাপ করার জন্য অ্যালকোহল পরীক্ষা করা হল। ১ মিলি নির্যাস-এ ২ মিলি অ্যালকোহল দেওয়া হল। পেক্‌টিনের পরিমাণ বেশী থাকলে বড় টুকরোর আকারে পেক্‌টিন থিতিয়ে পড়বে। মাঝারি পরিমাণ পেক্‌টিন থাকলে ছোট ছোট টুকরোর আকারে পেক্‌টিন থিতিয়ে পড়বে। খুব কম পেক্‌টিন থাকলে অতি ছোট ছোট পেক্‌টিনের টুকরো দেখা যাবে।

(6) এই নির্যাস-এর আয়তন পরিমাপ করা হল। ১/২/-৩/৪ অংশ ওজনের চিনি যোগ করা হল। পেক্‌টিনের পরিমাণের উপর প্রদেয় চিনির পরিমাণ নির্ভর করবে। বেশী পেক্‌টিন থাকলে বেশী চিনি দিতে হবে, কম থাকলে কম দিতে হবে।

(7) সাইট্রিক অ্যাসিড যোগ করতে হবে এমন পরিমাণে যাতে মোট আম্লিকতা ১%-এর বেশী না হয়।

(8) মিশ্রণকে দ্রুত ২২২°F-এ ফোটাতে হবে।

(9) খাদ্য সংরক্ষক হিসাবে সোডিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট (সর্বাধিক ৩০ পি পি এম সালফার ডাইঅক্সাইড) বা সোডিয়াম বেনজোয়েট (সর্বাধিক ২০০ পি পি এম বেনজোয়িক অ্যাসিড) দেওয়া হল।

(10) পরিষ্কার, শুষ্ক বোতল বা শিশিতে গরম গরম ঢালা হল। শিশির মুখ বন্ধ করে সিল (seal) করে দেওয়া হল।

পেয়ারায় প্রচুর পরিমাণে পেকটিন থাকে। কিন্তু যে সকল ফলে পেকটিন কম থাকে যেমন, আপেল, আঙুর, কাঁঠাল, জাম ইত্যাদি থেকেও জেলি প্রস্তুত করা যায়, তবে সেক্ষেত্রে বাইরে থেকে পেকটিন পাউডার যোগ করতে হয়।

জেলি প্রস্তুতিতে বিভিন্ন প্রকার ত্রুটি ও তার ফলাফল

(1) পেক্‌টিনের অপ্রতুলতা—জেলি ঠিকমতো জমবে না।

(2) অ্যাসিডের অপ্রতুলতা—জেলি ঠিকমতো জমবে না।

(3) চিনি বেশী হলে—জেলি না জমে সিরাপের মতো হয়ে যাবে।

(4) সমাপ্তিবিন্দুর পরও অধিকক্ষণ রন্ধন—দু'রকম ঘটনা ঘটতে পারে। (ক) যদি অ্যাসিড কম থাকে—জেলি শক্ত হয়ে যাবে ; (খ) যদি অ্যাসিড বেশী থাকে ; পেক্‌টিন ভেঙে যাবে বলে সিরাপের মতো হয়ে যাবে।

(5) সমাপ্তিক্ষণের আগে রন্ধন শেষ করলে—জেলি বসবে না এবং সিরাপের মতো হয়ে যাবে এবং জেলি জমবে না।

(6) দীর্ঘক্ষণ ধরে কম আঁচে রন্ধন—অ্যাসিড ও দীর্ঘক্ষণ তাপের প্রভাবে পেক্‌টিন নষ্ট হয়ে যাবে এবং জেলি জমবে না।

(7) সবুজ অপরিণত ফল ব্যবহার করলে—ফলের মধ্যে থাকা জলে অদ্রাব্য শ্বেতসার (স্টার্চ) জেলিকে অস্বচ্ছ করে তুলবে।

(8) খুব বেশী উচ্চতা থেকে জেলি, জেলি রাখার শিশিতে ঢালা হলে—তার মধ্যে বাতাসের বুদ্বুদ এসে যাবে।

(9) শিশিতে ঢালার আগে ফেনা না অপসারণ করলে—জেলি অস্বচ্ছ হয়ে যাবে।

(10) অ্যাসিড বেশী হলে—জেলি থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জল বেরিয়ে যাবে, যাকে 'জেলির কান্না' বলা হয়।

(11) চিনি কম হলে—জেলি থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জল বেরিয়ে যাবে, যাকে 'জেলির কান্না' বলা হয়।

7.3.2 জ্যাম

জ্যাম হচ্ছে জেলির তুলনায় ঘন খাদ্যবস্তু যা মণ্ডীকৃত ফলের শাঁস ও চিনি জ্বাল দিয়ে প্রস্তুত হয়। এপ্রিকট, আপেল, ন্যাসপাতি, কাঁঠাল, আনারস, আম, ফুটি, স্ট্রবেরী, চেরী ইত্যাদি ফল থেকে জ্যাম প্রস্তুত করা যায়। একাধিক ফল একসঙ্গে মিশিয়ে মিশ্র জ্যাম প্রস্তুত করা হয়। বিভিন্ন অনুপাতে আম, কলা, কমলালেবু, আনারস ইত্যাদি মিশিয়ে মিশ্র জ্যাম প্রস্তুত করা যায়। জেলির মতো জ্যামেও খাদ্যে অনুমোদিত রঙ ব্যবহার করা হয়। বাইরে থেকে সাধারণত গন্ধ যোগ করা হয় না।

জ্যাম প্রস্তুতিতেও জেলির মতো স্টেনলেস স্টীলের বাসনপত্রাদি ব্যবহার করা হয়।

প্রস্তুত-প্রণালী ঃ

(1) ১ পাউণ্ড ফল নেওয়া হল (ধরা যাক এপ্রিকট)।

(2) ভাল করে ধুয়ে নিয়ে অল্প জল দিয়ে ২ মিনিট সিদ্ধ করা হল।

(3) সিদ্ধ ফল থেকে বীজ ও খোসা বাদ দেওয়া হল এবং উৎপন্ন মণ্ডের ওজন নেওয়া হল।

(4) এই মন্ড স্টীম জ্যাকেটেড প্যান (Steam jacketted pan)-এ নিয়ে ৬০% চিনির দ্রবণ এমন পরিমাণ ঢালা হল যাতে ফলের শাঁসের মণ্ডের ওজনের ১/২-৩/৪ অংশ চিনি রইল। ফলের আম্লিকতার উপর চিনির পরিমাণ নির্ভর করবে। আম্লিকতা বেশী হলে চিনি বেশী লাগবে, কম হলে কম লাগবে। ফলে পেক্‌টিনের পরিমাণ কম থাকলে ০.৮% পেক্‌টিন যোগ করতে হবে।

(5) মিশ্রণকে দ্রুত ফোটাতে হবে। খাদ্য অনুমোদিত রঙ দেওয়া যাবে।

(6) খাদ্য সংরক্ষক হিসাবে সোডিয়াম বেনজোয়েট (২০০ পিপিএম) বা সোডিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট (৪০ পিপিএম) দেওয়া হল।

(7) পরিষ্কার, শুষ্ক শিশি, গরম গরম জ্যাম ঢালতে হবে। শিশির মুখ বন্ধ করে সিল (Seal) করে দিতে হবে।

7.3.3 মার্মালেড

মার্মালেড একপ্রকার জেলিজাতীয় পদার্থ যাতে ফলের খোসা ছোট ছোট টুকরো অবস্থায় প্রলম্বিত থাকে। সাধারণত লেবুজাতীয় ফল থেকে মার্মালেড প্রস্তুত করা হয়। মার্মালেড প্রস্তুতির জন্য জেলি প্রস্তুতির সমস্ত শর্তই প্রযোজ্য। জেলির তুলনায় এতে অ্যাসিড ও পেক্‌টিনের পরিমাণ বেশী থাকে। মিষ্ট ধরনের কমলালেবু থেকে 'মিষ্ট মার্মালেড' ও মিষ্ট এবং তিক্ত উভয় ধরনের কমলালেবু থেকে 'তিক্ত মার্মালেড' প্রস্তুত করা হয়। 'তিক্ত মার্মালেড'ই বেশী জনপ্রিয়।

মার্মালেডকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। জেলি মার্মালেড।

মার্মালেড প্রস্তুত-প্রণালী ঃ

(1) ফল নির্বাচন—সুপক্ক ফল বেছে নেওয়া হল।

(2) ফল প্রস্তুকরণ—লেবুজাতীয় ফলের খোসার বাহিরের দিকে রঞ্জক পদার্থ ও উদ্বায়ী তৈল থাকে এবং ভিতরে দিকের সাদা অংশে পেক্‌টিন থাকে। খোসার বাহিরের দিকের হলুদ অংশ পাতলা ভাবে ছাড়িয়ে নেওয়া হল এবং ছোট ছোট টুকরো করে নেওয়া হল। এই ছোট ছোট টুকরো সিদ্ধ করে জল ফেলে দেওয়া হল (তিক্তভাবে দূর করার জন্য)। এই সিদ্ধ টুকরোগুলি রেখে দেওয়া হল। বহিঃত্বক ছাড়ানো ফলগুলি টুকরো করে কাটা হল।

(3) পেক্‌টিন নিষ্কাশনের জন্য সিদ্ধ করা—ফলগুলি ২-৩গুণ (ওজন হিসাবে) জলের সঙ্গে মিশিয়ে সিদ্ধ করা হল। সিদ্ধ করা নির্যাস-এ পেক্‌টিনের পরিমাণ দেখার জন্য অ্যালকোহল পরীক্ষা করা হল। নির্যাস-এ যথেষ্ট পরিমাণ পেক্‌টিন পেলে আর সিদ্ধ কারার প্রয়োজন হয়।

(4) সিদ্ধ ফলের খোসা যোগ করা—পূর্বে বর্ণিত ফলের খোসার সিদ্ধ টুকরোগুলি, চিনি ও সিদ্ধ ফলের নির্য্যাস বা সিদ্ধ ফলের মণ্ডে যোগ করতে হবে।

(5) রন্ধন—চামচ পরীক্ষা, শীট (Sheet) পরীক্ষা ইত্যাদি দ্বারা সমাপ্তিক্ষণ নির্ণয় করা হয়। সমাপ্তিক্ষণ অবধি রন্ধন করা হয়।

(6) শীতলীকরণ—প্রস্তুত করার পর ঠাণ্ডা করার সময় চামচ দিয়ে অবিরামভাবে মার্মালেড নাড়তে হবে যাতে ফলের খোসাগুলি ভেসে না ওঠে।

(7) গন্ধদ্রব্য যোগ—অল্প পরিমাণ কমলালেবুর তেল যোগ করা হয়।

(8) প্যাকেজিং—কাঁচের জার বা টিনের ক্যান (Can)-এ মার্মালেড রাখা হয়।

মার্মালেড কালো হয়ে যাওয়া—দীর্ঘদিন গুদামজাত অবস্থায় রাখলে মার্মালেড কালো হয়ে যায়। এর জন্য প্রতি ১০০ কেজি মার্মালেড-এ প্রায় ৯ গ্রাম পটাশিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট যোগ করা হয়। পটাশিয়াম মেটাবাই-সালফাইট ব্যবহার করলে টিনের ক্যান (Can) ব্যবহার করা যাবে না।

7.3.4 স্কোয়াস

কমলালেবু, কাগজিলেবু, আপেল, আঙুর, জাম, আনারস ইত্যাদি থেকে স্কোয়াশ প্রস্তুত করা হয়। স্কোয়াশে মোট কঠিন পদার্থের পরিমাণ কমপক্ষে ৪০% হবে এবং অন্ততঃ ২৫% ফলের রস থাকবে।

কমলালেবুর স্কোয়াশ

(1) কমলালেবুর রস প্রস্তুত করা হল। বীজ বা অন্য কঠিন অংশ পরিস্রাবণ করে বাদ দেওয়া হল। লেবুর রসের আয়তন মেপে রাখা হল।

(2) ৭০% চিনির দ্রবণ প্রস্তুত করা হল।

(3) লেবুর রস ও চিনির দ্রবণ এমন অনুপাতে মেশানো হল যাতে উৎপন্ন মিশ্রণে প্রায় ৬০% চিনি থাকে।

(4) প্রয়োজনমত সাইট্রিক অ্যাসিড যোগ করা হল, যাতে উৎপন্ন পদার্থে সর্বাধিক ৩.৫% অ্যাসিডিটি (আম্লিকতা) থাকে।

(5) খাদ্য সংরক্ষক রাসায়নিক পটাশিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট মেশানো হল (সর্বাদিক ৩৫০ পিপিএম) বা সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট (সর্বাধিক ১০০০ পি পিএম) মেশানো হল।

(6) খাদ্যে অনুমোদিত রঙ এবং গন্ধ মেশানো হল।

(7) প্রস্তুত স্কোয়াশ, পরিষ্কার, উত্তপ্ত বোতলে ভর্তি করা হল। ছিপি থেকে $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি শূন্য রেখে ভর্তি করে সিল (Seal) করে দেওয়া হল।

7.3.5 আচার ও সস্

নুন কিংবা ভিনিগারের সাহায্যে সংরক্ষিত ফলকে আচার বলা হয়। এতে তেল ও মশলা যোগ করা যায়। আম, শশা, লেবু ইত্যাদি থেকে আচার প্রস্তুত করা যায়।

শুষ্ক পদ্ধতি

প্রস্তুত-প্রণালী ঃ

(1) ফলগুলি ভাল করে ধুয়ে কেটে জল ঝরিয়ে ওজন করা হল।

(2) ১০০ কেজি ফলের জন্য ৩ কেজি নুন ব্যবহার করা হয়।

(3) একস্তর কাটা ফলের উপর কিছু নুন ছড়িয়ে আবার একস্তর ফল এইভাবে স্তরে স্তরে রেখে, শুষ্ক, গরম স্থানে (২৭-৩০° সেন্টিগ্রেড), ৮-১০ দিন রাখা হল।

নুনজলে সন্ধান প্রক্রিয়া পদ্ধতি

প্রণালী—১৫% নুনজলে ব্যাকটিরিয়ার বংশবৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল নয়। নুনজল প্রস্তুত করে তাতে কাটা ফলগুলি ডুবিয়ে রাখা হল। ফলের মধ্যে থাকা জল বেরিয়ে এসে নুন জলের ঘনত্ব কমিয়ে দেয় সেইজন্য বাইরে থেকে প্রয়োজনমতো নুন মাঝে মাঝে যোগ করা হয়। সন্ধান প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে তা নুনজল থেকে তুলে ভিনিগারে রাখলে তা বহুদিন অবিকৃত থাকে, এতে মশলা যোগ করা হয়।

7.3.6 চাটনি

আম, এপ্রিকট, আপেল, কুল ইত্যাদি থেকে চাটনি প্রস্তুত করা হয়।

প্রস্তুত-প্রণালী ঃ

(1) ছোট ছোট টুকরো করে ফলগুলি কেটে নেওয়া হল।

(2) অল্প আঁচে দীর্ঘক্ষণ ধরে এগুলি সিদ্ধ করা হল।

(3) সিদ্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগে মশলা ও ভিনিগার যোগ করা হল।

(4) পরিষ্কার, শুষ্ক, জীবাণুশূন্য বোতল বা জারে গরম অবস্থায় চাটনি ঢালা হল ও প্যাকেজিং করা হল

7.3.7 অন্যান্য ফলজাত দ্রব্য

উপরে বর্ণিত দ্রব্যগুলি খুব প্রচলিত। তাছাড়াও আরও ফলজাত দ্রব্য বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি হয়ে থাকে। যেমন—

(ক) ফলের রস ঃ কমলালেবু, আনারস ও টমেটো রস খুবই জনপ্রিয়। তরমুজ প্রচুর উৎপন্ন হয় বলে লাল তরমুজের রসও তৈরি হতে আরম্ভ হয়েছে, যদিও এতে কিছু কিছু প্রোদ্যোগিক সমস্যা আছে।

(খ) সিরাপ, স্কোয়াস, ফ্রুট বিভারেজ, ফ্রুট ড্রিংক এবং অন্যান্য নামের ফলের সরবৎ তৈরি করা যায়।

(গ) টমেটো সস্, কেচাপ বা টমেটো রেলিশ ইত্যাদি টমেটো দ্রব্য আছে।

(ঘ) নানা রকমের পিকল্ (চাটনী জাতীয়) ঃ পিক্‌ল ইন সাইট্রাস জুস, ব্রাইন, (নুন জল), অয়েল, ভিনিগার ইত্যাদি দ্রব্য বাজারজাত হয়।

(ঙ) ক্যান্ডি ও প্রিজার্ভ ঃ চিনি দিয়ে বিশেষ করে অসমো-ডিহাইড্রেশন পদ্ধতিতে ইনটারমেডিয়েট ময়শ্চার (আই এম) খাবার জনপ্রিয় এবং লজেন্স জাতীয় মিষ্টির মত কিন্তু অনেক উৎকৃষ্ট (পুষ্টিযুক্ত) হয়। এই ধরণের সংরক্ষণ করা ফলের ছোট ছোট টুকরো ফল হিসাবে খাবার, ডেজার্ট ও আইসক্রীমের সঙ্গে ব্যবহৃত টুটিফ্রুটি ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হতে পারে।

(চ) জুসকে এ্যালকোহল ফার্মেন্ট করে নানারকমের দ্রব্য হতে পারে। অল্প করল সাধারণ পানীয়, অরেকটু করলে কার্ডয়াল জাতীয় পানীয় এবং আরও করলে ওয়াইন ইত্যাদি।

7.4 খাদ্যশস্যে কারিগরী বিদ্যা

7.4.1 চাল

ধান ভাঙানোর আগে কোনরকম প্রক্রিয়াকরণ না করলে সেই ধান থেকে উৎপন্ন চালকে বলা হয় 'সাদা চাল'। ভাঙানোর আগে বিশেষ একপ্রকার প্রক্রিয়াকরণ পারবয়েলিং (Parboiling) করা হলে সেই ধান থেকে প্রাপ্ত চালকে বলা হয় পারবয়েল্ড (Parboiled) চাল।

বাষ্প ও তাপের যৌথ প্রভাবে ধানের মধ্যেকার শ্বেতসারজাতীয় পদার্থের গঠনের পরিবর্তনকে পারবয়েলিং বলা হয়। তিনটি ধাপে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

(ক) ধান ভেজানো—ধানের খোসা এবং শস্যের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান জলে ভরে ওঠে ও শ্বেতসার দানাগুলি জল শোষণ করে ফুলে ওঠে।

(খ) বাষ্পদ্বারা প্রক্রিয়াকরণ — ভেজা ধান বাষ্পের সংস্পর্শে কিছুক্ষণ থাকার ফলে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের জিলেটিনিভবন (Gelatinization) হয়।

(গ) শুষ্কীকরণ —এই ধানকে ড্রায়ারে (Dryer)-এর সাহায্যে শুকানো হয় যতক্ষণ না এর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ প্রায় ১৬%-এ না পৌঁছায়।

পারবয়েলিং-এর সুবিধা

(1) পারবয়েলিং-এর ফলে ধানের ভিতরকার শস্য অতিরিক্ত দৃঢ়তা লাভ করে, যার ফলে ধান ভাঙানোর সময় ভাঙা চালের সংখ্যা কমে যায়।

(2) ধানের খোসার ঠিক নীচে ভিটামিন ও প্রোটিন বেশী থাকে এবং শস্যের কেন্দ্রে দিকে কম থাকে। জলে ভেজানোর ফলে বহিঃস্তরের ভিটামিন ও প্রোটিন ভিতরের দিকেও শোষিত হয়ে যায়, ফলে চাল পালিশ করার সময় সমস্ত ভিটামিন ও প্রোটিন অপসারিত হয়ে যায় না।

(3) ভাত সিদ্ধ হবার পর, যেন অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বযুক্ত হয়, ফলে ক্ষতি কম হয়।

(4) ভাত সিদ্ধ করার সময় দীর্ঘক্ষণ তাপ সহ্য করতে পারে।

(5) পারবয়েল্ড চাল শক্ত ফলে দীর্ঘদিন গুদামজাত রেখেও পোকার আক্রমণ সহজে হয় না।

পারবয়েলিং-এর অসুবিধা

(1) দীর্ঘক্ষণ ধরে জলে ভিজে থাকার জন্য পারবয়েল্ড ধান বা চালে ছত্রাক জন্মাতে পারে এবং তা থেকে ক্ষতিকারক বিষাক্ত পদার্থের ক্ষরণ ঘটতে পারে।

(2) পারবয়েলিং পদ্ধতির শেষ ধাপ শুষ্কীকরণ যার জন্য খরচ অনেক বেড়ে যায়।

(3) পারবয়েল্ড চাল রান্না করতে অনেক বেশী সময় লাগে।

7.4.2 ধান ও চাল হতে প্রস্তুত বিভিন্ন খাদ্যবস্তু

মুড়ি - মাটির কিংবা লোহার কড়াইয়ে বালি দিয়ে উনুনে চাপানো হয়। বালি গরম হলে তাতে চাল দিয়ে অনবরত নাড়তে হয়। চাল ফুটে মুড়িতে পরিণত হয়। চালুনির সাহায্যে বালি ও মুড়ি পৃথক করা হয়।

খই - ধানকে ২-৩ মিনিট জলে ভিজিয়ে রেখে, ভাল করে জল ঝরিয়ে নেওয়া হয়। মুড়ি তৈরীর মতো একইভাবে মাটির বা লোহার কড়াইয়ে বালি দিয়ে এই ভিজে ধান ভাজা হয়। ফুলে ওঠা শস্য ধানের খোসা ফাটিয়ে দেয় ও নরম সাদা খইয়ে রূপান্তরিত হয়। চালুনির সাহায্যে বালি দূর করার পর খই থেকে ধানের খোসা কুলোর সাহায্যে ঝেড়ে দূর করা হয়।

চিড়া - ধানকে ২-৩ দিন জলে ভিজিয়ে রাখার পর, কয়েকমিনিট ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করে, জল ঝরিয়ে নেওয়া হয়। এই ধান, অগভীর, মাটির বা লোহার কড়াইয়ে রেখে উত্তপ্ত করা হয়। তারপর কাঠের যন্ত্রের সাহায্যে শস্যকে চ্যাপ্টা করা হয় ও তুষ আলাদা হয়ে যায়। কুলোর সাহায্যে তুষ ও চিঁড়াকে করা হয়।

7.4.3 গম

গম থেকে সুজি, আটা ও ময়দা প্রস্তুত করা হয়। শস্যের বাহিরের ত্বককে ব্রান (Bran) বলে। এই অংশে ফ্যাট বা স্নেহজাতীয় পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি বেশী থাকে। শস্যের ভিতরের অংশে শ্বেতসার

জাতীয় পদার্থ বেশী থাকে। ব্র্যান সমেত অর্থাৎ (গোটা) গম থেকে প্রাপ্ত চূর্ণ অংশকে আটা বলে। শস্যের ভিতরের অংশ বেশী নরম ও সাদা হয়। এই অংশ থেকে প্রাপ্ত চূর্ণ অংশকে ময়দা বলা হয়।

স্টোন (Stone) পদ্ধতিতে আটা ও ময়দার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ পাওয়া যায়। ১০০ কেজি গম থেকে ১০০ কেজি আটা পাওয়া যায়।

রোলার (Roller) পদ্ধতিতে আটা ও ময়দার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ পাওয়া যায়। ১০০ কেজি গম থেকে ২০–৪০ কেজি উৎকৃষ্ট ময়দা পাওয়া যায়।

7.4.4 ডাল

ডালের খোসা ছাড়ানো ও ভিতরের শস্যকে দুটি সমান অংশে ভাগ করে ফেলা হয় ডাল ভাঙানোর সময়। ডালকে একাধিক্রমে জলে ভেজালে ও শুকালে ডালের খোসা ছাড়ানো ও এক-দুই অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। দেশী পদ্ধতিতে ডাল ভাঙলে অনেক ভাঙা ডাল ও ডালের গুঁড়ো উৎপন্ন হয়। এই পদ্ধতিতে ৬৫-৭০% খোসা ছাড়ানো দুভাগে ভাঙা ডাল পাওয়া যায় যেখানে আধুনিক ডাল ভাঙানো মেশিন ব্যবহার করলে ৮২-৮৫% খোসা ছাড়ানো ও দুটুকরোভাবে ভাঙা ডাল পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে দানাশস্যের মধ্যে ডাল নিরামিশাষীদের এবং গরিবদের জন্য খুবই দরকারী; কৃষিজাত পুরোটাই ডাল হিসাবে খাওয়া হয়ে যায়। উন্নত দেশে স্যুপ তৈরী করতে কখন কখন লাগে এবং উন্নত প্রক্রিয়াজাত প্রোটিন আইসোলেট এবং কনসেন্ট্রেটও করা হয়। প্রোটিন হাইড্রোলাইসেট ও ফুড-সাপ্লিমেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে বৃদ্ধ ও রোগীদের জন্য।

7.5 বেকারী শিল্প

পাঁউরুটি, কেক, বিস্কুট প্রস্তুতির শিল্পকে বেকারী শিল্প বলে।

আটা বা ময়দার থাকা প্রোটিনকে গ্লুটেন (Gluten) বলে। গ্লুটেন-এর গুণ ও পরিমাণের উপর নির্ভর কন্দের উৎপন্ন বস্তুর গুণমান।

পাঁউরুটি, কয়েকপ্রকার কেক ও কয়েকপ্রকার বিস্কুটের জন্য মাখা ময়দার মন্ডকে কোহল সন্ধানের জন্য ফেলে রাখা হয়। সন্ধান পদ্ধতিতে শর্করা ভেঙে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড ময়দার তালকে ফাঁপিয়ে দেয়। ঈস্ট নামক এককোষী ছত্রাক এই সন্ধান প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

পাঁউরুটি প্রস্তুতি ঃ

উপাদান	শতকরা
ময়দা	১০০
জল	৬০-৬৫
গুঁড়ো দুধ (ফ্যাট বিহীন)	৪
ঈস্ট	২
চিনি	৬ ৮
নুন	২
স্নেহপদার্থ	৩-৪

পদ্ধতি ঃ সমস্ত উপাদান একত্রে মিশিয়ে ২৭°C তাপমাত্রায় রাখা হল। সন্ধান প্রক্রিয়া শেষ হবার পর ৩৮-৪৮°C -এ ৪৫—৬০ মিনিট রাখা হল। এর পর ৩০ মিনিট সেঁকা হল।

পাঁউরুটির অনেক নাম আছে, যেমন হোয়াইট, হুইট-মিল, ফ্যান্সি, ফ্রুটি, বান, মশালা এবং দুধ পাঁউরুটি। অবশ্য ব্যবহার্য দ্রব্য ছাড়াও এতে থাকতে পারে কন্ডেন্সড দুধ, দুধ পাউডার, ছানার জলের পাউডার, দই পাউডার, গ্লুটেন, চিনি গুড় বা জ্যাগারী, খান্দসারী, মধু, লিকুইড গ্লুকোজ, মল্ট পাউডার, খাবারের গুড়ো, বাদাম গুড়ো, সয়াবীন ফ্লাওয়ার, প্রোটিন কনসেন্ট্রেট ও আইসোলেইট, বনস্পতি মার্জারিন ও খাদ্য তেল বা চর্বি, লেসিথিন, গ্লিসারিন, গ্লিসারিল মনোস্টিয়ারেট ও তদনুরূপ অন্য কিছু খাদ্য প্লাস্টিসাইজার, ভিটামিন, খাদ্যগাম, মশলা, ফল ও ফলজাত খাবার, ইত্যাদি এবং মোল্ড ইনহিবিটার যেমন প্রপিওনিক ও সর্বিক এ্যাসিড বা ওদের সল্ট। নানারকমের বিস্কুট, কেক ও প্যাস্ট্রী বেকারী শিল্পের মধ্যে ধরা হয়। বলাবাহুল্য এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কম্পোজিশন আছে, অনেকটা কারুশিল্পের মত এবং দেশকাল ভেদে বিভিন্ন। তবে পাঁউরুটির মত ঈস্ট ব্যবহার করতে হয় না।

নানারকম খাবার আজকাল বেক করে তৈরি করা হয়। পিৎজা ত বাণিজ্যিকভাবে সফল। তাছাড়া, মাছ, মাংস ও সব্জী বেক করে খাওয়ারও প্রবণতা বেড়েছে।

7.6 এক্সপান্ডেড এক্সট্রুডেড খাদ্যসামগ্রী

বর্তমানে ভারতবর্ষে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার তাৎক্ষণিক খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত Snack food-এর ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। এই ধরনের খাদ্যসামগ্রী সরাসরি প্যাকেট খুলে খাওয়ার মত, সাধারণত চাল, ভুট্টা দানার মত বিভিন্ন প্রকার শস্য হতে প্রস্তুত।

শস্য দানা থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকার প্রসারিত স্ন্যাকের ব্যবহারের সঙ্গে চিংড়ি মাছ থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকার Expanded Cracker জাতীয় সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুতিকল্পে Extrusion পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে এইজাতীয় খাদ্যসামগ্রী একবিংশ শতাব্দীর নতুন প্রজন্মের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

প্রস্তুত প্রণালী ঃ

বিভিন্ন প্রকার অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সুস্বাদু বিভিন্ন প্রকার প্রসারিত Extruded খাদ্যসামগ্রী সাধারণত চালের দানা, ভুট্টার দানা থেকে বা চাল ভুট্টার পাউডার থেকে তৈরি হয়। এখন সেই দানা বা পাউডারের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ জল বাইরে থেকে মেশানো হয় যাকে Tempering Operation বলে। সেই দানাদার বা পাউডার জাতীয় কাঁচা মালে জলের মাত্রা সাধারণ ১২-৮০ শতাংশ (wet basis) -এ রাখা হয় এবং জলকে পাউডারের সঙ্গে অত্যন্ত সুষমভাবে মেশানো হয়। এই সিক্ত পাউডারকে Extruder মেসিনের মধ্যে দিয়ে চালনা করা হয়। Extruder মেসিনে প্রথমে হপারের মধ্যে কাঁচা মাল ফেলা হয়। হপারের মধ্যে একটি Screw ঘুরতে থাকে। Extruder এর মধ্যে পাউডার জাতীয় কাঁচা-মালের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। এই Screw-কে Feed Screw বলা হয়। Feed Screw ঘূর্ণন গতিবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে Extruder মেসিনের মধ্যে কাঁচা মালের প্রবেশকে কম-বেশী করে। Extruder মেসিনে ব্যারেলের মধ্যে একটি অথবা দুটি Screw ঘুরতে থাকে। যদি Extruder barrel-মধ্যে একটি মাত্র Screw ঘুরতে থাকে তবে তাকে Single Screw Extruder বলে, অন্যদিকে যদি দুটি স্ক্রু থাকে তবে তাকে Twin Screw extruder বলে। এই পাউডার বা গ্রীট জাতীয় খাদ্যসামগ্রী Extruder barrel এর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় অভ্যন্তরস্থ চাপ এবং তাপের প্রভাবে গলিত অবস্থায় আসে। এখন এই গলিত Plasticized ভরকে Extruder মেসিন থেকে একটি নির্দিষ্ট আকৃতির ছিদ্রপথে মেসিন থেকে বারবার দেওয়া হয়। সেই ছিদ্রের আকৃতির পরিবর্তনের মাধ্যমে Extruder মেসিন থেকে নির্গত প্রক্রিয়াকৃত খাদ্যসামগ্রীর আকৃতির পরিবর্তন করা সম্ভব। Extruder মেসিনে অভ্যন্তরস্থ চাপ অত্যন্ত বেশী থাকায়, খাদ্য অভ্যন্তরস্থ জল বাষ্পীভূত হতে পারে না, যদিও ভিতরের তাপমাত্রা জলের স্ফুটনাঙ্কের অনেক বেশী থাকে। খাদ্যসামগ্রী যখন diehole-এর মাধ্যমে Extruder মেসিন থেকে বাইরে নির্গথ হয়। তখন খাদ্যদ্রব্যের উপর প্রদত্ত বিপুল পরিমাণ চাপ হঠাৎ অপসারিত হয় এবং এর ফলে খাদ্যমধ্যস্থ জল খুব দ্রুত বাষ্পীভূত হয়, এর ফলে খাদ্যদ্রব্যের প্রসারণ বা Expansion হয়। এই পদ্ধতিকেই Puffing বলে। Extruder মেসিনে বিভিন্ন আকৃতির diehole ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির Puffed extruded product তৈরি করা সম্ভব। এই জাতীয় Puffed extruded খাদ্যসামগ্রীকে প্রয়োজনমত, Roasting অথবা শুষ্কীকৃত করা হয়।

Extrsion পদ্ধতিতে খাদ প্রক্রিয়াকরণ হল একটি লাইন flow পদ্ধতি, এই পদ্ধতিতে কোন অবস্থাতেই অর্থাৎ কাঁচা মাল অবস্থায়, dough অবস্থায় এবং অবশেষে Extruder মেসিন থেকে নির্গত প্রক্রিয়াকৃত Puffed খাদ্যসামগ্রীকে কোন অবস্থাতেই হাত দেওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয় Extruder মেসিনের মধ্যে অত্যন্ত উচ্চচাপ এবং তাপমাত্রায় খাদ্য অভ্যন্তরস্থ জীবাণুর বিনাশ ঘটে। এটি হল প্রকৃতপক্ষে একটি HT.ST (high temperature short time) sterilisation পদ্ধতি। কোন খাদ্যদ্রব্যকে Extrusion পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকৃত করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি ক্রমপর্যায়ে অবলম্বিত হয়।

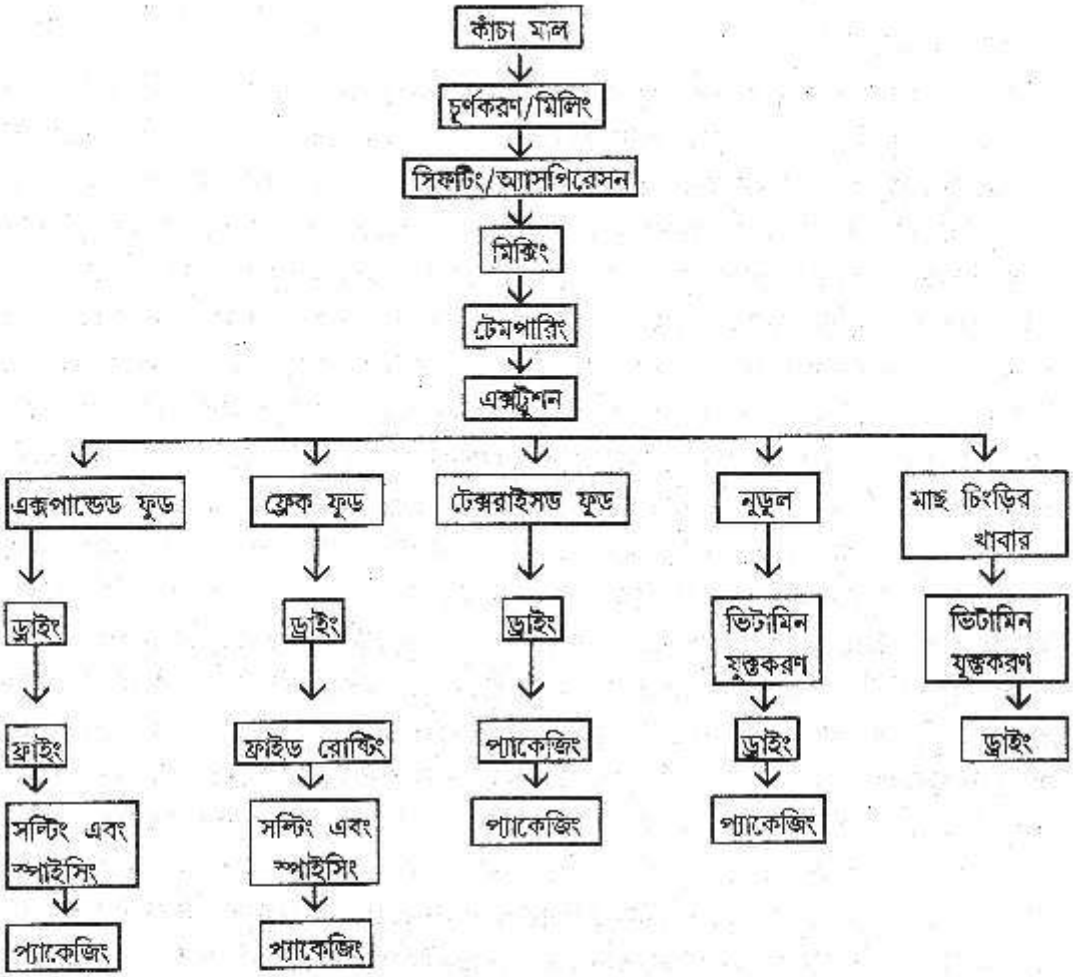

Extrusion হল খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের একটি নতুন পদ্ধতি এবং এটি হল একটি Continuous conveyer reator. এই পদ্ধতিতে এটি Mixer, Heat Exchanger, Pressure vessel reactor, Shearing device এবং Expander হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত এই যন্ত্র উচ্চ চাপে এর উচ্চ তাপমাত্রায় প্রসারিত (Expanded and Puffed) স্ন্যাক্সফুড তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী তৈরিতে, বিভিন্ন প্রকার পশুখাদ্য, মাছ এবং চিংড়ির খাবার তৈরি করতে এই মেসিনের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

Extrusion পদ্ধতির ব্যবহারের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা ঃ

(1) Extrusion পদ্ধতি চলার সময় অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকা খুব জরুরী। এমনকি খুব অল্প সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবহৃত হলেও, মেসিন ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই অবস্থায়, মেসিন পরিষ্কার করে পুনরায় চালাতে অন্তত দুই ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন।

(2) যেহেতু Extrusion পদ্ধতি একটি Hi-Tech পদ্ধতি, ফলে পদ্ধতিতে মেসিনের মেরামতি এবং মেসিন চালানোর জন্য অত্যন্ত দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

(3) Extrusion পদ্ধতি হল একটি Continuous পদ্ধতি। একটি পদ্ধতিতে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পদ্ধতি চালাতে খুব অল্প সময়ের প্রয়োজন, (২০-২৫ মিনিট।) এই পদ্ধতির সব থেকে বড় অসুবিধা হল প্রয়োজন অনুযায়ী এই পদ্ধতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। একবার বন্ধ করে পুনরায় পদ্ধতি চালু করতে ন্যূনতম দুই ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন।

এক্সট্রুশন পদ্ধতিতে Prawn Cracker-এর পদ্ধতি ঃ

এই খাদ্যসামগ্রীতে চিংড়ির Powder- এর সঙ্গে Wheat flour অথবা Rice flour বা অন্য কোন Starchy কাঁচা মাল মিশিয়ে, তার সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ জল মিশিয়ে feed mixtrue তৈরি করা হয়। এরপর এই feedmixture- এর (Tempering-এর পর তাকে Extrusion পদ্ধতিতে Cook করা হয়। Extrusion পদ্ধতিতে উচ্চচাপ এবং তাপমাত্রা বজায় রেখে Expanded Puffed Product তৈরি হয়। এই জাতীয় খাদ্যসামগ্রী অত্যন্ত সুস্বাদু এবং প্রোটিনের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। তাছাড়া অত্যন্ত উচ্চচাপ এবং তাপের প্রভাবে প্রক্রিয়াকৃত হওয়ার জন্য খাদ্য প্রায় জীবাণুমুক্ত, বিশেষতঃ রোগজীবাণু সৃষ্টিকারী জীবাণু থেকে মুক্ত।

Extruded খাদ্যসামগ্রীর Sensory মান নির্ণয় এবং তার সংরক্ষণ

বিভিন্ন ধরনের Extruded খাদ্যসামগ্রীর Sensory evaluation করে দেখা গিয়েছে যে, বিশেষত Expanded এবং Puffed extruded snack জাতীয় খাদ্য তৈরির পর যদি Polycell bag (700 gauge) এবং aluminium পাউচে রাখা হয় তবে তা ৪-১২ মাস পর্যন্ত ঠিক থাকে, তবে পরীক্ষার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে যদি puffed, expanded, extruded খাদ্যসামগ্রীকে যদি Polyethelene pack অথবা Cellophane pack-এ রাখা যায় এবং প্যাকটিকে ঘরের উষ্ণতায় রাখলে, দেখা যায় যে, প্রথম চারমাসে খাদ্যের গুণ সম্পূর্ণ অটুট থাকলেও। চার মাসের পর খাদ্যের গুণ ক্রমশ কমতে থাকে। এর কারণ হিসাবে বলা যায় প্রথম চার মাসের পর প্যাকেটের মধ্যস্থ Extruded খাদ্যসামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণ জল শোষণ করার ফলে খাদ্যে জলের মাত্রা প্রায় দ্বিগুণ বা তিনগুণ হয়ে যায়, যা ব্যাকটেরিয়া আক্রমণের পক্ষে উপযোগী, তাছাড়া খাদ্যসামগ্রী যথেষ্ট জল শোষণ করার ফলে, Extruded Snack-এর Crispness বা মুচমুচে ভাব অনেক কমে যায়, ফলে তার Sensory evaluation Score কমে যায়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়েছে যে, প্যাকেটের মধ্যে রক্ষিত Extruded খাদ্যদ্রব্যের অন্তর্গত fat-এর Peroxidevalue প্রায় অপরিবর্তিত থাকে।

এক্সট্রুডার প্লান্ট এবং তার যন্ত্রপাতিসমূহ ঃ

ময়েশ্চারাইজার ঃ সবকটি পাউডার জাতীয় কাঁচা মালের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ জল মেশান হয়। এখন সেই সংযুক্ত জল যাতে খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে সমভাবে মিশতে পারে, তার জন্য Moisturizer যন্ত্রের প্রয়োজন। ইহা হল প্রকৃতপক্ষে একটি মিক্সিং ড্রাম যার মধ্যে জল স্প্রে করার বন্দোবস্ত আছে, যার জন্য একটি গিয়ার পাম্প মেশিনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

কুকিং/ফরমিং Extruder : ইহা Tempered কাঁচা মালসমূহকে প্রক্রিয়াকৃত করবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে থাকাকালীন খাদ্যদ্রব্যের অভ্যন্তরস্থ Sarch-এর gelationization হয়, এবং প্রোটিনের Texurization হয় অর্থাৎ globular protein fibrous protein-এ রূপান্তরিত হয়।

পেলেট ড্রায়ার ঃ ইহা Extruded pellet সমূহকে শুষ্কীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

কনটিনুয়াল পেলেট ফ্রায়ার ঃ এর কাজ সম্পূর্ণ automatic, এই ইউনিটটি পেলেট হপার, ফিডিং কনভেয়ার, ফ্রাইং, কেটল্, ইমারসন বেল্ট, টেক অ্যাওয়ে কনভেয়ার, মুভেবেল হুড, বিল্ড ইন হিট এক্সেঞ্জার, অয়েল সারকুলেশন পাম্প, তেল ছাঁকনের জন্য তারজালি এবং কন্ট্রোল বক্সের সমন্বয়ে গঠিত।

7.7 মিষ্টান্ন প্রযুক্তি

মিষ্টিদ্রব্য খুবই জনপ্রিয়। সেই কারণে এবং ঐতিহ্যবাহী খাবার বলে শিল্পের পর্যায়ে গেছে বলে ধরা যায়; পূজো, অ্যান্য মাঙ্গালিক কাজে, আনন্দোৎসবে এবং আপ্যায়নে খুব ব্যবহৃত হয়। পরে স্বভাবতই ব্যবসায়েও আসে কারণ এর চাহিদা আছে। পশ্চিমবঙ্গে এই সময় ২ লক্ষ দোকান (কারখানাসহ) আছে এবং সেইগুলোতে ২০,০০০ কোটি টাকার মিষ্টিদ্রব্য বছরে তৈরি হয়।

মিষ্টান্ন শিল্প ঃ

ঐতিহ্যবাহী খাবার (ট্র্যাডিশনাল ফুড) বহু বছর ধরে বহু লোকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একটা রূপ নেয়, অনেকটা তিল তিল করে তিলোত্তমা হওয়ার মত। মিষ্টান্ন এই ঐতিহ্যবাহী খাবারের একটা খুব চমৎকার দৃষ্টান্ত। খাবার থেকে কলাশিল্প এবং চাহিদার কারণে পরে বিক্রী করে বিক্রী-বাণিজ্য। বর্দ্ধমানের মিহিদানা ও সীতাভোগ, জনাই-এর মনোহরা, চন্দনগরের জলভরা, কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া ও সরবাজা, জয়নগরের মোয়া, বসিরহাটের পাঠালি, মোল্লারচকের দই, বাগবাজারের রসগোল্লা, শক্তিগড়ের ল্যাংচা ও বারাসতের নিখুঁতি এদের জনপ্রিয়তা বেশ ব্যাপ্ত। হয়ত এরও পুরোনো ট্রাডিশনাল মিষ্টির লিষ্ট দেওয়া হল, রসগোল্লা ও পান্তুয়া অপেক্ষাকৃত নবীন বলে এতে নেই।

(1)	ভূষ্টাঙ্গা ঃ	উত্তপ্ত বালুতে ভাজা শস্যদানা। যেমন- বাদাম, ছোলা, ভুট্টা প্রভৃতি। বহু বছর পূর্ব থেকেই ভূষ্টাঙ্গা খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন ভূজিয়া বিক্রেতার একচেটিয়া ব্যবসায় হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে মিঠাইওয়ালারা ভূষ্টাঙ্গা ব্যবসা পরিত্যাগ করেছেন।
(2)	মোরব্বা ঃ	চিনি বা আখের গুড়ের রসে কন্দ-মূল-ফল (অর্ধসিদ্ধ) সিদ্ধ করে নানারূপ মসলা মিশ্রি করে (মোরব্বা) তৈরি হবে। এ ব্যবসাও এখন আচার, জ্যাম, জেলি ব্যবসায়ীদের কুক্ষিগত হয়েছে।
(3)	পানক ঃ	মধুর এবং ঈষদম্ল স্বাদ বিশিষ্ট, সুবাসিত তরল পানীয়। এ ব্যবসাও ঠান্ডা পানীয় সরবতওয়ালাদের দখলে চলে গেছে।
(4)	মোদক ঃ	গুড় বা চিনি সহযোগে খই-মুড়ি-তিল-চিড়া (ভাজা) পাক দিয়ে তৈরী গোলাকৃতি মোয়া। এ ব্যবসাও মিঠাইওলাদের হাতছাড়া হয়েছে।
(5)	সন্দেশ ঃ	উত্তপ্ত চিনির রসে ছানা পাক দিয়ে শুষ্কাবস্থায় ছাপমারা সন্দেশ প্রস্তুত হয়।

		এই খাদ্য পণ্য উপজীব্য করেই বঙ্গীয় মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা এখনও টিকে আছেন।
(6)	লড্ডুক ঃ	তেলে ভাজা শস্যচূর্ণ পিটুলির গোলক, (ছোট ছোট) মিহি চিনির পাকে মিশ্রণ করে ঘৃত এলাচ চূর্ণ ও গোলমোরিচ চূর্ণ ও কর্পূর, কিসমিস, বাদাম-পেস্তা মিশিয়ে গোলাকার ছোট ছোট বলের ন্যায় প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য।
(7)	হালুয়া ঃ	ঘৃতে তেজপাতা গরমশলা ফোড়ন দিয়ে সুজি ভেজে তরল চিনির রস মিশিয়ে নস্‌নসে পর্যায়ে নিয়ে কর্পূর মিশিয়ে তৈরী খাদ্য। মিঠাইওলারা এ ব্যবসা এখন আর করছেন না।
(8)	বরফী ঃ	মুগ বাটা বা কাঁচা পাকা ছোলা বা মাসকলাই বা মটরশুঁটি চূর্ণ ঘৃতে ভেজে ঘনক্ষীরের সঙ্গে মিশ্রণ করে থালায় ঢেলে ঠান্ডা করে ত্রিকোণ আকারে কেটে নিলেই বরফী।
(9)	লোচিকা ঃ	ময়দার সঙ্গে ঘৃত (ময়দা ও ঘৃত ১০ ঃ ১) ময়াম দিয়ে পরিষ্কার জল দিয়ে রুটির মত দেখে ছোট ছোট গোলাকার লেচি করে বেলন চাকিতে বেলে তপ্ত ঘৃতে ভেজে নিলেই লোচিকা তৈরী হবে। লোচিকার প্রকারভেদ আছে লুচি, পরোটা, সুজির টবকা, কচমচিয়া প্রভৃতি নোনতা জাতীয় ফেনিকা, গজা (জিবে), চৌকো গজা, বালুসাহী, লাংখাতাই, পরিবন্ধ, মোহানপুরি প্রভৃতি মিষ্টিজাতীয়।
(10)	পুরিকা ঃ	ময়ামসহ ময়দা দেখে যে লেচি তৈরী হবে তাতে খোল বানিয়ে ছোলার ছাতু বা বিউলির ডাল বাটা মশলাদি চূর্ণসহ মিশিয়ে ছোট ছোট ঢেলা ভেতরে ভরে খোলের মুখ বন্ধ করে বেলে তপ্ত ঘৃতে ভাজা হলেই পুরিকা তৈরী হল।
(11)	শঙ্কুলী ঃ	বালুতে ভাজা মাসকলা বা মুগ, চিড়া, আলু, শোলাকচু প্রভৃতি যে কোন দ্রব্য জলে ভিজিয়ে বা সিদ্ধ করে বেটে মন্ড প্রস্তুত করে তৎসহ ময়দা বা আতপ গুঁড়ো মিশিয়ে মিশ্রিত মন্ডকে খুড়ির মত করে ভেতরে ক্ষীর জাতীয় পুর ভরে উত্তপ্ত ঘৃতে বাদামী বর্ণে ভেজে দো-আঁশ উত্তপ্ত চিনির রসে মিশিয়ে শুকিয়ে ফেলতে হবে। এটাই শঙ্কুলী।
(12)	পক্কান ঃ	ক্ষীর, রস ও গব্য রসাত্মক ছানা একত্রে মর্দিত করে এবং ছোট ছোট খুড়ি আকারে গড়ে নিয়ে রুচি অনুযায়ী পুর ভরে ঘৃতে ভেজো পাতলা চিনির রসে ডুবিয়ে রসগর্ভ করা।
(13)	মিঠাই ঃ	মটর বেসন, মাষকলাই বেসন, কন্দ জাউ, গব্য রসাত্মক ছানা জলসহ নাতিতরল গুলে ঝাঁঝরির সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা তৈরী করে তপ্ত ঘৃতে ভেজে এক আঁশা চিনির রসে চুবিয়ে মিঠাই তৈরী হয়।
(14)	বটক ঃ	'মিঠাই' অনুরূপ গোলা প্রস্তুত করে ফেনিয়ে তপ্ত ঘৃতে ভেজে সবু চিনির রসে চুবিয়ে রসগর্ভ করা হলেই তা বটক তবে এসব দিয়ে চিনি বর্জিত নোনতাও তৈরি করা যাবে।

(15)	অপুপ ঃ	চালের গুঁড়া, ময়দা, মটর ডালের বা ক্ষীরের গোল্লা ছোট খুড়িতে তুলে তাওয়ায় অল্প ঘৃতে ভেজে নিয়ে পাতলা চিনির রসে ডুবিয়ে রসগর্ভ করে অপুপ তৈরি হয়।
(16)	পিষ্টক ঃ	চালের গুঁড়া, ময়দা, সুজি জলে গুলে নাতিতরল গোলার সঙ্গে গব্য রসাত্মক ছানা, ক্ষীর-চিনির রস, মুরগীর ডিম, সুবাসিত মশলা, বাদাম-পেস্তা, কিসমিস, মোরব্বা মিশিয়ে একটি মাটির সরায় ঢেলে অন্য সরা দিয়ে ঢেকে ভাপিয়ে নিলেই পিষ্টক।
(17)	পুলিকা ঃ	উত্তপ্ত জলে চালের গুড়ার কাই প্রস্তুত করে পোলিকা তৈরি করে ভেতরে ক্ষীর জাতীয় পুর (সুমিষ্ট ক্ষীর, নারকেলপুর বা তিলপুর) ভরে গোলিকা তিনপাটায় ভাজ করে জোড় মুড়ে টিপে উত্তপ্ত দুধ বা জলে ভাপিয়ে নিলেই পুলিকা।
(18)	পায়স ঃ	মিষ্ট আলু, চাল, চিড়া, সুজি, সেমুই চুষি বাতাসাসহ দুধে সিদ্ধ করে এবং ঘন হলে তাতে এলাচ কর্পূর মিশিয়ে সুবাসিত পায়স প্রস্তুত হয়।
(19)	গব্য রসাবলী ঃ	পূর্বোক্ত খাদ্যসামগ্রীর বাইরেও বহু খাদ্য প্রচলিত—তাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা চলে। (১) ক্ষীর, (২) সর, (৩) ছানা, (৪) দধি, ও (৫) মাখন। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এইসব একক দ্রব্যগুলি বহুমুখী খাদ্যে রূপান্তর সম্ভব হয়।
(20)	চন্দনীক্ষীর ঃ	প্রতি কেজি দুধে ১২৫ গ্রাম সাদা বাতাসা (চিনিতে ময়লা থাকতে পারে) ফুটিয়ে দুধকে ২৫০ গ্রামে নিয়ে এলেই ক্ষীর প্রস্তুত হবে। কেউ গোলাপী আতর দিয়ে সুগন্ধ যুক্ত করে। ক্ষীর প্রস্তুতের পরমুহূর্তেই পেস্তার পাতলা কুচি ছড়িয়ে দিয়ে চন্দনী ক্ষীর তৈরি করা হয়।
(২১)	রসামৃত লহরী ঃ	জলশূন্য ছানার সঙ্গে সামান্য ময়দা মিশিয়ে গুছি বা লেচি তৈরি করে নিমকীর মতো চ্যাপ্টা করে ঘৃতে পক্ক করে চন্দনী ক্ষীরে ডুবিয়ে তুলে নিলেই রসামৃত লহরী। ছানার সঙ্গে ময়দা মেশানোর সময় ভাঙা ছোট এলাচ মেশালে আরও সুস্বাদু হবে।
(২২)	মন্থালমান ঃ	মুগ ডাল চূর্ণ, ক্ষীর, সাধারণ বাদাম, পেস্তা, কিসিমিস, জাফরানী, ছোটি এলাচ গুঁড়ো, চিনি ও ঘৃত হচ্ছে উপকরণ। মুগচূর্ণ ও ঘৃত মিশিয়ে মৃদু তাপে বাদামী বর্ণের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিনির রস ধীরে ধীরে ঢেলে সঙ্গে সঙ্গে নাড়তে হবে। ঘন হবার পর পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, এলাচ গুঁড়ো ও জাফরান গুঁড়ো মিশিয়ে নাড়তে হবে। গাঢ় হলেই ঘৃত মাখানো থালিতে ঢেলেই ঠাণ্ডা করার মুখে ছুরি দিয়ে বরফি আকারে কেটে নিতে হবে।
(২৩)	সরবর রসমাধুরী ঃ	ক্ষীর, ছানা, ময়দা, ঘৃত, সুজি এবং সর হল মূল উপাদান। জলশূন্য ছানার সঙ্গে ক্ষীর, সর ও খাজার (সুজি) ময়দা মেখে নিয়ে (জাফরান ও গোলাপী আতর) চৌকো গজার মতো করে কাঠতে হবে। এই চৌকোতে বাদাম-পেস্তার টুকরো বসিয়ে ঘৃতে ভেজে একদিন রসে ভিজিয়ে রেখে ব্যবহার করা চলে।

বিঃ দ্রঃ দুলাল গুপ্ত শর্মার গবেষণাপ্রসূত

শিল্পের অবস্থা ঃ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই শিল্পে খুব একটা আসেনি। ট্রাডিশন এবং চিরাচরিত রন্ধন প্রণালী এতে কাজ করত। জীবাণুর ধারণা না থাকলেও সাধারণ পরিচ্ছন্নতা (হয়ত পুজো প্রক্রিয়াদির কারণে) এই দ্রব্যগুলিকে মোটামুটি হাইজিনের মধ্যেই রাখত। এর অন্যথা হলে তাৎক্ষণিক রোগের উৎপত্তি হত এবং ব্যবহারকারীর কুদৃষ্টি পড়ত। তাছাড়া বেশী পরিমাণ চিনি বা গুড়, উচ্চতাপের ব্যবহার ও আংশিক শুষ্কতার জন্য জীবাণু বাড়তে পারত না।

মেশিনের ব্যবহার ঃ

এর কথা আগেই বলা হয়েছে। হাতে যা যা করা যায় সেগুলো মেশিনে করা যেতে পারে।

প্যাকেজ ঃ

কাগজের ঠোঙ্গা, বাক্স বা মাটির ভাঁড় ব্যবহার হয়ে থাকলেও প্লাস্টিকের ফিল্ম বা ল্যামিনেট-এর ব্যাগ বা শক্ত (রিজিড) পাত্র খুব সুবিধাজনক—চকচকে ও দৃষ্টিনন্দন, রং করা পাত্র হতে পারে, সিল করা যায় তাপ বা আঠা দিয়ে এবং ঢাকনী দিয়ে, উপরে ছাপার কাজ ও ডিজাইন করা যায়, অনেক সময় ভিতরের জিনিস দেখা যায়। হাইজিনিক এবং আইনত বাধা নাই এমন কম্পোজিশনেরও এমন শ্রেণীর প্লাস্টিক ব্যবহার করলে স্বাস্থ্যহানিকর হবে না-- আইনেও ধরবে না।

নানারকমের প্লাস্টিক অথবা তৎসহ কাগজ ও এ্যালুমিনিয়াম পাতের ল্যামিনেট কিনতে পাওয়া যায়। ফর্ম-ফিল-সিল মেশিন পাওয়া যায়, যাতে ছাপানো শিট দ্বারা ঠোঙ্গা বা পাত্র বানিয়ে খাবার ভর্তি করে সিল করা যায়।

এ্যাডিটিভ ঃ

আইনে বারণ না থাকলে রং, এ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও প্রিজারভেটিভ দেওয়া যেতেও পারে—কোন্ কোন্ রাসায়নিক এবং কি কি পরিমাণ ব্যবহার করা যেতে পারে, দেশের রেগুলেশনে আছে। প্রিজারভেটিভ অনেক সময় খুব দরকার, কারণ দূরে পাঠানোর বা রপ্তানীর দ্রব্য নষ্ট যাতে না হয় দেখতে হবে।

গ্যাস প্যাকিং ঃ

অনেক সময় অক্সিজেন অবাঞ্ছিত। দুর্গন্ধের সৃষ্টি এবং জীবাণু ও পোকার বৃদ্ধি না হওয়ার জন্য অক্সিজেন না থাকলে বা কম থাকলে ভাল। সীল করা পাত্রে নাইট্রোজেন বা কার্বন ডাইঅক্সাইড (অক্সিজেন এবং বায়ু থেকে ভারী বলে যা দেওয়া যায় পাত্রের অভ্যন্তরে বসে গিয়ে ক্রমে ভর্তি করে ফেলবে বায়ুকে তাড়িয়ে দিয়ে) দ্বারা এই কাজ হয়।

অ্যাসেপ্টিক ক্যানিং ঃ

বীজাণুহীন অবস্থায় পাত্রে ভরে সীল করলে ক্যানিং-এর মত হয়। ক্যানিং-এ উচ্চ তাপ দিয়ে স্টেরিলাইজ করা হয়, কিন্তু এখানে ঘরের সাধারণ তাপ বা এয়ার-কন্ডিশনের নিম্নতাপে পাত্রস্থ করা যায়।

মান সংরক্ষণ (কোয়ালিটি কন্ট্রোল) ঃ

আইনে মান বা স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন-এর শক্ত বিধান আছে। এ ব্যাপারে পরিদর্শন (ইন্সপেক্সন), ল্যাবরেটরী টেস্ট এবং দরকার হলে সেনসারি টেস্ট (বিধিসম্মতভাবে দেখা, শোঁকা ও খাওয়া) ইত্যাদি করে মান সংরক্ষণ করা দরকার। পি এফ এ আইনে বেশ কিছু মিঠাই এবং মিষ্টি তৈরি করার ইন্টারমেডিয়েট জিনিসের মান (স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন) ঠিক করে দেওয়া আছে, যেমন— দুধ, দুধ পাউডার, কন্ডেন্সড দুধ, ঘি-মাখন, ফ্ল্যাভার্ড দুধ, দই, চীজ, ছানা পনীর, খোয়া, চাক্কা, শ্রখণ্ড, চিনি, গুড়, সিরাপ, ময়দা, সুজি, চকলেক, কেক, প্যাস্ট্রি ইত্যাদি। দরকার মত এদের মান সংরক্ষণ করতেই হবে, নতুবা আইন খেলাপের অপরাধ।

রপ্তানী কার্য ঃ

এন আর আর আই এবং বিদেশীদের কাছে নানারকম মিষ্টির চাহিদা আছে অনেকে রপ্তানী বাণিজ্য এবং ইন্টারনেট বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন। এদের আরও বিস্তার হওয়ার সম্ভাবনা।

7.8 খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেজিং (Packaging of Food Materials)

প্যাকেজিং প্রকৃতপক্ষে একটি খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি। প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার খাদ্যসামগ্রী উপযুক্ত প্যাকেজিং ব্যবস্থার সাহায্যে সংরক্ষিত করা যায় এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। সাধারণত কোন একটি খাদ্যদ্রব্যের সংরক্ষণের জন্য প্যাকেজিং দ্রব্য নির্বাচনের সময় অবশ্যই সেই প্যাকেজিং দ্রব্যের মূল্যের দিকে দেখা হয়। এছাড়াও এটাও অবশ্যই দেখা দরকার যাতে পাকেজিং দ্রব্য খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে যাতে কোন বিক্রিয়া না করে এবং প্যাকেটকৃত অবস্থায় খাদ্যদ্রব্যের গুণগত মান এবং গন্ধ অটুট থাকে।

খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেজিং করতে বিভিন্ন ধরনের পদার্থের ব্যবহার দীর্ঘকাল এরেই চলে আসছে। এদের মধ্যে কঠিন নিরেট মেটাল খাদ্যদ্রব্যের ক্যানিংয়ের সময় ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া flexible মেটাল অ্যালুমিনিয়াম এবং টিনের ব্যবহারও যথেষ্ট, কখনও বা flexible বা semi-rigid plastic প্যাকেজিং দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্যাকেজিং-এর জন্য কাগজ, প্লাষ্টিক এবং অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের ব্যাপক ব্যবহার হয়। এই ম্যাল্টিলেয়ার ফ্লেক্সিবল প্যাকেজিং-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল একাধিক বিভিন্ন প্যাকেজিং দ্রব্য একত্রে ব্যবহার করার ফলে সম্মিলিতভাবে প্যাকেজিং মেটেরিয়ালটি যে ধর্ম প্রকাশ করে, তা কখনও এককভাবে একটি প্যাকেজিং বস্তুর পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। প্রাইমারী প্যাকেজিং মেটেরিয়াল যেটি খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত হয়, সেটিকে অবশাই non-toxic হতে হবে এবং সেটি প্রকৃতপক্ষে খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে কোনরকম রাসায়নিক বিক্রিয়া করবে না। তাছাড়া প্যাকেজিং-এর আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সেটি খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বাইরে থেকে কোনরকম জীবাণুর অনুপ্রবেশ

বা কীটপতঙ্গের প্রবেশ বন্ধ করবে। Moisture Proof Packaging মেটেরিয়াল প্যাকেটকৃত অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য থেকে জল বাইরে বেরোতে দেয় না বা খাদ্যদ্রব্যকে বাইরের বায়ুমণ্ডলীয় জলীয়বাষ্প শোষণে বাধাদান করে। কোন কোন ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্যের সংরক্ষণের জন্য প্যাকেটের মধ্যে অক্সিজেন শূন্য পরিবেশের দরকার হয়। সে জন্য প্যাকেজিং মেটেরিয়ালকে এমনভাবে চয়ীন করা হয় যারমধ্যে দিয়ে বায়ুমণ্ডলীয় অক্সিজেন প্রবেশ করতে না পারে, অর্থাৎ প্যাকেজিং মেটেরিয়ালটির অক্সিজেন পারমিয়াবিলিটি খুব কম রাখা হয়। তাছাড়া কিছু Vegetables জাতীয় খাদ্যদ্রব্যকে প্যাকেজিং করলে প্যাকেটের মধ্যে CO_2 উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন CO_2 যাতে প্যাকেট থেকে সহজে বেরিয়ে যেতে পারে তার জন্য এমন প্যাকেজিং দ্রব্য নেওয়া হয় যার CO_2Permeability খুব বেশী হয়।

তাছাড়া কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্যকে ক্রয় করবার সময় ক্রেতা সাধারণ যাতে খাদ্যদ্রব্যকে নিজ চোখে দেখতে পান তার জন্য অনেক সময় স্বচ্ছ বা Transparent প্যাকেজিং দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্যে আলোর প্রভাবে রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সেই সকল খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ প্যাকেজিং ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

খাদ্যদ্রব্যের সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্যাকেট

(1) প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী কন্টেনার (2) ফেক্সেবল এবং দৃঢ় কন্টেনার (3) হারমেটিক এবং নন-হারমেটিক কন্টেনার—এই জাতীয় পাত্রে গ্যাসের প্রবেশ এবং বাইরে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে। এই জাতীয় পাত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই সকল পাত্রের সীমের মধ্য দিয়েও কোন প্রকার গ্যাসের আদাপ্রদান হয় না। এই জাতীয় পাত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাইরে থেকে কোন ব্যকটেরিয়া, ইষ্ট অথবা মোল্ড পাত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। তাছাড়া এই জাতীয় পাত্রে খাদ্য সংরক্ষিত থাকলে, পাত্র অভ্যন্তরস্থ খাদ্য সামগ্রী বাইরে থেকে কেন জলীয় বাষ্প শোষণ করতে পারে না, অথবা খাদ্যের অভ্যন্তরস্থ জল বাইরে বেরোতে পারে না। তাছাড়া এই জাতীয় পাত্রে বাইরে এবং ভিতর থেকে অক্সিজেন আদানপ্রদান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে। যে কোন দ্রব্যের যার কতকগুলি বিশেষ ধর্ম আছে তাদের Packagaing দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

ধাতুসমূহ

স্টিল হল একটি বহুল প্রচলিত ধাতু যার উপর অন্য ধাতুর কোটিং দেওয়া অবস্থায় অথবা কোটিং না দেওয়া অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য প্যাকেজিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়। টিন কন্টেনার প্রকৃতপক্ষে স্টিলের উপরে টিনের একটি পাতলা প্রলেপ দেওয়া থাকে এবং টিনের ওজন পাত্রের মোটে ওজনের ০.২৫% এর বেশী হয় না। যদিও টিন সম্পূর্ণরূপে মরিচারোধী নয়, তৎসত্বেও টিন কোটিং করা পাত্রে মরিচা পড়ার মাত্রা অনেক কম, এবং গতিও অনেক কম থাকে। অনেক সময় পাত্রে টিন কোটিং-এর পরিবর্তে বিভিন্ন অধাতুর প্রলেপ দেওয়া থাকে।

এখন যেহেতু টিন সম্পূর্ণরূপে মরিচা প্রতিরোধী হয়, সেইহেতু ক্যানে টিন প্রলেপ দেওয়া থাকলেও, মরিচা প্রতিরোধে ভিতরকার স্টিলের বেসপ্লেটের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেই কারণে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যসামগ্রী প্যাকেজ করতে বিভিন্ন ধরনের স্টিলের বেসপ্লেট ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেজিং করার জন্য ব্যবহৃত স্টিল প্লেটের প্রকৃতি

খাদ্যদ্রব্যের প্রকৃতি	খাদ্যদ্রব্যের তালিকা	স্টিলের প্রকৃতি
অতি তীব্র মরিচা উৎপন্নকারী	কালো বা ঐ জাতীয় গাঢ় রঙের ফলসমূহ, আচার, আপেলের রস, বেরী, চেরীফল।	L প্রকৃতির
সাধারণ মরিচা উৎপাদনকারী	অ্যাসিডযুক্ত শাকসব্জী-সমূহ সামান্য অ্যাসিডযুক্ত ফলসমূহ, ডুমুর, আঙুর জাতীয় ফলসমূহ।	MR জাতীয়
অত্যন্ত কম মরিচা উৎপন্নকারী	কম অ্যাসিডযুক্ত খাদ্যসামগ্রী, কড়াইশুঁটি, ভুট্টা, মাংস, মাছ ইত্যাদি।	
মরিচা উৎপন্নকারী নয় এমন খাদ্যসামগ্রী	প্রধানত শুষ্ক খাদ্যসামগ্রী, শুষ্ক সূপ জাতীয় খাদ্য হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী।	MR অথবা MC জাতীয়

প্রকৃতপক্ষে L জাতীয় টিন তীব্রভাবে মরিচা উৎপন্নকারী খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেজিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়। অপরপক্ষে MR অথবা MC জাতীয় স্টিল সামান্য মরিচা উৎপন্ন করে এমন খাদ্যসামগ্রী এবং মরিচা উৎপন্ন করে না এমন খাদ্যসামগ্রীর প্যাকজিং-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। টিনমুক্ত স্টিলের ক্ষেত্রে স্টিলের উপরে অনেক সময় ক্রোমিয়াম বা ক্রোমিয়াম অক্সাইডের প্রলেপ দেওয়া হয়, এক্ষেত্রে ক্রোমিয়ামের ব্যবহার মরিচা প্রতিরোধক হিসাবেই হয়। অনেক সময় আবার ক্রোমিয়ামের উপর বিভিন্ন প্রকার জৈব যৌগের কোটিং দেওয়া হয়, যাকে ল্যাকারিং বলে। খাদ্যদ্রব্যের প্যাকিজিং-এর কাজে Al ধাতুর ব্যবহারও যথেষ্ট প্রধানত অ্যালুমিনিয়াম হল একটি হাল্কা ধাতু, তাছাড়া অ্যালুমিনিয়ামে বাতাসের জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে মরিচা পড়ে না এবং অ্যালুমিনিয়াম ধাতুকে ইচ্ছামত যে কোন আকৃতি প্রদান করা যায়। অ্যালুমিনিয়াম ধাতুকে সহজে সোলডার করা যায় না বলে, অ্যালুমিনিয়াম সীমের সীলিং ধর্ম খুব ভাল নয়। যে সকল পাত্রের ঢাকনা সহজে খোলা যায়, সেই সকল পাত্রের ঢাকনায় অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার বেশী। বায়ুর অক্সিজেন অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যালুমিনিয়াম বায়ুর জলীয় বাষ্পের দ্বারা আক্রান্ত হয় না, ফলে অ্যালুমিনিয়ামে মরিচা পড়ে না।

কাঁচ (Glass) ঃ কাঁচ হল এমন একটি বস্তু যা প্রায় কোন রাসায়নিক দ্রব্যের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। কাঁচের বিশেষ ধর্মকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে কাঁচকে একটি প্রাইমারী প্যাকেজিং দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

পেপার (Paper) ঃ খাদ্যদ্রব্যকে প্যাকেট বন্দী করতে কাগজের ব্যবহার সর্ব্বজনবিদিত। অল্প ক্ষেত্রে কাগজের সঙ্গে জল নিরোধক ল্যামিনেশন যুক্ত করে ফলের রস সংরক্ষণে প্রাইমারী প্যাকেজিং দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় কাগজের উপর মোম, রেজিন, ল্যাকার, প্লাস্টিক, অথবা অ্যালুমিনিয়ামের কোটিং অথবা উপরিউক্ত

দ্রব্যগুলিকে কাগজের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে মিশিয়ে প্যাকেজিং দ্রব্য তৈরি করা হয়। এই জাতীয় প্যাকেজিং দ্রব্যের মধ্য দিয়ে জলীয় বাষ্প এবং গ্যাস সহজে চলাচল করতে পারে না, ইহা অত্যন্ত ফ্লেক্সেবল এবং সহজে ছেঁড়া যায় না। ঐ জাতীয় জিনিসের Busting strength, grease প্রতিরোধ ক্ষমতা, Printability ও সাধারণ কাগজ অপেক্ষা উন্নত ধরনের। মাংসের বা পোলট্রি জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেজিং করতে Porous কাগজ ব্যবহৃত হয়।

প্ল্যাস্টিক জাতীয় ফিল্ম ঃ বর্তমানে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষিত করতে প্লাস্টিক জাতীয় ফিল্মের ব্যবহারই সর্বাধিক। এর প্রধান কারণ হল প্লাস্টিক জাতীয় ফিল্ম হল হালকা, এর দামও কম, এবং সহজে ব্যবহার করা যায়। যে জাতীয় প্লাস্টিক ফিল্ম বর্তমানে ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল সেলুলোজ (সেলোফন), সেলুলোজ অ্যাসিটেট পলিঅ্যামাইড রবার হাইড্রোক্লোরাইড (পাইলো ফিল্ম), পলিএস্টার রেজিন, পলিইথিলিন রেজিন, পলিপ্রোপাইলিন রেজিন, পলিস্টাইরিন রেজিন, পলিভিনাইলিডিন রেজিন ইত্যাদি। এই জাতীয় প্লাস্টিক ফিল্ম ফ্লেক্সিবল বা সুদৃঢ় অবস্থায় থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্যের প্যাকেজ করতে ব্যবহৃত হয়।

ল্যামিনেট ঃ বিভিন্ন ধরনের ফ্লেক্সিবল বস্তু যথা—কাগজ খুব পাতলা ধাতব পাত এবং প্লাস্টিক ফিল্ম যাদের জলীয় বাষ্পের Permeability এবং অক্সিজেন চলাচলের Permeability বিভিন্ন, একত্রে যুক্ত করে মাল্টিমেয়ার প্যাকেজিং করা হয়। এদের ল্যালিনেট বলে। বিভিন্ন প্যাকেজিং দ্রব্যের ভাল ধর্মকে কাজে লাগিয়ে, সেগুলিকে একত্রিত করে। জোড়া লাগিয়ে ল্যামিনেট তৈরি করা হয়। বিভিন্ন প্যাকেজিং দ্রব্যের সম্মিলিত ধর্মকে কাজে লাগিয়ে, অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের এই জাতীয় প্যাকেজিং দ্রব্য তৈরি হয়।

এডিবেল ফিল্ম প্যাকেজ ঃ ঐ জাতীয় প্যাকেজিং দ্রব্যকে সরাসরি খাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আইসক্রিমের প্যাকেজ করতে ভুট্টার প্রোটিন Zein ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন Snack food-এ কিস্‌মিস্ যাতে বাতাসের জলীয় বাষ্প শোষণ করতে না পারে এর জন্য কিস্‌মিসের উপর Starch এর আবরণ লাগানো থাকে। তাছাড়া বাদামের উপর মনোগ্লিসারাইডের আবরণও একটি এডিবেল flim-এর উদাহরণ। মনোগ্লিসারাইডের প্রলেপ বাদাম জাতীয় খাদ্যসামগ্রীকে oxidative rancidity থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। Frankfurtes এবং মাংসের Sausage জাতীয় খাদ্যসামগ্রীতেও এই জাতীয় কোটিং ব্যবহৃত হয়। সাধারণত অ্যামাইলোজ জাতীয় স্টার্চ, Zein প্রোটিন, দুধের প্রোটিন Casein এই জাতীয় edible flim তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

7.8.1 প্যাকেজিং প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আরও সংযোজনা

খাদ্য গুদামজাত, পরিবহণ, বিক্রী ও রপ্তানী করার জন্য প্যাক করার দরকার হয় যদিও কখন সখন এবং কোন কোন খাবার হাতে হাতে বা ক্রেতার জাগায়ও হস্তান্তর করা হয়। তাছাড়াও বিক্রী করার সুবিধার জনয এক এক এককভাবে প্যাক করা, প্যাক-এর উপর জ্ঞাতব্য ছাপানো, দেখতে সুন্দর ও ডিজাইনসহ ছাপানো, স্বচ্ছ ভেতর দেখার সুবিধা, লেবেল লাগানো এবং সর্বোপরি পোকামাকড়, ধুলোবালি, হাওয়া ও জলীয় বাষ্প থেকে সুরক্ষা এই সব কারণেও প্যাক করা দরকার হয়। প্যাক করা একটা অতি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া।

প্যাকেজ দ্রব্য ঃ খুচরা বা রিটেইল বিক্রীর জন্য কাগজের ঠোঙ্গা ও প্লাস্টিক থলে ব্যবহার হয়। বস্তা পরিমাণ পণ্যের জন্য পাকেট বস্তা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পাট বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে চাষ করা হয়। এর মোটা সুতো দিয়ে বুনে বস্তা তৈরি করে এতে প্যাক করা হয়। সাধারণত কুড়ি কেজি থেকে ওজনের দ্রব্য, গুদামজাত

বা বিক্রী এইভাবেই করা হয়। পাটচাষীর সুবিধার্থ ও অন্যান্য অর্থনীতিক কারণে পাটের ব্যবহারের প্রয়োজন এখানে খুব বেশী। বিদেশে মোট শক্ত কাগজ বিশেষভাবে প্রক্রিয়া করে—যার নাম ক্রাফ্‌ট পেপার—চটের মতই বড় বড় প্যাকেজে ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশেও আস্তে আস্তে ক্র্যাফ্‌ট পেপারের ব্যবহার হচ্ছে, এর জন্য ক্রাফ্‌ট পেপার আমদানী ও অল্প অল্প তৈরীও হচ্ছে। পাটের অনুকরণে মোটা সুতো দিয়ে বুনে তৈরি করা বস্তা ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এতে পরিবেশ দূষণ হয় বলে এবং পাটকে উৎসাহ দিতে হবে বলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ করে আইন করে পাটের বস্তা ব্যবহারের বিধান করা হয়েছে। তাছাড়া উল্টোদিকে দেখতে গেলে প্ল্যাস্টিক থেকে দুষণ দ্রব্য ভিতরের মালে আসতে পারে, যেখানে খাবার থাকলে আপত্তি হবে। প্যাকেজ দ্রব্য হিসাবে কাঠ, বাঁশ, নানারকমের কাগজ বিশেষ করে পুরোনো খবরের কাগজ, খড়, কাঠের গুঁড়ো এবং মাটি ও ধাতুর পাত্র ইত্যাদি অনেক দিন ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে। প্লাস্টিকের চাদর (ফিল্ম) ও শক্ত পাত্র পরবর্তীকাল থেকে ব্যবহার হচ্ছে। নমনীয় (ফেক্সিবল) প্লাস্টিক পাত (শিট) তৈরি করা হয় সাতটি পর্যন্ত পরৎ (প্লাই) তাপ অথবা আঁঠা দিয়ে পরপর লাগিয়ে। কখনও আবার এলুমিনিয়াম পরৎও লাগানো হয়। এই কম্পোজিট শিটের সুবিধা আছে যেমন—শিটটা শক্ত হবে, তাছাড়া কেবল প্লাস্টিক থাকলে জলীয় বাষ্প বা অক্সিজেন বা অন্যান্য গ্যাসের আনাগোনার বৈশিষ্ট্য (বাষ্প বা গ্যাসগুলোর ট্রান্সমিশন), তাপ দিয়ে সিল করার সুবিধা, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই স্বচ্ছ প্লাস্টিক ভেতর থেকে পাওয়া, লেখা ও ডিজাইন ছাপানোর সুবিধা আছে।

খাবারের প্যাকের প্লাস্টিক ঃ উপরোক্ত গুণসম্পন্ন সব প্লাস্টিকই খাবার প্যাক বা বহন করার জন্য চলতে পারে। তবে একটা অসুবিধা আছে, খাবারের জল, অম্ল, অ্যালকোহল জাত দ্রাবক প্লাস্টিক থেকে কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য টেনে নিতে পারে যেমন, মনোমার (যে মূল দ্রব্য পলিমারাইজ করে তখনও প্লাস্টিকে পরিবর্তিত হয়নি) এবং দরকারে মেশানো দ্রব্য যাদের পরিমারাইজ করার কথা নয়—অপরবির্তিতই থাকে (রং, অস্বচ্ছকারক, ক্যাটালিস্ট, এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, স্টেবিলাইজার ও প্লাস্টিসাইজার)। এই শ্রেণীগুলির দ্রব্য সাধারণত বিষাক্ত। সুতরাং এদের মধ্যে যাদের বিষক্রিয়া কম এবং দ্রাব্যতা কম এদেরই ব্যবহার করা হয় খাবার প্যাকেট প্লাস্টিকে। খাবার ও জল প্যাক করার জন্য কয়েকটি প্লাস্টিকের কম্পোজিশন ব্যুরো অব্ ইন্ডিয়ান ষ্ট্যান্ডার্ডস (বি আই এস) ঠিক করার পর এদের জন্য কয়েকটি প্লাস্টিকের কম্পোজিশন ব্যুরো অব্ ইন্ডিয়ান ষ্ট্যান্ডার্ডস (বি আই এস) ঠিক করার পর এদের থেকে দ্রবণের সর্ব্বোচ্চ সীমাও বলে দেওয়া হয়েছে। এই ষ্ট্যান্ডার্ডগুলো আইনকারী সংস্থাও (স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক) গ্রহণ করেছে। সেইজন্য এগুলি আইনের আওতায়। সুতরাং স্বীকৃত প্লাস্টিক, ষ্ট্যান্ডার্ড বলে দেওয়া কম্পোজিশন ব্যতিরেকে এবং দ্রব্য পদার্থ সীমার (মাইগ্রেশন) বেশী হলে আইনের পরিপন্থী হবে। খাদ্যও ভেজাল বলে গণ্য হবে। নীচের আই এস (ইন্ডিয়ান ষ্ট্যান্ডার্ডস) গুলো এই বিষয়ে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য খাবারের সংস্পর্শের জন। কি কি দ্রব্য দিয়ে প্লাস্টিক তৈরি হবে এবং মাইগ্রেশন কত হবে এগুলোতে বলা হয়েছে ঃ

(ক) 10142— ষ্টাইবিন পলিমার
(খ) 10146— পলিথিন
(গ) 10151— পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পি ভি সি)
(ঘ) 10910— পলিপ্রপিলিন
(ঙ) 11434— আয়োনমার
(চ) 11704— ইথিলিন এ্যাকবাইলিক এ্যাসিড (ই এ এ)

(ছ) 12252— পলি ইথিলিন টেরিথেলেট (পি ই টি)

(জ) 12247— নাইলন-৬

(ঝ) 13601— ইথিলিন ভিনাইল এ্যাসিটেট (ই ভি এ)

(ঞ) 13576— ইথিলিন মিথাক্রাইলিক এ্যাসিড (ই এম এ)

এছাড়া পাত্র সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বারণ আছে, যেমন—

(ক) জং ধরা পাত্র

(খ) এনামেল ধরা পাত্র যার থেকে এনামেল খসে পড়েছে অথবা জং ধরেছে

(গ) লোহা, তামা বা কাঁসা যাদের ভাল করে টিন করা হয়নি

(ঘ) এ্যালুমিনিয়াম যদি কাষ্ট এ্যালুমিনিয়াম, বাসনের জন্য এ্যালুমিনিয়াম এ্যালয়, রট্ এ্যালুমিনিয়াম-এর স্বীকৃত স্পেশিফিকেশন অনুযায়ী না হয়

(ঙ) পুরোনো পাত্র ব্যবহার করা চলবে না।

7.9 ডাল প্রযুক্তি

ডাল ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য উন্নতিশীল দেশের প্রধান খাদ্য। গরীব এবং নিরামিষাশীদের প্রোটিনের প্রধান উৎস। নানারকমের ডাল এবং অন্য লেগিউম, যেমন সীম জাতীয় খাদ্য, খুব দরকার খাদ্য। নানাভাবে খাওয়া হয়, তবে রান্না করে অথবা অঙ্কুরোদ্গমের পর খাওয়াই যুক্তিযুক্ত কারণ এতে এন্টি-এনজাইম বিশেষ করে এন্টি-ট্রিপসিন এবং আরও কিছু বিষয়কারী দ্রব্য নষ্ট হয়। দেখা গেছে, কাঁচা ডালের পুষ্টিমূল্য সেদ্ধ করা ডাল থেকে কম হয়। ডাল প্রোটিনের প্রধান সরবরাহক হলেও ডালের প্রোটিন নিম্নমানের, কারণ কোন কোন এসেন্সিয়াল এ্যামাইনো এ্যাসিড ডালে কম আছে। তবে খাবারের অন্যান্য প্রোটিনের উপস্থিতির জন্য ডালের প্রোটিনের উন্নতি হয়। যেমন—ভাত, অন্য ডাল বা লেগিউম, মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি। প্রাচীন কাল থেকেই ডাল সম্বন্ধে জানা যায়। কিডনী বীন মেক্সিকো গুহাতে পাওয়া গেছে, তারিখ ৪০০০ বিসি, প্রায় সেই সময়কারই মটর ডাল পিরামিডের ভিতর পাওয়া গেছে, অরহড় ও কলাই ডালের উল্লেখ বেদে আছে, পুজার প্রসাদ হিসেবে মুগ ডালের প্রচলন এবং খিচুড়ী ও প্রসাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ডাল সহজেই উৎপাদন করা যায়। ধান বা গম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডাল উৎপন্ন করা যায়। সার কম লাগে, জলও কম। ডাল লেগিউম জাতীয়, এরা নাইট্রোজেন ফিক্সেশন করতে পারে যাতে নিজ খাবারের পর জমির সারও আপনা থেকেই অনেক বেড়ে যায়। তাছাড়া ডালের ফলনও বেশী হয়।

গোটা ডালই পাওয়া যায় লেগিউমের বাইরের প্রথম খোসা ছাড়াবার পরই। এর পরে গোটা ডাল খাওয়া যেতে পারে, তবে গোটা ডালকে খোসা ছাড়িয়ে দুভাগ করার পর রান্না করেই খাওয়াই সুবিধা এবং এর প্রচলনও বেশী।

একে ত সহজলভ্য এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় সার্ব্বজনীয় খাদ্য, তাছাড়া ডাল প্রিয় খাদ্য, তৈরি খাবারে ডাল থাকবেই। এর প্রযুক্তিও খুব একটা কঠিন নয়। গ্রামাঞ্চলও সহজেই তৈরি করা যায় — খোসা ছাড়িয়ে এবং দুভাগ করে, যেভাবে ডাল সাধারণত খাওয়া হয়ে থাকে। এটি একটি সহজ এ্যাগ্রোইন্ডাস্ট্রী, কুটির শিল্পও হতে পারে।

গ্রামেও নিজে নিজে বা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ডাল মিল বা ডাল পেশাই কারখানা করা যেতে পারে। চাল

করার মতই ডাল তৈরি করার কাজ খুবই বিস্তৃত হতে পারে গ্রামেগঞ্জে। দিনে ১ থেকে ৭০ টন ক্যাপাসিটি কল দেশে প্রায়ড ২০,০০০ হয়ত আছে।

ডাল মিলিং ঃ দুই রকম প্রণালী আছে —শুখা ও ভেজা। দ্বিতীয়টিতে জলে ৪ ঘন্টা ভেজানোর পর তুলে লাল মাটি মাখানো হয়, সূর্যালোক ও হাওয়ায় শুকানো হয় ২ থেকে ৪দিন ধরে। শুকনো মাটি ছাঁকনি দিয়ে আলাদা করে মর্টার (বা টেকি জাতীয় বস্তুতে) অথবা চাক্কিতে পাউডিং বা পেশাই করলেই, সহজভাবে কাজ হয়ে যায়— ডিকর্টিকেশন এবং স্পিলটিং (খোসা ছাড়ানো এবং দুভাগ হয়ে যাওয়া) দুই হয়ে যায় সহজভাবে, এর সঙ্গে গ্রাম্য কর্ম্মব্যবস্থা বা খাদি প্রযুক্তির খুব মিল আছে এবং এটা সুপরিচিত। এই প্রক্রিয়াতে খোসাকে নরম ও খানিকটা আলগা হয়ে যায়। খোসা বেশী জল শোষণ করে যাতে ফুলে আলগা হয়। এই ভেজা প্রযুক্তি ফ্লশিট (ফিগার ১) দেখানো হয়েছে।

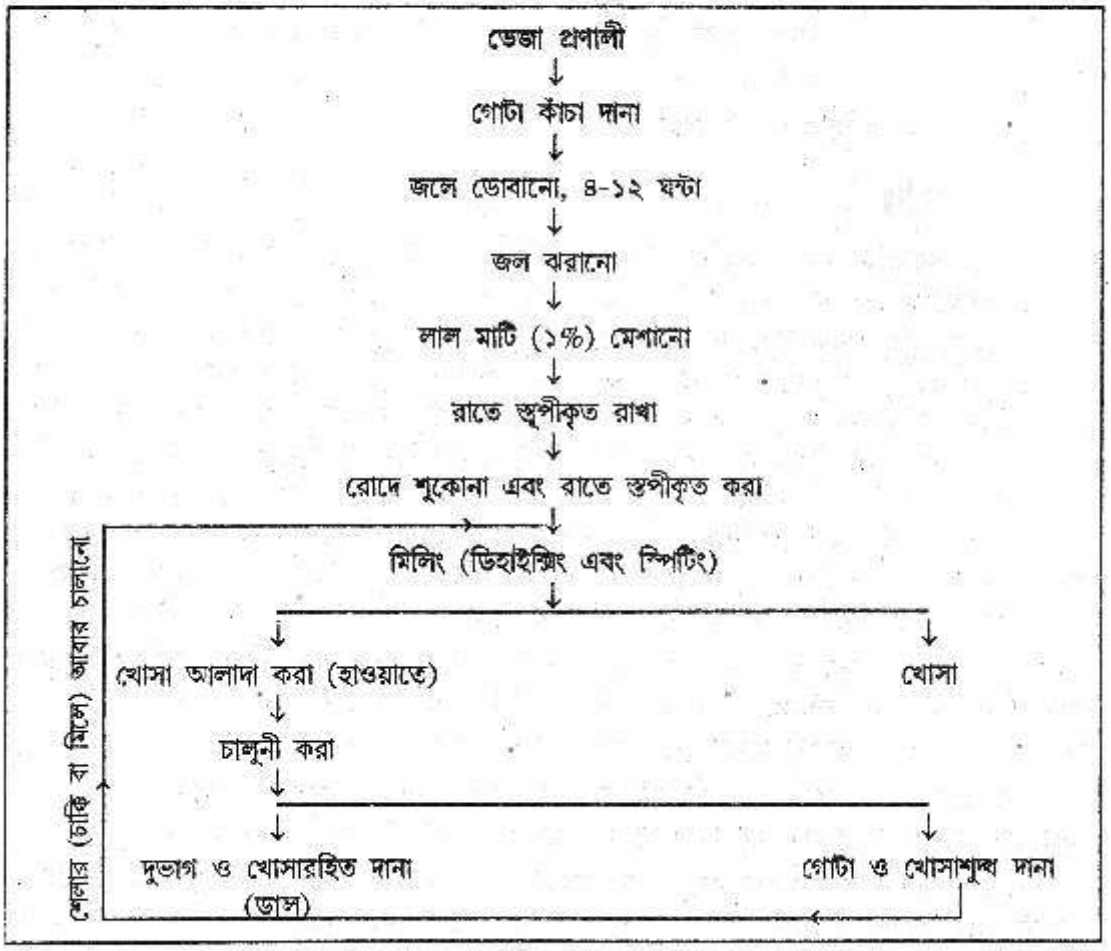

(ফিগার ১)

শুখা প্রণালী (ফিগার ২) এ তে দেখানো হয়েছে। গোটা ডাল পরিষ্কার ও সাইজ অনুযায়ী গ্রেডিং (ছাঁকনী দ্বারা) করার পর এমারী পাউডার লাগানো খসখসে রোলারের মধ্যে দিয়ে চালানো হয় যাতে খোঁচানো (পিটিং ও স্ক্র্যাচিং) হতে পারে, এতে পরের পদক্ষেপে তেল প্রবেশ করতে পারে। ১% (তেল (তিষি) মেশানো হয় গরম মিক্সার মেশিনে। তৈলাক্ত দানাগুলিকে পাতলা স্তরে বিছিয়ে সূর্যালোকে শুকোনোর জন্য রাখা হয় ২-৫ দিন। দানাগুলো রাত্রে স্তূপাকারে রাখা হয় যাতে তাপটা রক্ষা হয়। এরপর রোলার বা চাক্কি (আগেও বলা হয়েছে) তে দানাগুলো চালানো হয়। ৪০-৫০% দানার খোসা বেরিয়ে যায় এবং এদের বেশী পরিমাণই দুভাগ হয়ে যায়। ঘর্ষণের জন্যই ডি হাস্কিং হয় খোসাকে হাওয়ায় তোড়ে বা কুলো দিয়ে (ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে) সরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ছাঁকনি দিয়ে ডাল আলাদা করা হয় হাস্কড্ ঐ ডি-হাস্কড দানা থেকে। এদের আবার একদিন শুকানো হয়, জলে ভেজানো হয় এবং প্রক্রিয়াগুলো আবার (বা আবার) করা হয়। তাপ খোসাকে ভঙ্গুর করে দেয় যাতে সহজে আলাদা করা যায়।

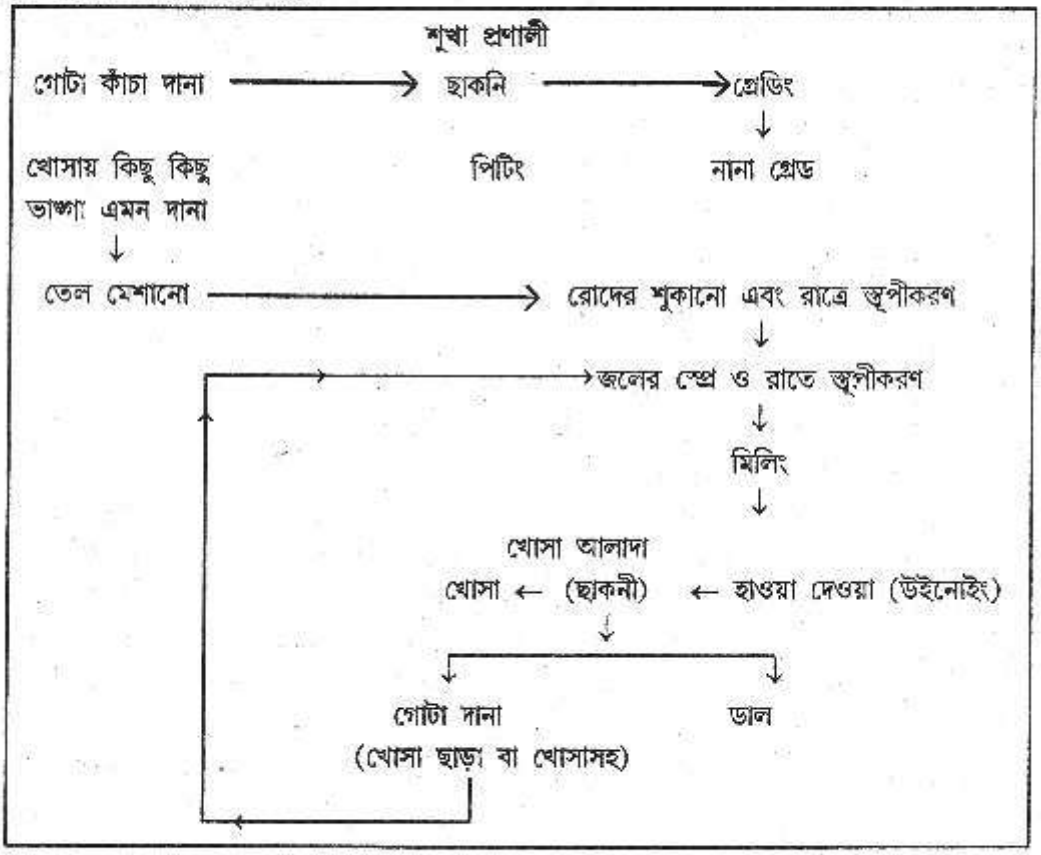

(ফিগার ২)

ভেজানো প্রক্রিয়ার সুবিধা হল ঃ ১৫-২০ বেশী ডাল, ভাল স্বাদ, সহজে খোসা ছাড়ানো প্রথমে জলে ভেজানোর জন্য, প্রচলিত শেলার বা চাক্কিতেই কাজ হয়। এই প্রক্রিয়ার অসুবিধা হল ঃ ডাল সিদ্ধ হতে একটু বেশী সময়

নেয়, ভাঙ্গে মাঝখানে একটু গর্ত্ত হয়ে যায়, পরিশ্রম সাপেক্ষ, সূর্যালোক নির্ভর এবং পাখী ও পোকা কিছু নষ্ট করে বাইরে রাখার সময়। পুরো প্রক্রিয়া ৫-৭ দিন নেয়, অল্প পরিমাণেই সামলানো যায়।

শুখা প্রক্রিয়ার সুবিধা সহজেই দানাগুলো নরম হয় ও রান্নার সময় কম লাগে এবং মেশিন বেশী ব্যবহার হয় বলে বেশী পরিমাণ ডাল উৎপাদন করা যায়। এর অসুবিধা ঃ বেশী নষ্ট হয় ভাঙ্গা ও পাউডার হওয়ার জন্য, বেশভ্জড় কয়েকবার রোলারের মধ্য দিয়ে যায় বলে এন্ডোস্পার্ম আলাদা হয়ে বেরিয়ে আসে। দাম বেশী পড়ে যায়, কারণ, বেশী ভাঙ্গা বেরোয় এবং বেশী সময় লাগে বারবার শুকানো এবং মিলিং-এর জন্য।

এই এই প্রক্রিয়াতে ডালের প্রাপ্তি ৭৩-৭৬% যেখানে গড়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ হওয়া উচিত ৮৮%। বাজারের ডালের দানার ৫৪% ধারগুলো ভাঙ্গা থাকে (চিপিং), এক ক্ষতি হয়, আর দানার জার্মও পাওয়া যায় না—দুই ক্ষতি ২-৫% হয়। অসমান শুকনো ভাঙ্গা ও চিপিং হয়, পাউডার হয়েও ক্ষতি হয়। বাইরে উঠোনে রাখার জন্য ক্ষতি ত হয়ই। দেখা যাচ্ছে ডাল মিলিং এখনও প্রাচীনতার উর্দ্ধে উঠতে পারেনি। হয়ত বিদেশে উন্নত দেশে ব্যবহার প্রায় হয় না বলে, উন্নয়নের ছোঁয়া খুব একটা লাগেনি। তবে ভারতবর্ষের পক্ষে রে উন্নতি এবং নিপুণতা খুবই দরকার কারণ পুষ্টিগতভাবে খুব দরকার বিশেষ করে গরীবদের জন্য। দেখা গেছে কনডিশনিং একটা খাদ্যপ্রযুক্তির বিশেষ প্রক্রিয়া (ধান ও গমে করা হয়ে থাকে) যাকে এই প্রযুক্তিতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। অন্য প্রক্রিয়া যেমন, ধোয়া, পরিষ্কার করা, শুকানো ভাঙ্গা, সেপারেশন ও প্যাকেজিং এগুলোতে যত পারা যায় মেশিন ও শক্তির ব্যবহার বাড়ানো দরকার।

ডাল থেকে অন্য দ্রব্য ঃ ডালের পরবর্ত্তী দ্রব্য হতে পারে—পাউডার (বেসন), টেক্সারাইজ দ্রব্য, এক্সট্রুডেড খাবার, বড়ি, পাঁপড়, মুগডালের মিষ্টি, টিনস্থিত খিচুড়ী এবং ডাল ইত্যাদি। ডাল ভারতবর্ষের বিশেষ নিজস্ব খাদ্য, এর প্রযুক্তিতে আরও অনেক উন্নতি দরকার আমাদের অনেক ট্র্যাডিশনাল খাবারও এর দ্বারা তৈরী হতে পারে যেগুলো রপ্তানীযোগ্য করা যায়। প্রোটিন আইসোলেট, প্রোটিন কনসেনট্রেট এবং ডাল ও এর পরবর্ত্তী দ্রব্যকে ভিটামিন ও লবণ দ্বারা এনরিচ বা ফরটিফাই করলে পুষ্টিগতভাবেও খুব লাভদায়ক হবে। এদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা প্রযুক্তি আছে, মোটামুটি সহজেই কুটির শিল্প পর্যায়েও করা যায়।

কোয়ালিটি কন্ট্রোল ঃ খাদ্য দানা হিসাবে ডালকে ধরা যায়। আইনে এর মান-এর স্পেসিফিকেশন আছে। এদের মধ্যে শেয়ালকাঁটা বা খেশারী, মেশানো রং, কিছু কিছু সম্ভাব্য কীটনাশকের বেঁধে দেওয়া অল্প পরিমাণের বেশী। এগুলি থাকবে না। তাছাড়াও গোটা এবং দুভাগ করা ডালে ময়শ্চার, ডাল ছাড়া অন্য জিনিস, অন্য খাদ্য দানা, নষ্ট হয়ে যাওয়া দানা, পোকা কাটা দানা, ইউরিক এ্যাসিড, আফলাটক্সিনসহ অন্য মাইকোটক্সিন, ইঁদুরের চুল ও মল এগুলো থাকবে না অথবা নির্দ্দিষ্ট স্বল্প পরিমাণ থাকতে পারবে। মানের জন্য ল্যাবটরীতে টেস্ট করতে হয়।

ডাল ছাড়া এদের তৈরী দ্রব্যেরও কিছু কিছু স্ট্যান্ডার্ড আছে। লেবেলিং এবং নামকরণেরও নিয়ম আছে।

7.10 মশলা প্রযুক্তি

নানারকমের মশলা ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট ব্যবসা ছিল প্রাচীনকাল থেকেই। এদের বাণিজ্য করে সমৃদ্ধিও হয়েছিল ; বিদেশীরা এদেশে এরই লোভে আসত যাতে ইতিহাস প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল। এখনও ভারতীয় রপ্তানী

বাণিজ্যে মশলার স্থান অগ্রগণ্য। ভারতে স্পাইস বোর্ড আছে ; চাষ, চাষ পরবর্ত্তী প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, রপ্তানী এবং গবেষণা করে থাকে। কোন কোন বিশেষ জমিতে, জঙ্গল ও জলা সন্নিহিত অঞ্চলে এবং বিশেষকরে গ্রামে নানারকমের মশলা উৎপাদন করা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে কেরালাতে কিছু কিছু বিশেষ মশলা যেমন এলাচি হয়, তবে কম বেশী সব প্রদেশেই কোন না কোন মশলা হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উত্তরবঙ্গে আদা, এলাচি হয় এবং দক্ষিণবঙ্গে লঙ্কা প্রচুর হওয়ার সুযোগ আছে।

কিছু প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করা হল যাতে উৎপাদনকারীরা সহজে কিছু কিছু সাধারণ প্রক্রিয়া করে বিশেষ করে শুকিয়ে উৎপাদিত দ্রব্যগুলিকে বিক্রয়যোগ্য করে রাখা যায়। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর প্রভাব অপরিসীম। একটা ড্রায়ার (কাঠচালিত হলেও) অনেক কাজ করতে পারে—সংগ্রহ পরবর্ত্তী প্রক্রিয়া, সংরক্ষণ, গুদামজাত করাতে, পরিবহণে, বিক্রী করাতে এবং বাজারজাত করাতে সাহায্য করতে পারে নিজস্ব অথবা পঞ্চায়েতের সহায়তায়। তবে বিদেশে রপ্তানী করতে গেলে উন্নত প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হবে ; তাহাও কঠিন নয়, ইচ্ছা থাকলে করা যায়। অনেক সময় প্রক্রিয়া করতেই হয় কারণ প্রক্রিয়াকৃত চেহারাই সাধারণে পরিচিত, একেবারে কাঁচা দ্রব্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

পরিষ্কার করা এবং ধোয়া ঃ জল দিয়ে ধোয়া দরকার। পরিষ্কার জল অবশ্য দরকার। মানুষের পানীয় জল (মিউনিসিপ্যাল সাপ্লাই) হলেই ভাল। ক্লোরিন দেওয়া জলই বাঞ্ছনীয়, বীজাণু এবং ছত্রাকের স্পোর শুধু ধোঁয়াতেই যাবে না, ক্লোরিন এদের নষ্ট করেও ফেলবে। তবে পানীয় জলের মতই উদ্ধৃত ক্লোরিন যেন খুব বেশী না থাকে। ধুলোবালি ও ধোয়ার জন্য লেগে থাকবে না। প্রেশারে জল হলেই ভাল, যেমন রবার পাইপে জোরে হলেই ভাল। ধোয়ার নানারকমের প্রক্রিয়া হতে পারে ; ব্যাচ বা কন্টিনিউয়াস। কেনা বা দরকার মত তৈরী করা চলতে পারে। কোন কোন মশলাতে যেমন আদা আংশিক খোসা ছাড়ানো দরকার হয় ; যান্ত্রিক হতে পারে ঘর্ষণ প্রক্রিয়া দ্বারা। এই রকম কোন কোন মশলা যেমন লংকা একটু একটু খুঁচিয়ে দিতে হয় সূঁচের মত ধারালো খোঁচা দিয়ে লম্বালম্বি বা এদিক ওদিক চিড় দিয়ে, এতে শুকোনো ভাল হয়। শুকোনো একটা খুব দরকারী প্রক্রিয়া প্রায় সব ক্ষেত্রেই লাগে। সংগ্রহ-পরবর্ত্তী প্রযুক্তি এবং গুদামজাত করার পূর্ববর্ত্তী দরকারের জন্য। এর আগে আরও কিছু কিছু প্রক্রিয়া করা হয় মশলা ভেদে।

ব্লাঞ্চিং ঃ হলদি এবং আদা ত গরম জলে কয়েক মিনিট সিদ্ধ করা হয়। এতে অনেক সময় শুকোবার সময় কমে, বীজাণু ও ছত্রাক মরে যায়, রং কখন কখন কিছুটা পরিবর্ত্তিত হয়ে রং এর স্থায়িত্ব আসে, এনজাইম নষ্ট হয়েও ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তন থেমে যায়, এবং স্টার্চ আংশিক জিলেটিন হয় বিশেষ করে উপর উপর যাতে খুব পরিবর্তন না হয়েও বাইরের একটা শক্ত আবরণের সৃষ্টি করে। লংকাতে পাঁচ মিনিটের স্টিম ট্রিটমেন্ট দিলে বোঁটা সহজে পড়ে যায় না এবং রং ও পাক থাকে।

অন্যান্য প্রক্রিয়া ঃ সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শুকানোর আগে এই এই প্রক্রিয়াগুলো করা হয়ে থাকে ঃ ধোয়া এবং পরিষ্কার করা, পিলিং, প্রিকিং, ব্ল্যাঞ্চি, এ্যালকালী ট্রিটমেন্ট এবং এ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ট্রিটমেন্ট (যেমন প্রয়োজনমত কোন বিশেষ এ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বা পটাশিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট দ্বারা) এগুলি করা দরকার। এলাচির ফিকে সবুজ রং ক্লোরিফিলের জন্য ; ক্লোরোফিল ফটো-সেন্সেটিভ আলোতে নষ্ট হয়ে যায় বলে। এ্যাল্‌কালী যেমন সোডা ট্রিটমেন্ট এতে ভাল কাজ করে। লঙ্কাতেও ভাল, বিশেষ করে পরে অলিভ তেল বা বাদাম তেল লাগিয়ে নিলে। এই খাদ্য তেলগুলি লংকা এবং গোলমরিচেও ব্যবহার করা হয় বলে তেলের পরিমাণ তৈরী জিনিস বিক্রীর সময় যাতে বেশী না হয় তার বিধান স্পেফিকিশনে আছে। সাদা চূণের ট্রিটমেন্ট পায় বলে যাতে চূণের

পরিমাণ খুব বেশী না হয় তারও বিধান আছে। লাল লংকা এ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ট্রিটমেন্ট পেলে রং উজ্জ্বল থাকে বেশী সময় রংগুলো ক্যারোটিনয়েড বলে অক্সিজেনে সহজে নষ্ট হয়ে যেতে পারে যদি এ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ট্রিটমেন্ট নাহয় বা কম অক্সিডেন্টে রাখা না হয় নাইট্রোজেন বা কার্বন ডাইঅক্সাইড সহযোগে।

অনেক সময় ব্লিচিংও করতে হয়। যেমন, ছোট এলাচি সালফার ডাইঅক্সাইড বা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দ্বারা ব্লিচ করা হয় যাতে পরিষ্কার ক্রীম রং পাওয়া যায়।

ড্রায়িং ঃ সূর্যালোকে শুকানো (বাতাস সহযোগেও) একটা খুবই পুরোনো এবং আদিম প্রক্রিয়া। এর প্রয়োজন এখনও আছে। তবে সোলার ড্রাইং (অনেক রকম আধুনিক সোলার ড্রায়ার ডিজাইন করা হয়েছে এবং বাজারেও পাওয়া যায়) একটা নতুন প্রয়োগ অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহারের ; সরকার এর জন্য শুধু পৃষ্ঠপোষকতা নয় নিজেও প্রচার করে থাকে।

সূর্যালোক না থাকলে বা আলোক না দিয়ে (আলোকে অনেক সময় ব্লিচিং বা রং নষ্ট হয়ে যায়) শুধু তাপ নিতে চাইলে, উনুন জাতীয় জিনিষের উপর মাটির প্ল্যাটফর্ম করে শুকানোর রেওয়াজ আছে।

ড্রায়ার প্রযুক্তি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটা খুব প্রসিদ্ধ বিষয়। কিছু ফিয়োরী আছে এবং অনেক রকমের ড্রায়ার জানা আছে। দরকার মত ড্রায়ার কেনা যায় বা তৈরী করানো যায়। তবে, সাধারণভাবে ছোট কারখানায় ব্যবহার করা যায় অথবা গ্রামে সহজেই চলতে পারে এমন ড্রায়ার হতে পারে জ্বালানী কাঠে চলে এমন যন্ত্র। জ্বালানী ব্যবহার যদিও পরিবেশদুষণ ঘটাতে পারে (গ্রীনহাউস গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরী হওয়ার জন্য এবং কাঠ ব্যবহার বনসৃজনের অন্তরায় বলে) তবুও কাঠ জ্বালিয়ে ড্রায়ারের কাজ করা সুবিধাজনক। ড্রায়ার আরও অনেক কাজে লাগে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের সুবিধার জন্য। ধান, গম, ফল, সব্জী, মাছ, মাংস ইত্যাদি সবের জন্যই ড্রায়ারের কাজ আছে ; ময়শ্চার কমিয়ে দেওয়ার জনয (অনেক ক্ষেত্রেই যে সর্বোচ্চ পরিমাণ আইনত বাঁধা আছে ; স্পেসিফিকেশনে), ইন্টারমেডিয়েট ময়শ্চার খাবার তৈরীর জন্য এবং সাধারণভাবে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য। ড্রায়ারকে সেই জন্য মাল্টি-ইউটিলিটি বলা হয়। বিশেষ করে গ্রামে সাধারণ খাদ্য প্রযুক্তির ব্যাপারে।

আরও পরিষ্কারকরণ ঃ শুকনোর পরে আবার পরিষ্কার করা দরকার হয় ; বিশেষ করে যেখানে জল দিয়ে ধোয়া হয়নি। দুইটা প্রক্রিয়া করা যেতে পারে—ধুলোবালি ও বৃক্ষাংশ আলাদা করা বা ঝেড়ে ফেলার জন্য হাওয়া সহায় প্রক্রিয়া এবং ছাঁকনি দ্বারা এবং আবার ছাকাই গ্রেডিং করার জন্য। গতিযুক্ত হাওয়ার ব্যবহার ধান ও তুষ আলাদা করার জন্য গ্রামে ব্যবহৃত কুলো নাড়িয়ে। মেশিন ও ইঞ্জিনিয়ারিং নানা ডিজাইনের দ্বারা করা হয়। বিভিন্ন গতির হাওয়া কমপ্রেশার করে দিতে পারে ; সেই হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যায় বিভিন্ন দূরত্বে মিশ্রণের জিনিসগুলোর আপেক্ষিক স্পেসিফিক গ্র্যাফিটির পার্থক্যের অনুযায়ী। একে নিউমেটিক ক্লিনিং বলা হয়।

বিভিন্ন মেশের ছাঁকনি মেশিনে নাড়ালে আপেক্ষিক সাইজ অনুযায়ী পৃথক হয়ে যায়। এতে পাতা, বৃক্ষাংশ ইত্যাদি আলাদ হয়ে পরিষ্কার করে, তাছাড়া আকার অনুযায়ী ভাগ ভাগ হয়ে গ্রেডিং হয়ে যায়—ছোটবড় সাইজের।

ডিসইনফেকশন ও পেস্টিসাইড ট্রিটমেন্ট ঃ পেস্টিসাইড সোজাসুজি সংগ্রহ-পরবর্তী প্রক্রিয়া করা মশলায় দেওয়া যায় না ; কেবলমাত্র চাষের সময় বা জায়গায় ব্যবহার করা যেতে পারে ; তাও সম্পতিপ্রাপ্ত কীটনাশকই ব্যবহার করা হয়। তবে কিছু কিছু ধোঁয়া উৎপন্নকারী কীটনাশক (ফিউমিগেন্ট) ব্যবহার করা যেতে পারে। এইগুলো গ্রহণযোগ্য, কারণ এদের রেসিডিউ বেশী থাকে না এরা উদ্বায়ী বলে, যেমন সালফারের ধোঁয়া, ইথিলীন ডাই-ব্রোমাইড, মিথাইল ব্রোমাইড (ডিওরুফিউম) এবং এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড (যার থেকে বীজাণুমারক ফসফিন গ্যাস তৈরী হয় ময়েশ্চারের সহায়তায়)।

আয়োনাইজিং র‍্যাডিয়েশন ঃ এক্স-রে অথবা গামা-রে দিয়ে খাদ্যদ্রব্যকে জীবাণু ও ছত্রাক থেকে মুক্ত করা যায়। যেহেতু মশলা অল্পই ব্যবহার হয় জীবাণু হয়ত দৃশ্যত কোন আপত্তিকর বিরূপ প্রক্রিয়া করে না ; ভেজা এবং গ্রীষ্মের তাপে রাখার ফলে ছত্রাক সংক্রমণ হতে পারে। তাছাড়া তাপ দেওয়া বা রান্না করা খাবার ছাড়াও কাঁচা মশলা ব্যবহার করারও রেওয়াজ আছে। সুতরাং একেবারে ষ্টেরিলাইজ না করলেও কম জীবাণু থাকা নেহাৎ দরকার। ছত্রাকের দেখা পাওয়া গেলে সাবধান হতেই হবে কারণ কোন কোন ছত্রাক আফলাটক্সিন-এর মত কোন কোন মাইকোটক্সিন তৈরী করে ; এই টক্সিনগুলো খুব বিষকারী।

তবে রপ্তানীর জন্য মশলা বীজাণুমুক্ত হতে হবে, যাতে করে মাইক্রবায়লজি বিশ্লেষণে কোন বীজাণুর উপস্থিতি ধরা না পড়ে। মশলা ত তাপে ষ্টেরিলাইজ করা যাবে না, কারণ গন্ধ ও ফ্ল্যাভার তাপে উদ্বায়ী হয়, যে কারণে মশলা ব্যবহার করা হয় সেটাই থাকল না।

আয়োনাইজিং র‍্যাডিয়েশন-এর কাজের জন্য বিশেষ অইন আছে—ভেজাল নিবারণ আইন এবং এ্যাটমিক এনার্জী খাবার ইর‍্যাডিয়েশন কন্ট্রোল) রুলস। এর জন্য লাইসেন্স নিতে হয়। কোবাল্ট ৬০ এই ব্যাপারে ব্যবহার করা যেতে পারে। ষ্টেরিলাইজ ছাড়াও, এই ইর‍্যাডিয়েশনে সম্ভাব্য অঙ্কুরোদ্গমও বন্ধ করতে পারে।

পাউডার ও পেষ্ট ঃ মশলা বেটে পেষ্ট করে ব্যবহার করা হয় বলে, ব্যবহার সহজ করার জন্য পাউডারের প্রবর্ত্তন হয়। পরিষ্কার ও শুকনো মশলা গুঁড়ো করা যেতে পারে। বল মিল, টিউব মিল বা অন্য গ্রাইন্ডিং মেশিন জাতীয় প্রচলিত মেশিন ব্যবহার করা হয়, তারপর ছাঁকনি সূক্ষ্ম মেশেরু। পাউডার নষ্ট হয় না, তবে অনেকদিন থাকলে বা ভালভাবে না রাখলে পাকা বা ছাতা ধরতে পারে। পাউডার বেশ সূক্ষ্ম ধরা হয় বলে মশলার কোষ ও গ্লান্ড ভেঙে যায়, সুতরাং উদ্বায়ী গন্ধদ্রব্য আস্তে আস্তে বেরিয়ে যেতে পারে ; ফলে ফ্ল্যাভার নষ্ট হবে। সেই কারণে এবং উচ্চ তাপে পাউডারে বিস্ফোরণ হতেও পারে, সুতরাং পাউডারের মেশিনকে ঠান্ডা রাখতে হয় কুলিং-এর সাহায্যে। উন্নতির কারণে, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড ক্রায়োজেন হিসাবে ব্যবহার করে খুব নিম্নতাপে রাখা হতে পারে, এই রকম গবেষণালব্ধ জ্ঞান পাওয়া গেছে।

সম্প্রতি পেষ্টও তৈরী করা হয়েছে ; জল থাকার জন্য ফার্মেন্টেশন ও রাসায়নিক কারণে যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য আইনে স্বীকৃত প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা নেহাৎ দরকার।

পাউডার এবং পেষ্ট হওয়ায়, কয়েকরকম মশলা মিশিয়ে এক জায়গায় করে মিশ্রণ করা যেতে পারে। কারী পাউডার নামক জিনিস আগে থেকেই আছে, আজকাল কারীপেষ্টও তৈরী হতে আরম্ভ করেছে। দুইই আবার বিভিন্ন রান্নার নামে ঐ রকম মিশ্রণ করে মাছ, মাংস, কালিয়া, কারী ইত্যাদির পাউডার বা পেষ্ট বাজারজাত করা হচ্ছে।

প্যাকেজিং ঃ পাউডার বা পেষ্ট হলে তা কথাই নেই, গোটা মশলাতেও আজকাল নিয়মমত প্রচলিত প্যাকিং করা দরকার। বড় প্যাক হলে বোর্ড, কাগজ, কাপড়, পাটের বোনা দ্রব্য কাঠ ব্যবহার করা হয়। ছোট এবং রিটেল প্যাক কাচ, বা বোর্ড করা যায়। আজকাল কিন্তু ছোটবড় দুই এতেই প্লাস্টিক (ফ্লেক্সিবল, রিজিড, ফ্লিম বা লেমিনেট ভাবে) ব্যবহৃত হয়। তবে আইনে স্বীকৃত প্লাস্টিক কম্পজিশনই ব্যবহার করা যাবে। প্লাস্টিকে কিছু কিছু সুবিধা আছে যেমন, পাতলা, অনেক সময় স্বচ্ছ— ভেতরে দেখা যায়, প্রিন্ট তা করা যায়ই এমবস্‌ও করা যায় ইত্যাদি।

ফুড সাপ্লিমেন্ট ও নিউট্রাসিক্যাল ঃ ফুড সাপ্লিমেন্ট হিসেবে আজকাল মশলাকে দেখে আরও সফিস্টিকেশন আনা হতে পারে মশলার ব্যাপারে।

কোন কোন মশলা বা ঔষধিকে নিউট্রাসিটিক্যাল হিসেবে আরও গুরুত্ব দেওয়া হতে আরম্ভ হয়েছে।

স্পেসিফিকেশন ঃ প্রত্যেক মশলা ও তৈরী দ্রব্যের স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন আছে ; এগুলো আইন মাফিক হতেই হবে। কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিশ্লেষণ এর প্রমাণ দেবে। তাছাড়া, কারখানার জন্য লাইসেন্স, লেবেলিং-এর জন্য আইনও আছে, অবশ্যি রপ্তানিরও।

7.11 সারাংশ

খাদ্য প্রযুক্তি বিষয়ে আংশিক আলোচনা করা হয়েছে। খাদ্যবিজ্ঞান যার মধ্যে পুষ্টি ও জীবনবিদ্যা বিজ্ঞানও আছে এর ফলিত প্রয়োগ প্রযুক্তিতে। খাদ্য ত মানুষের কর্ম্মকাণ্ডের বড় অংশ ; তাই খাদ্য প্রযুক্তি সবচেয়ে বড় ইন্ডাস্ট্রী। দরকার মত এই ইণ্ডাস্ট্রীর কোন কোনটি নিয়ে কাজ করা যেতেই পারে। খাদ্য সংরক্ষণের দরসব দিক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে, এমনকি তেজস্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহার এবং কন্ট্রোল ও পরিবর্তিত বায়ুর আবহাওয়াতে মিল করা প্যাকেজে টাটকা অবস্থায় সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

ফল, খাদ্যশস্য, বেকারী, এক্সট্রুডেড এক্সপান্ডেড খবার, এবং মিষ্টান্ন এদের ইণ্ডাস্ট্রী সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি স্তরের শিল্প সংস্থাপন করা সম্ভব এও বলা হয়েছে।

7.12 অনুশীলনী

(1) খাদ্য কি কি কারণে নষ্ট হতে পারে? নষ্ট হওয়ার প্রতিকার কি?

(2) আয়োনাইজিং রশ্মি কি? এতে খাদ্য ব্যাপারে কি কি সুবিধা হতে পারে?

(3) আবহাওয়া কিভাবে করে কন্ট্রোল ও পরিবর্ত্তিত করে সংরক্ষণ হয়?

(4) জেলির স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন তৈরী করতে গেলে কি কি সম্ভাব্য প্যারামিটারের প্রয়োজন হতে পারে?

(5) গ্রামে একটি বেকারীর চুল্লি তৈরী করালে এতে কি কি খাবার তৈরী করা যেতে পারে?

(6) এক্সট্রুডেড খাবারের সুবিধা কি?

(7) ট্র্যাডিশনাল খাবার কি? এই খাবারের সুবিধা কি হতে পারে?

7.13 গ্রন্থপঞ্জী

1.Ranken, M.D. *Food Industries Manual*, 1984, Leonard Hill, London, 21 Edn.

2.Ghosh, U., Choudhuri, D.R., Gangopadhyay, H. : *Controlled & Modified Atmosphere Storage Studies on Fruits, Vegetables & Flowers*, 2 vols., 1997, FTBE, Jadavpur University, Kolkata.

চতুর্থ পত্র - গ

টেলারিং

1. সুরক্ষার নিয়ম

ওয়ার্কশপে কাজ করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করা উচিত। কারণ তাতে মেশিনকে এবং জিনিষপত্রের ক্ষতি বাঁচানো যায়।

১। হাত সেলাই করার সময় মুখে সূচ রাখা উচিত নয় কারণ নিঃশ্বাসের দ্বারা সূচ পেটের ভিতর চলে যেতে পারে। সূচে সুতো পরিয়ে কাপড়ে আটকে রাখা উচি।

২। হাত সেলাই করার সময় আঙ্গুলে আঙ্গুলি ত্রাণ অবশ্যই পরা উচিত। কারণ তাতে সূচ ফোটার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে।

৩। ইলেকট্রিক ইস্ত্রিতে কাজ করার সময় খুব সাবধানে কাজ করা উচিত। প্রেস করার সময় খুব সাবধানে কাজ করা উচিত। প্রেস করার সময় রবার সিট বা কাঠের তক্তার উপর দাঁড়িয়ে কাজ করা উচিত। আর টেবিলের খুব কাছে ঘেষে দাঁড়ানো উচিত নয়।

৪। প্রেস করার আগে তার পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত, যে তার বাইরে আছে কিনা যদি জরি বা কটন কভার থেকে।

৫। তার বেরিয়ে যায় তাহলে সেই তার আর ব্যবহার করা উচিত নয়।

৬। ভাঙ্গা প্লাগ তার কানেকটরের কাজে লাগানো উচিত নয়। তাকে বদলে দেওয়া উচিত।

৭। পাওযার মেশিনে কাজ করার সময় যদি মেশিনে সক দেয় তাহলে তাতে কাজ করা উচিত নয়।

৮। মেশিনটি রোজ ভালো করে মুছে তেল দেওয়া উচিত। কাজ করবার সময় জায়গা ভালো করে পরিস্কার করে নেওয়া উচিত কারণ তাতে কাপড়ে ধুলো বা তেল লাগতে পারে।

৯। প্রাক্টিকাল করার সময় ওভার ওয়েল পরে কাজ করা উচিত।

১০। ওয়ার্কসপের মেঝেতে কোন তেল তেলে জিনিষ যেন না থাকে, যেমন-তেল, গ্রীজ ইত্যাদি।

১১। ওয়ার্কসপে কোন দুর্ঘটনা হবার পর প্রশিক্ষণ ইনচার্জকে সাথে সাথে জানানো উচিত কারণ তাতে শীঘ্রই প্রতিকার হতে পারে ।

১২। সচ্ছতা দীর্ঘায়ু দেয় সে জন্য নিজের ওয়ার্ক সপের ক্লাস রুম সব সময় স্বচ্ছ রাখা উচিত।

2. কাটিং টেলারিং এর ধারণা

ক) কার্টিং ঃ আজকাল মানুষেরা যেমন বেশভূষায় থাকে, প্রাচীন কালে এরকম ছিল না। নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় প্রাচীন কালে মানুষ সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় থাকতো। প্রকাণ্ড দালান, প্রাসাদ বা ছোট ঘরও ছিল না। জঙ্গালের ভিতর গাছের ডালে অথবা পাথরের গুহায় তারা বাস করত। ধীরে ধীরে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবনেরও পরিবর্তন আরম্ভ হল। গাছের ছাল বা পশুর ছাল দিয়ে তারা তাদের লজ্জা নিবারণ করতে চেষ্টা করলো। সেই সময় থেকেই মানুষের বুদ্ধির বিকাশ শুরু হল, খাদ্যের পরেই বস্ত্র মানুষের জীবনের প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু এর পর মানুষ কার্পাস উৎপাদন করতে লাগলো এর থেকে সুতো এবং সুতো থেকে কাপড় প্রস্তুত করতে লাগল। এই কাপড় মানুষ ভিন্ন পরিধিতে জরিয়ে সময় কাটাতে লাগলো। এতে মানুষ আনন্দ পেত ঠিকই কিন্তু মানুষের অসুবিধাও হত। তাই কাপড় মাপ

অনুযায়ী সেলাই করা প্রয়োজন হল এবং এই কাজ যারা করত তারা দর্জি নামে পরিচিত হল।

খ) টেলারিং ঃ এটি একটি কলা বিদ্যা। মানুষের নগ্ন দেহকে আবৃত রাখতে ও বিভিন্ন প্রকারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়া যেমন শীত, গ্রীষ্ম ইত্যাদির থেকে মানুষের দেহকে রক্ষা করতে এবং সতেজ রাখতে বিভিন্ন ধরনের পোশাক তৈরি হয়, তাছাড়া বিভিন্ন মহাদেশের মনুষ্য জাতির সামাজিক পরিচয়ও পাওয়া যায়। ভিন্ন ধরনের পোশাক ব্যবহারে ধুতি, পাঞ্জাবী পরিহিত দেখলেই আমরা বুঝতে পারি উহারা বাঙ্গালী। কোট, প্যান্ট সজ্জিত কোন ব্যক্তিকে দেখলেই আমরা দেখামাত্র উপলব্ধি করতে পারি তিনি পাশ্চাত্য দেশীয়। ভারতের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে পোশাকের স্থান অতি উচ্চ। ভিন্ন রাজ্য ভিন্ন পোশাকের দরুণ সহজেই বোঝা যায় যে ব্যক্তিটি কোন রাজ্যের। আবার আমাদের সমাজ জীবনের সভ্যতা, ভদ্রতা, কৃষ্টি সাধন ও বিভিন্ন রুচি প্রকাশে যথেষ্ট অবদান আছে। অতীত কালে যারা টেলারিং বিদ্যা লাভ করে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাত তাদের সীবন শিল্পী নামে অবিহিত করা হত। এই শিল্পীরা অতীত কালে নিখুঁত চোখের দৃষ্টি আর হাতের মাপ অনুযায়ী কাজ করত। ক্রমে গীগা, ইঞ্চির মাপ প্রয়োজন হল অতীত কালে একটি লোকের পক্ষে এই কলা বিদ্যা নিখুঁত ভাবে শিখতে দশ থেকে পনেরো বছর সময় লাগতো। কারণ সেই সময় কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ চিত্র অঙ্কন ও দেহের বিভিন্ন মাপ অনুযায়ী এই কাজ করা হত না। প্রকৃত টেলার বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি ভালো কাটতে, সুন্দরভাবে সেলাই করতে এবং সুন্দর ফিটিংস আনতে পারে। এছাড়া টেলারের কতগুলি বিশেষ গুণে গুনান্বিত হতে হবে। যেমন-উপস্থিত বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি, অঙ্কন বিদ্যা, গণিত বিদ্যা ইত্যাদি।

ক) পরিচয় ঃ প্রাচীন কাল থেকে মানব শরীরের জন্য তিনটি বস্তুর অত্যন্ত প্রয়োজন হয়। যেমন-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। খাদ্য এবং বাসস্থান আমাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তার থেকেও বেশী বস্ত্রের প্রয়োজন আমাদের জীবনে আছে। খাদ্য এবং বাসস্থান ছাড়া দু একদিন থাকা যায় কিন্তু আধুনিক যুগে আমরা বস্ত্র বিনা এক মুহূর্ত থাকতে পারি না। আদিম কালে মানুষ শরীর ঢাকার জন্য জানোয়ারের চামড়া আর গাছের ছাল ব্যবহার করত কিন্তু আজকের সভ্য বিকাশশীল সমাজে বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা বস্ত্রকে সেলাই করি। এর জন্য আমাদের কাটা এবং সেলাই এর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

খ) সেলাই এবং কাটা-এর পরিভাষা ঃ মানুষের শরীরের গঠন অনুসারে মাপ নিয়ে কাপড় কাটাকে কাটিং বলে। তারপর কাটা টুকরোকে এক সঙ্গে সেলাই করাকে টেলারিং বলে। কাটা আর সেলাই দুই বস্ত্রের মুখ্য অঙ্গ বলে।

আবশ্যকতা ঃ

ক) আর্থিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঃ আধুনিক যুগে প্রতিটি জিনিষের দাম এত বেশী যে বেশীর ভাগ মানুষ দিন চালাতে অসুবিধায় পড়ে। দর্জির মজুরি এত দিতে হয় যা কাপড়ের দাম থেকেও বেশী হয় যদি আমরা নিজে সেলাই করতে না জানি তাহলে দর্জি দিয়ে সেলাই করতে হয়। আর যদি সেলাই করতে জানি তাহলে সেলাই করে কিছু পয়সা বাঁচানো সম্ভব হয়।

খ) সময় বাঁচে ঃ যদি আমরা কাপড় সেলাই এর জন্য দর্জির কাছে দিই দর্জি আমাদের কিছু দিন পরে কাপড় নিয়ে যেতে বলে কিন্তু তার পরেও সময় মত কাপড় পাওয়া যায় না। এতে আমাদের সময় ও পয়সা দুইই নষ্ট হয়। যদি আমরা সেলাই করতে পারি তাহলে সেলাই এর পয়সা বাঁচে।

গ) পুরানো বস্ত্রের নতুন রূপ দেওয়া ঃ সেলাই শিখলে আমরা ঘরের পুরোনো কাপড়কে নতুন নিয়মে বানিয়ে তাকে পরবার যোগ্য করে তুলি। এতে কাপড় বরবাদ হয় না তাকে পরবার যোগ্য করে তুলি।

ঘ) পয়সা উপায়ের রাস্তা ঃ আধুনিক যুগে সেলাই জানলে অত্যাধিক লাভ হয়। সেলাই করে পুরুষেরা তাদের পরিবার চালাতে পারে, মেয়েরা এই কাজ করে জীবনকে সুখী ও সরল করতে পারে। এতে পয়সা বাঁচে এবং উপার্জনও হয়। এছাড়াও এই লাইনে সরকারি চাকরিও পাওয়া যায়।

ঙ) বস্ত্র যদি নতুন অবস্থাতেই ফেটে যায় তাকে আমরা তালি অথবা রিপু দ্বারা ঠিক করতে পারি অর্থাৎ তাকে আমরা আবার পরবার যোগ্য করে তুলতে পারি।

চ) বাঁচা কাপড়ের প্রয়োগ ঃ সেলাই এর জ্ঞান থাকলে আমরা বাঁচা কাপড়ের উচিত প্রয়োগ করতে পারি যেমন দুটি কাপড়ের ছোট টুকরোকে জুড়ে ডিজাইন দিয়ে ছোট বাচ্চার পোষাক করা যেতে পারে এছাড়াও অনেক কিছু করা যায়।

ছ) ঘরের সৌন্দর্য ঃ বাঁচা কাপড়ের টুকরো দিয়ে অনেক প্রকার জিনিস করা হয়ে যায় যেমন-পুতুল বানিয়ে তাকে সাজানো যায়। এছাড়াও ছোট ছোট পিস কুসন কভার, পিলো কভার, রেডিও কভার এবং ব্যাগ বানানো যেতে পারে।

জ) মনের পছন্দ অনুযায়ী বস্ত্রের প্রয়োগ ঃ সেলাই এর জ্ঞান থাকলে আমরা নিজের পছন্দ অনুযায়ী বস্ত্র তৈরি করতে পারি এতে নতুন নতুন ডিজাইন বানাতে পারি। বাঁচা কাপড়ের প্রয়োগ নিজের ডিজাইন অনুযায়ী করতে পারি যেমন সার্টের কলার বানানো যেতে পারে। হাতের পট্টিতে কালো কাপড় বানানো ইত্যাদি।

ঝ) আত্মগৌরবের অনুভূতি ঃ যখন আমরা পোষাক টেলারের কাছে সেলাই করি এত প্রসন্ন আসে না যতটা নিজে সেলাই করতে পারলে হয়, এতে নিজের উপর আনন্দ এবং বিশ্বাস জন্মায়।

ঞ) আত্মনির্ভরতা ঃ সেলাই এর জ্ঞান হলে আমরা আত্মনির্ভর হতে পারি। আমাদের যে কোনো বস্ত্র সেলাই করার জন্য। কারোর কাছে যেতে হয় না। যখনি বস্ত্রের দরকার হয় তখন আরা নিজেরাই করে নিতে পারি।

ভূমিকা ঃ যখন আমাদের সমাজে পোষাক কাটা এবং সেলাইয়ের কথা আসে তখন আমাদের মনে এর পূর্বের ইতিহাসের কথা জানবার ইচ্ছা হয়। তখন আমাদের জিজ্ঞাসা প্রবল ইচ্ছার রূপ দেয় যে আগে কি রূপের পোষাক ছিল এবং আধুনিক যুগে কি ভাবে এসে প্রভাব এসে পৌঁছেছে।

ক) আদিম যুগ ঃ আমাদের পূর্ব বংশধরেরা নগ্ন অবস্থায় থাকত, পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাত এবং মাংস পুড়িয়ে খেত তাদের বস্ত্রের জ্ঞান ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে সময়ের পরিবর্তনে সভ্যতার কিছু অঙ্গ সামনে এলো মানুষ দেখতো ঠিক না স্থিতিতে আনার চেষ্টা করতো। এই কলাকে বৈজ্ঞানিক রূপ বস্তুত যিনি দিয়েছিলেন তার নাম ছিল মিষ্টার বেস্কন। আজ আমরা দেখতেই পাই যে আজকাল বস্ত্র তৈরীর উপর বেসী মান দেওয়া হয় এই সব বিদেশী সভ্যতার দান কোর্ট, প্যান্ট, বুসর্সাট, ফ্রক, জিনসুট, কলার, কামিজ কোট ইত্যাদি যা কিছু বস্ত্র ধারণ করা হয় তা সবই বৈজ্ঞানিক নিয়মের দ্বারা করা হয়। আমরা শুধু নকলই করি না তার থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি। আজ ভারতে বড় বড় টেলর আছে।

খ) আধুনিক যুগ ঃ এই যুগকে বর্তমান যুগ বলা হয় ইংরেজরা ভারত ছাড়ার আগে বা পরে সমস্ত মেসিনারী পার্টস বিদেশ থেকে আনা হত কিন্তু ধীরে ধীরে সব মেশিনারী পার্টস এখানেই তৈরী হতে লাগলো এছাড়া আরও অনেক প্রকারের মেসিন যেমন-ইন্টারলক মেসিন, বোতাম লাগনোর মেসিন, বোতাম ঘর করার মেশিন ইত্যাদি সব রকম মেসিন এখানেই তৈরি হতে থাকে এই সব মেসিনের সঙ্গে সেলাই মেসিনের অনেক উন্নতি হতে থাকে এখন কার তৈরি কাপড় বিদেশে চালান দেওয়া হয় বিদেশে এগুলি খুবই পছন্দ সই হয়। আজকাল আমাদের দেশে কিছু নতুন প্রকার ডিজাইনের পোশাক ব্যবহার হয়, যেমন- মেয়েরা বেলবটন, টক ক্লেয়ার, স্কিবি ইত্যাদি ব্যবহার করে। ছেলেরা সার্ট, বেলবটন ইত্যাদি করে। এসব ড্রেস ছাড়া আমাদের জাতির পোশাক হল পুরুষদের জন্য ধুতি, পাঞ্জাবী আর মেয়েদের জন্য শাড়ী, ব্লাউজ ইত্যাদি।

নোট ঃ আজকাল ভারতবর্ষে অনেক নতুন নতুন তৈরি হয় ও নতুন নতুন পোশাকও উৎপন্ন হয়। মডার্ন ডিজাইন তৈরী করা হয় ও সেই ফিটিংসের উপর সব থেকে মনোযোগ দেওয়া হয়।

3. সেলাই মেসিন আবিস্কারের কাহিনী

দর্জির কাছে মেসিন একটি প্রয়োজনীয় বস্তু। প্রাচীন কালে পোষাক হাতের দ্বার তৈরি হত। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মেসিন আবিস্কার হয়। ফ্রান্সের Allieshoph নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন তার বিবাহ হয় তখন তারা দুজনে স্বামী স্ত্রী হাতের দ্বারা পোষাক সেলাই করে। যতদিন যেতে লাগল মানুষ নিজের সুবিধা বুঝতে লাগল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে Allieshoph একটা মেসিন তৈরি করে। ঐ মেসিন চৌকো আকৃতির ছিল। ঐ মেসিনের পার্টস কাঠের তৈরী ছিল। মেসিন তেরীর ফলে তাদের কাজে গতির বৃদ্ধি পেল। এই দেখে অন্যরা হিংসায় জ্বলতে লাগল কারণ তিনি অন্যদের তুলনায় বেশী উপার্জন করতেন। একদিন কিছু লোক হিংসায় তার বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিল। এবং তার কাঠের মেসিনও পুড়ে গেল। এরপর Allieshop ইউরোপ চলে যান। সেখানে গিয়ে লোহার মেসিন তৈরী করার কাজ শুরু করেন কিন্তু সেই মেসিন পূর্ণ হবার আগে তিনি পরলোক গমন করেন। ১৮৪৯ সালে এরপর Mr. Agrot Singer নামে এক ব্যক্তি নিজের নামানুসারে Singer মেসিন তৈরী করেছেন। লালা শ্রীরাম নামক ব্যক্তির কারখানা কলকাতায় ছিল। সেই কারখানার নাম জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী। বসির তার সাহায্য চান। লালাজী বসিরকে তার কারখানার ইঞ্জিনিয়ারিং করে রাখেন এবং লালাজী স্ত্রী ঊষা, সেই নামানুসারে ভারতে ঊষা নামে মেসিন ১৯৩৫ সালে বাজারে আসে।

4. বর্তমান যুগে সেলাই মেসিনের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ। আজকাল যে কাজ হয় তা সবই মেসিনের দ্বারা বৃটিশ রাজ্যের আগে সব কাজই হাতে সেলাই করা হত কিন্তু তাতে পুরোপুরি পরিচ্ছন্নতা আসত না ও স্নিগ্ধতা আসত না। আজকাল যে সমস্ত কাজ মেসিনের দ্বারা করা হয় তাতে পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন ও অল্প সময়ে অনেক কাজ করা যায়। এই জন্য সেলাই মেসিনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

5. মেসিনে সুতো পরাবার নিয়ম

মেসিনে সুতো পরাবার সময় প্রথমে স্পল পিনের উপর দিয়ে রিল বসিয়ে ফেস প্লেটের উপর দিয়ে টেনে এনে দিয়ে সুতোকে থ্রেট ডিভাইজের মধ্যে দিয়ে এবং নিডিলাবার আইলেটের মধ্যে দিয়ে সুতো এনে হাতে ধরে সূচের মুখে সুতো পরিয়ে নিতে হয়।

6. সেলাই শিক্ষার ক্ষেত্রে কি কি প্রয়োজন ?

সাধারণত সেলাই শিক্ষা করতে হলে প্রথমে ড্রয়িং করবার জন্য মিল্টন ক্লথ, আমরা স্লেটে যে ভাবে অঙ্কন করে মুছে ফেলি, দর্জি কাছে শিক্ষা করতে ও একরকম গরম কাপড় পাওয়া যায়-যার নাম মিল্টন ক্লথ এই ক্লথের উপর ড্রয়িং করলে

মুছে ফেলা যায় এই কাপড়ের উপর তাই ড্রয়িং করতে সুবিধা হয়। কোন পোশাক ড্রয়িং করতে না শিখলে তার গঠন সুন্দর করা যায় না। প্রত্যেক কাজেই অভ্যাস করা দরকার তা না হলে সহজে কাজ আয়ত্ব করা যায় না। সেলাই শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ হল - ফিতা বা মোজা, রিংটেপ, মেসিন, ছোট-বড় বিভিন্ন ধরণের কাঁচি, টেলার্স চক, হাত সূচ, আঙ্গুলি ত্রাণ, থিম বেল, এল স্ক্যয়ার, পিন, পুসান, ইস্ত্রি, ব্রাস, স্পঞ্জ, গামছা, ইস্ত্রি করার জন্য টেবিল, ট্রাউজার, স্কেল, আয়না, মার্কিন হুইল এম-ব্রয়ডারি, প্লেট, ফ্রেম, নিউজ পেপার, পেন, পেনসিল, স্লিপ বোর্ড ইত্যাদি। উক্ত জিনিস গুলি ছাড়াও মার্কেটে দোকান করতে গেলে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি প্রয়োজন সাইন বোর্ড, ফ্যাসান বুক, সোকেস, ট্রায়াল রুম, হ্যাঙ্গার, লুকিং গ্লাস, লাইলন দড়ি, একটি বড় মাপের কাপড়, ব্যাগ ক্লথ, ডিজাইনার পাত্র একটি বাটি, অর্ডার বুক ইত্যাদি।

মেসিন পার্টসের নাম ঃ একটি সম্পূর্ণ সেলাই মেসিন বিভিন্ন অঙ্গ সমন্বয়ে গঠিত। যেমন-

ক) ব্যালেন্স হুইল ঃ সেলাই মেসিনের উপরের চাকাকে ব্যালেন্স হুইল বলে। এই যন্ত্রের দ্বারা মেসিনের গতি নির্ধারণ করা হয়। এই চাকাটি চালালে তবেই মেসিন চলতে থাকে। এটি চালককে নিজেই চালাতে হয়।

খ) টেপ আপ লিভার ঃ এই অংশটি মেসিনের সামনে উপরের দিকে লাগানো থাকে। এর বাইরের দিকে একটি গর্ত আছে। সেই গর্তের মধ্যে দিয়ে সুতো লাগানো হয়। এই অংশটি ব্যবহার করা হয় কতগুলি কারণে যেমন-১) সূচে সুতো লাগানো ২) সুতোর ফাঁস শক্ত করার জন্য।

গ) প্রেসার ফুট ফিল্টার ঃ চাপ দণ্ডটি নানা রকমভাবে চালু করবার জন্য চাপ উক্ত লোক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ঘ) ফ্লাই হুইল ঃ নিচের চাকাকে ফ্লাই হুইল বলা হয়।

ঙ) হর্স ঃ ববিন কেসের বাহিরের দিকে উঠা ভাগ বেরিয়ে থাকে তাকে বলা হয় হর্স।

চ) থ্রেড টেনসন ডিভাইজ ঃ এটি মেসিনের সামনে কাজ করা অংশটিতে লাগানো থাকে। দুটি ফাঁকা চাক্তি পিঠে পিঠে লাগানো হয়। ইহার মধ্যে দিয়ে সুতো লাগানো হয়। ইহাতে একটি স্প্রীং নাট ঘুরাইয়া সুতোর টান শক্ত করিতে হয়। এই অংশের মোট ছয়টি পার্টস থাকে।

ছ) মিডল প্লেট ঃ ইহা একটি অর্ধ চন্দ্রাকৃতি ঝকঝকে স্টিলের প্লেট ইহাতে সুচ উঠানামার জন্য একটি গর্ত থাকে। এই প্লেটটি এমনভাবে বসানো থাকে যাতে সেলাই এর সময় কাপড়টি সমান জায়গায় থাকে। তাছাড়াও মেসিনের ভিতর যাতে ধুলোময়লা না ঢুকতে পারে। তার জন্য এই প্লেট ব্যবহার করা হয়, এটি অপস্রিয়মান ঢাকনা।

জ) সাইট প্লেট ঃ এটি আয়তাকার প্লেট এবং খুব ঝকঝকে সম্পূর্ণ মেসিনটি না উল্টে যাতে প্রয়োজন তাতে ববিন খোলা বা পরানো যায় সেই ভাবেই এটি প্লেট লাগানো থাকে, এটিও অপস্রিয়মান ঢাকনা।

ঝ) ট্রাডেল লেগ ঃ যার উপর পা রেখে সেলাই করা যায়।

ঞ) ফেস প্লেট ঃ এটিও অপস্রিয়মান ঢাকনা এতে নানা রকম কাজ বা ডিজাইন করা থাকে। ভিতরের পার্টস যাতে দেখা না যায় তার জন্য সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য এই প্লেট ব্যবহার করা হয়।

ট) থ্রেড গার্ড ঃ এই অংশটির ভিতর দিয়ে সুতো সোজা সুচ পর্যন্ত পরানো যায়।

ঠ) ফিড ডগ ঃ মিডল প্লেটের নিচে কতকগুলি দাঁতের মতো লাগানো থাকে এইগুলি সেলাই এর সময় কাপড়টি সামনে ও পিছনে যেতে সাহায্য করে। রিপু বা এমব্রয়াডারি করার সময় এমব্রয়ডারি প্লেট দিয়ে দাঁতগুলি ঢেকে দেওয়া হয়।

ড) পেসার ফুট ঃ এটি দেখতে জুতোর মত, সেলাই এর সময় কাপড়টিকে চেপে রাখার জন্য এই অংশটি চাপ দন্ডর সঙ্গে লাগনো থাকে।

ঢ) স্যাটেল ঃ এই অংশটি উপরের ও নিচের সুতো এক সাথে নিয়ে ফোর তৈরী করে এর মধ্যে ববিন কেস থাকে।

ণ) নিডিল বাব ঃ এটি হল সুচ দন্ড ইহার নিচে মুখের দিকে সূচটি শক্ত করে আটকানো তাকে। এই দন্ডটি বিশেষ ধরণের ইস্পাত দিয়ে তৈরী এবং খুব ঝকঝকে ইহার আসল কাজ সুচকে আটকে রাখা।

ত) স্টিচ রেগুলেটিং স্কেল ঃ কাপড় অনুযায়ী সেলাই ছোটো বড়ো করতে হলে স্ক্রুটি ঘুরিয়ে স্কেলের মাপ মত সেলাই ছোট বড় করা যায়। যেমন মোটা কাপড় সেলাই করার সময় স্কেলের পাঁচ নম্বর স্ক্রুটি রাখা হয় আবার পাতলা কাপড়ের ক্ষেত্রে স্ক্রুটি দুই কিংবা তিনের মধ্যে রাখা হয়।

থ) ববিন কেস ঃ এর মধ্যে ববিন থাকে ইহা নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে নিচের সুতোকে বার করে।

দ) স্পুল পিন ঃ সুতোর রিল রাখার জন্য মেসিনের উপরের যে দন্ড আছে তাকে স্পুল পিন বলে।

ধ) স্টপ মোসান ঃ এটি মেসিনের ব্যালেন্স হুইলের সাথে আটকানো থাকে, মেসিনের চালনা বন্ধ রাখার জন্য এটি ব্যবহার হয়।

ন) নিডিল ঃ এটি হল সুচ এটি বিশেষ ধরনের ইস্পাত দিয়ে তৈরী এবং চকচকে - ইহার নিচে একটি ছিদ্র আছে যাহার মধ্যে সুতো দিয়ে সেলাই করা হয়।

প) হ্যাণ্ডেল ড্রাইভার ঃ এটি স্টপ নামক যন্ত্রের সঙ্গে আটকানো থাকে এটি দিয়ে হাত মেসিন চালানো হয়।

ফ) ববিন ঃ ববিন উন্ডর এর সাহায্যে ববিনের সুতো পরানো হয়। এই সুতো ববিন কেসের গর্তের ভিতর দিয়ে বের করে সার্টেল লাগিয়ে তার পরে মেসিনে সেলাই করতে হয়।

ব) ববিন উণ্ডর ঃ এর দ্বারা ববিনে সুতো পরানো হয়।

ভ) স্টিচ রেগুলেটিং স্ক্রুপ ঃ স্টিচ ছোটো বড় করার জন্য যে মেসিনের ডান দিকে স্টিচ রেগুলেটিং স্ক্রুটির মধ্যে সে স্ক্রুটি লাগানো থাকে তাকে স্টিচ রেগুলেটিং স্ক্রু বলে।

ম) ল্যাচ ঃ ববিন কেসের পাতির নিচে থাকে আঙুল আর তর্জনীর দ্বারা ধরে লাগানোকে বলে ল্যাচ।

7. সেলাই মেসিন কত প্রকার

সেলাই মেসিন সাধারণত পাঁচ প্রকার যথা - ১) হ্যাণ্ড মেসিন ২) ফুট মেসিন ৩) পাওয়ার মেসিন ৪) বোতাম লাগানোর মেসিন ৫) বোতাম ঘর করার মেসিন।

সেলাই মেসিন কত প্রকার মডেলের

সেলাই মেসিন ছয় প্রকার মডেলের আছে যথা -

১) ডোমেস্টিক মডেল ২) টেলার মডেল, ৩) ফ্যাক্টরী মডেল, ৪) জিকজাক মডেল, ৫) লিঙ্ক মডেল, ৬) ইনড্রাসট্রিয়াল মডেল। মেসিনের সুচের ধারণা ঃ যে সুচ দিয়ে মেসিন সেলাই করা হয় তাকে মেসিন সূচ বলে। ইহা স্টিলের দ্বারা তৈরী।

সবচেয়ে ভালো সূচ সিভার কোম্পানীর। মেসিন সূচির উপর নিকেল পালিশ করা থাকে। মেসিন সূতো দুই প্রকার, যেমন - রাউন্ড হেড সুতো এবং ফ্লেট হেড সুতা। রাউন্ড হেড সূচ সাধারণত ফ্যাক্টারীর মোটা কাপড়ের সেলাই করার জন্য ব্যবহার করা হয়। দর্জিরা সাধারণত ফ্রেট হেড সূচ ব্যবহার করে।

৯ থেকে ১১ নং সূচ ঃ এই সূচ দ্বারা এমব্রয়ডারী করা হয়। এর সাথে ১০০ থেকে ৫০০ নং রেশমী সুতো ব্যবহার করা হয়।

১৬ নং সূচ ঃ এই সূচ জীন, ম্যাট খদ্দর ইত্যাদি কাপড়ে সেলাই করা হয়। এর জন্য ৪০ থেকে ৬০ নং সূতো ব্যবহার করা হয়।

১৮ নং সূচ ঃ মোটা, ব্লেজার, ক্যানডাইস, জিন কাপড়ের সেলাই করা হয়। এতে ৩০ থেকে ৪০ সূতো ব্যবহার করা হয়।

১৯ নং সূচ ঃ প্যারাসুট, লেদার, ক্যানভাইজ এবং জুতো সেলাই করতে ব্যবহার করা হয়। এর সঙ্গে ২ থেকে ২০ নং সুতো ব্যবহার করা হয়।

8. মেসিনের কোন কোন স্থানে তেল দেওয়া হয়

মেসিনের সার্টেলে, বেজ বডিতে, নিডিল বোর্ডে এছাড়াও মেসিনের উপর ওয়েল নামক চিহ্নিত ছিদ্রে তেল দিতে হয় এছাড়া মেসিনের বিভিন্ন সংযোগ স্থলে তেল দিতে হয়। তেল দিয়েই সেলাই করতে নেই-আগে টুকরো বা বাজে কাপড়ে সেলাই করে তারপর ভালো কাপড়ে সেলাই করতে করতে হয়। তা না হলে ভালো কাপড়ে তেল লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

9. মেসিনে সেলাই করিবার পূর্বে সাবধানতা

মেসিনে সেলাই করিবার পূর্বে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা একানত প্রয়োজন। যেমন ঃ-

১) সূচ ঠিক মত পরানো আছে কিনা তার দিকে ঠিকভাবে লক্ষ রাখতে হবে।

২) ববিনে সুতো ভরা আছে কিনা সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত।

৩) স্যাটেলে ঠিক মত ববিন কেসটি লাগানো আছে কিনা তা দেখতে হবে।

৪) ববিন কেসের টেনসন স্ক্রুটি ঠিকমতো লাগানো আছে কিনা সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫) স্টিচ, রেগুলেটার কাপড় অনুযায়ী ঠিক মতো লাগানো আছে কিনা তা দেখতে হবে।

৬) স্টপ মোসান ঠিক মত টাইট রাখতে হবে।

৭) ব্যালেন্স এবং ফ্লাই হুইলের যে ফিতা আছে তার সংযোগ স্থলটি ঠিক আছে কিনা তা দেখতে হবে। প্যাডেলের দুই পাশে স্ক্রুটি ঠিকমতো টাইট রাখতে হবে এবং মেসিনে ঠিক মতো তেল দিতে হবে।

10. মেসিন চালাতে অসুবিধা হয় কেন এবং কিভাবে ইহা প্রতিকার করা হয় ?

মেসিন চালানেরা সময় বিভিন্ন কারণে অসুবিধা হয় যেমন - ১) মেসিন বহুদিন অব্যবহার করলে। ২) মেসিনে নিকৃষ্ট তেল ব্যবহার করলে। ৩) ফিট ডগ এবং স্যাটেলের ভিতর ময়লা, ধুলো, কাপড়ের আঁশ ইত্যাদি জমলে। ৪) কাপড় অনুযায়ী প্রেসার ফুটের চাপ ঠিক মত না দিতে পারলে। ৫) মেসিনের সমস্ত পার্টসগুলিতে তেল না থাকলে। ৬) ববিন কেস বা বেস বডির সাথে সুতো জড়াইলে। ৭) ফ্লাই হুইল ও ব্যালেন্স হুইলের মধ্যবর্তী যে সংযুক্ত আছে তা বেশী টাইট হলে মেসিন চালাতে টাইট হয়। ৮) চাকার সাথে ববিন উইনডোর লেগে গেলে মেসিন চালাতে বাধা ঢেকে বা অসুবিধা মনে হয়।

প্রতিকার ঃ ১) মেসিন প্রতিদিন ব্যবহার করতে হবে। ২) মেসিনে ভালো তেল ব্যবহার করতে হবে। ৩) ফিট ডগ এবং স্যাটেলের ভিতরে যদি ময়লা, ধুলো, কাপড়ের আঁশ থাকে তাহলে পরিস্কার করতে হবে। ৪) কাপড় অনুযায়ী পেসার ফুটের চাপ দিতে হবে। ৫) মেসিনের সমস্ত পার্টস গুলিতে তেল দিতে হবে। ৬) ববিন কেস বা বেস বডির সাথে সুতো জড়াইলে পরিস্কার করতে হবে।

11. সূচ ভাঙ্গে কেন এবং তার প্রতিকার

মেসিন চালানোর সময় বিভিন্ন কারণে সূচ ভাঙে যথা - ১) সূচ বাঁকা থাকলে। ২) সূচ ঠিক মতো পরানো না হলে। ৩) নিডিল বোর্ড নিচে নেমে গলে। ৪) মোটা কাপড় সেলাই এর সময় চাপ দণ্ডর নাট তুলে নিয়ে বা জয়েন্টের কাছে মেসিন আসতে চালানো না হলে। ৫) প্রেসার ফুট খুলে গেলে। ৬) সূচ বেশি নামিয়ে ফিট করা হলে। ৭) কাপড় অনুযায়ী সূচ না হলে। ৮) সূচ অপেক্ষা সুতো মোটা হলে। ৯) টেনসন ডিভাইজ ঠিক মতো কাজ না করলে। ১০) স্যাটেল কেস ভেঙে গেলে বা খুয়ে গেলে। ১১) সেলাই কবার সময় টানার ব্যতিক্রম হলে অর্থাৎ কাপড় যদি সামনে দিকে বা পিছনের দিকে জোরে টানা হলে।

প্রতিকার ঃ ১) মেসিনে সূচ লাগানোর আগে দেখতে হবে সূচটি বাঁকা না সোজা। ২) নিডিল বোর্ডে সূচটি ঠিক মতো লাগাতে হবে। ৩) নিডিল বোর্ড যাতে নিচে নেমে না যায় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ৪) মোটা কাপড় সেলাই এর সময় চাপ দণ্ড তুলে নিতে হবে এবং জয়েন্টের কাছে মেসিন আসতে চালাতে হবে। ৫) প্রেসার ফুট ঠিক মতো লাগাতে হবে। ৬) সূচ বেশি না নামে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ৭) কাপড় অনুযায়ী সূচ বা সুতো ব্যবহার করা উচিত। ৮) সূচের নম্বর অনুযায়ী সুতো ব্যবহার হওয়া চাই। ৯) টেনসন ডিভাইজ ঠিকমতো রাখা দরকার। ১০) স্যাটেল কেস ভেঙে গেলে বা খুয়ে গেলে পাল্টাতে হবে। ১১) সেলাই করবার সময় সামনের দিকে বা পিছনে দিকে জোরে টানা উচি নয়। নোট ঃ উপরিউক্ত সাবধানতার ফলে সূচ ভাঙ্গে না।

12. মেসিনের উপরের সুতো ছেঁড়ে কেন এবং তার প্রতিকার

মেসিন চালানোর সময় বিভিন্ন কারণে মেসিনের উপরের সুতো ছেঁড়ে যথা - ১) উল্টো ঘোরালো ২) সূচ উল্টো লাগালে। উপরের সুতোর টেনসন অত্যন্ত টাইট হলে। ৪) সুতো পচা বা নরম হলে। ৫) সূচের মুখ ভোঁতা বা খারাপ হলে। ৬) সূচের মুখ খুব ধারালো হলে। ৭) মোটা কাপড় সেলাই এর মোম বা সাবান না হলে। ৮) টেনসনে ময়লা জমলে। ৯) সুতোর টান সমান না হলে। ১০) উপরের সুতো জড়িয়ে ধরলে। ১১) মেসিনে সুতো ঠিক মতো পরানো না হলে। ১২) সুতো গিট বা খারাপ হলে। ১৩) সুতোর তুলনায় সূচ অতিরিক্ত সরু হলে।

প্রতিকার ঃ ১) মেসিন সোজা চালাতে হবে। ২) সূচ ঠিক মতো লাগতে হবে। ৩) উপরের সুতোর টেনসন ঠিকমতো রাখতে হবে। ৪) সুতো পচা বা নরম হলে শক্ত সুতো লাগাতে হবে। ৫) সূচের মুখ ভোতা বা খারাপ হলে তাকেও পাল্টাতে হবে। ৬) দেখতে হবে যেন সূচের মুখ বেশি ধারালো না হয়। ৭) মোটা কাপড় সেলাই এর মোম বা সাবান লাগাতে হবে। ৮) টেনসন পরিস্কার রাখতে হবে। ৯) সুতোর টান উপর ও নিচে সমান রাখতে হবে। ১০) উপরের সুতো যাতে জড়িয়ে না ধরে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ১১) মেসিনে সুতো ঠিক মতো পরাতে হবে। ১২) সুতো গিট যুক্ত বা খারাপ না হয়। ১৩) সূচের মাপ অনুযায়ী সুতো ব্যবহার করা দরকার। নোট ঃ উপরিউক্ত প্রতিকারে ফলে মেসিনের উপরের সুতো ছেড়ে না।

13. সেলাই করার সময় ফলস হয় কেন ও তার প্রতিকার

সেলাই করার সময় বিভিন্ন কারণে ফলস পড়ে যথা - ১) সুতো উঁচু করে কিংবা সঠিকভাবে লাগানো না হলে। ২) নিডিল বার্ড নিচে নেমে বা উপরে উঠে গেলে। ৩) সূচের মুখ ভাঙ্গা হলে। ৪) কাপড়ে বেশি মাড় থাকলে। ৫) যেখানে অনেক পার্ট থাকে। ৬) সূচের চ্যাপ্টা দিকটা ভিতরে না থাকলে। ৭) মোটা কাপড় সেলাই এর মোম বা সাবান না দিলে। ৮) সুতোর টান সমান না থাকলে। **প্রতিকার ঃ** ১) সূচ ঠিক মতো লাগাতে হবে। ২) নিডিল বার্ড ঠিক জায়গায় রাখতে হবে। ৩) সূচের মুখ ভাঙা থাকলে পাল্টাতে হবে। ৪) কাপড়ে বেশি মাড় থাকলে ধুয়ে নিতে হবে। ৫) অল্প ভাজে সেলাই করতে হবে। ৬) সূচের চ্যাপ্টা দিকটা ভিতরে রাখতে হবে। ৭) মোটা কাপড় সেলাই এর সময় মোম বা সাবান দিতে হবে। ৮) সুতোর টান সমান রাখতে হবে।

14. মেসিন ভারি চলার সময় কারণ ও তার প্রতিকার ?

সেলাই করার সময় মেসিন ভারি চলার কারণ যথা - ১) ব্যালেন্স হুইলে সুতো আটকালে। ২) বেল্ট বেশি টাইট হলে। ৩) ঠিক মতো তেল দেওয়া না হলে। ৪) মেসিনে উপযোগী তেল না দেওয়া হলে। ৫) কোন পার্টস ঠিকমতো লাগানো না হলে। ৬) স্যাটেলে ময়লা জমলে। ৭) নতুন পার্টস লাগানো হলে অনেক সময় মেসিন চালাতে ভারী লাগে। প্রতিকার ঃ ১) ব্যালেন্স হুইলে সুতো আটকালে সুতো খুলে দিতে হবে। ২) বেল্ট বেশি টাইট হলে ঠিক করে নিতে হবে। ৩) ঠিকমতো তেল দিতে হবে। ৬) স্যাটেলে ময়লা জমলে পরিস্কার করতে হবে। ৭) ববিন উইনডোর ব্যালেন্স হুইলের সাথে লেগে খুলে দিতে হবে।

15. সুঁচ ক্রয়ের সতর্কীকরণ

সূচ ক্রয় করার সময় কয়েকটি বিষয়ে সতর্কীকরণ থাকা উচিত যেমন - ১) সুঁচ যেন বাঁকা না থাকে। ২) সুঁচের নিকেল পালিশ যেন থাকে। ৩) সুঁচে মরিচা যেন না থাকে। ৪) কাপড় অনুযায়ী সুঁচের নম্বর দেখে কেনা উচিত।

16. ববিনের সুতো ছেড়ে কেন ও তার প্রতিকার ?

সেলাই করার সময় বিভিন্ন কারণে ববিনের সুতো ছেড়ে যথা - ১) ববিনের সুতোর টেনসন টাইট থাকলে। ২) ববিনের

ভিতরের টেনসন স্ক্রু-এর ময়লা জমলে। ৩) ববিন কেসটি ঠিক মতো লাগানো না হলে। ৪) ববিন অতিরিক্ত সুতো ভরালে। ৫) ববিনে ভূল পদ্ধতিতে সুতো ভরা হলো। ৬) খারাপ বা গিটযুক্ত সুতো হলে। ৭) স্যাটেলের কেস পাল্টাতে হবে।

17. লুপ পড়ে কেন এবং তার প্রতিকার

সেলাই করার সময় বিভিন্ন কারণে লুপ পড়ে যায় যথা ১) টেকআপ লিভার বা টেনসনের মাঝখানসে সুতো না গেলে। ২) টেনসনে প্যাঁচ ঠিক মতো রাখতে হবে। ৩) টেনসনে সুতো আটকে গেলে। ৪) প্রেসার ফুটের চাপ কম হলে।

প্রতিকার ঃ ১) টেকআপ লিভার বা টেনসনের মাঝখানে সুতো যেতে হবে। ২) টেনসনের প্যাঁচ ঠিক মতো রাখতে হবে। ৩) টেনসন যাতে সুতো না আটকায় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ৪) প্রেসার ফুটের চাপ ঠিক মতো রাখতে হবে।

18. মেসিনের আওয়াজ হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার

সেলাই করার সময় বিভিন্ন কারণে মেসিনের আওয়াজ হতে পারে যথা - ১) মেসিনে তেল না থাকলে। ২) এক পার্টসে সঙ্গে অন্য পার্টসের ঘর্ষন হলে। ৩) সব পার্টস পরিস্কার করে তেল না দিলে। ৪) স্যাটেলে সুতো জড়াইলে। ৫) স্যাটেলে বা মেসিনের প্রয়োজনীয় কোন পার্টস খুলে গেলে। ৬) কেরোসিন তেল মেসিনে দেওয়া উচিত নয়। ৭) ফিড ডগের মধ্যে ময়লা জমলে পরিস্কার করতে হবে। ৮) স্যাটেল ঢিলা হলে পাল্টাতে হবে।

19. সেলাই অসমান হয় কেন ও তার প্রতিকার

সেলাই করার সময় দুই জায়গায় সুতো পরাতে হয়। উপরের সূচে এবং নিচে ববিন কেসে দুটির যেকোন একটির সুতো ঢিলা বা টাইট হলে সেলাই অসমান দেখা দেয় প্রথমে দেখতে হবে কোন দিকে সেলাই খারাপ হচ্ছে। যদি উপরে সেলাই খারাপ হয় ও নিচের সেলাই ভালো হয় ও নিচের সেলাই খারাপ হয় তবে টেনসন রেগুলেটর স্ক্রুটি টাইট করে দিতে হবে। উপরের ও নিচের সুতোর টান সমান পর্যায় রাখতে হবে, তবে নিচের সুতোর টান একটু টাইট হলে ভালো হয়।

কাপড় কুঁচকাবার কারণ ও তার প্রতিকার

সেলাই করার সময় বিভিন্ন কারণে কাপড় কুঁচকাইতে পারে যথা - ১) সুতোর টান অতিরিক্ত শক্ত হলে। ২) কাপড়ের তুলনায় ফের বড় হলে। ৩) অতিরিক্ত বেশি বা কম চাপ দিলে। ৪) সূচের মুখ খারাপ হলে।

প্রতিকার ঃ ১) সুতোর টান ঠিক মতো রাখতে হবে। ২) কাপড় অনুযায়ী সেলাইয়ের ফোঁড় রাখতে হবে। যেমন-মোটা কাপড় সেলাই এর সময় পাঁচ নম্বর পয়েন্ট রাখতে হবে। ৩) চাপ মাঝামাঝি দিতে হবে। ৪) সূচের মুখ খারাপ হলে পাল্টাতে হবে। প্রতিদিন সেলাই মেসিনে কলকবজাগুলি যত্ন সহকারে পরিস্কার করে মুছে রাখা এবং সেলাই মেসিনের গায়ে যে গর্ত আছে তার মধ্যে তেল দেওয়া আবশ্যক। মেসিনের মধ্যে যে সমস্ত ময়লা, ধুলো, বালি, সুতোর আঁশ ঢুকে যায় তা পরিস্কার করে নেওযা উচিত। ফিড ডগের ভিতরের কাপড়ের মাড় ঢুকে গেলে তা নিয়মিতভাবে পরিস্কার করা দরকার। মেসিনে গায়ে তেল লেগে কাপড়ের গায়ে দাগ হবার সম্ভাবনা থাকে তা দুর করার জন্য মেসিনে তেল দেওয়ার

পরে মেসিন পরিস্কার করা দরকার। মেসিনে ভালো তেল না ব্যবহার করলে মেসিনের যন্ত্রপাতি টাইট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তেল দেওয়ার সময় সূচ নামিয়ে রাখতে হয়। তেল দেওয়া হলে মেসিনে সুতো ছাড়াই মিনিট পাঁচেক জোরে চালাতে হয়। এই সময় চাকাটিকে উঠিয়ে রাখতে হয় তারপর এক টুকরো খারাপ কাপড়ের উপর মেসিন চালালে দেখা যায় যে বাড়তি তেল লাগে না। অনেক সময় দেখা যায় যে ফিড ডগ এবং স্যাটেলে ভিতর কাপড় বা সুতোর আঁশ ঢুকে খটখট শব্দ হয় এবং মেসিন চালাবার আগে বা পরে কলকব্জা গুলির দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার তার ফলে মেসিনে মরিচা পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে। মরিচা ধরলে মেসিন অকেজো হয়ে যায়। সপ্তাহে একবার স্যাটেলে আঁশ পরিস্কার করতে হবে এবং মাসে একবার ফিড ডগ, স্যাটেল, ফেসপ্লেট খুলে পরিস্কার করতে হবে এবং বছরে একবার কেরোসিন তেল দিয়ে যথা সম্ভব খুলে ওভার ওয়েলিং করতে হবে।

মেসিনে তেল কেন দেওয়া হয়?

এক পার্টসের সঙ্গে অন্য পার্টসের ঘর্ষণ যাতে না হয় এই জন্য তেল দেওয়া হয়। তেল দিলে মেসিনে আওয়াজ হবে না এবং হালকা চলবে এতে মেন্টিনেন্স খরচ কম হবে এবং মেসিন বেশি দিন চলবে। মেসিনে কখনোই নারকেল তেল বা কেরোসিন তেল দেওয়া উচিত নয় কারণ কেরোসিন তেল সহজেই শুকিয়ে যায় ও চকচক হয় না। নারকেল তেল মোটা হয় ও ঠাণ্ডায় জমে যায়। এই জন্য দুই তেল মিশিয়ে দেওয়া উচিত নয়। মেসিনে লোহা ও কাঠ আছে এই জন্য একে শুকনো জায়গায় রাখা উচিত। ভিজে জায়গায় রাখলে লোহাতে মরিচা ধরে এবং কাঠ খারাপ হয়ে যায়। যে পার্টসের আরেক পার্টসের সঙ্গে ঘোরে তার জয়েন্ট দু-এক ফোঁটা তেল দিতে হবে কারণ এতে গরম হয় না বা ক্ষয় হয় না। মেসিনে যত ভালো মেন্টিনেন্স হবে তত ভালো কাজ দেবে ও কাজ করতে ইচ্ছা হবে।

হাত সূঁচের ধারণা (Needle for hand embroidery)

হাত সূঁচ সাধারণত তিন প্রকারের হয় যেমন -

১) সর্ট নিডিল ২) লং নিডিল ৩) ক্রাওয়াল নিডিল।

১) সর্ট নিডিল ঃ কাঁচা সেলাই করার জন্য যে সূচ ব্যবহার করা হয়।

২) লং নিডিল ঃ রিপু করার জন্য যে সূচ ব্যবহার করা হয়।

৩) ক্রাওয়াল নিডিল ঃ অর্ধ চন্দ্রাকৃতির মত হয় ইহা ডাক্তাররা ব্যবহার করে থাকে। আমরা সাধারণত ৫-৯ নং সূচ ব্যবহার করে থাকি।

১) ৫নং সূচ ঃ ইহা সব থেকে মোটা বোতাম ঘর তৈরি এবং বোতাম লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

২) ৬ নং সূচ ঃ এটাও মোটা বোতাম ঘর তৈরির এবং বোতাম লাগানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

৩) ৭ নং সূচ ঃ এই সূচ দিয়ে হেম করা হয় এবং বোতাম ঘর করা হয় না।

৪) ৮নং সূচ ঃ সব কাপড়ের হেম করা হয় এবং কাঁচা সেলাই - এ ব্যবহার করা হয়।

৫) নং সূচ ঃ এই সূচ দিয়ে সবচেয়ে পাতলা কাপড়ের হেম ও এমব্রয়ডারী করা হয়, এছাড়া ১-৪ নং সূচের দ্বারা লেপ গদি সেলাই করা হয়।

গঠন ঃ

এই সূচ তার দিয়ে তৈরী হয়। তারের উপর নিকেল পালিশ করা থাকে, কারণ তাতে সূচ কাপড়ে সহজেই হেম করা যায়। টেলার্স সূচের নম্বর তিন সেমি ও সাড়ে তিন সেমি হয় আর সেলাই চওড়া একের ষোলো সেমি অথবা দেড় মিলিমিটার এর কাছাকাছি হয়।

সাবধানতা ঃ ১) মরিচা বা পালিশ ওঠা সূচ ব্যবহার করা উচিত নয়।

২) টেরা, ভোতা, বাঁকা সূচ ব্যবহার করা উচিত নয়।

৩) সূচ মুখে রাখা উচিত নয় কারণ নিঃশ্বাসের দ্বারা সূচ পেটের ভিতর চলে যেতে পারে, যার দ্বারা জীবনহানির সম্ভাবনা থাকতে পারে।

৪) মুখে সূচ তাড়াতাড়ি মরিচা ধরে যায়।

সুইং কটন থ্রেড ঃ

যে সুতো সেলাই করার জন্য কাপড়ের ভিতর যায় তাকে সুইং কটন থ্রেড বলে।

প্রয়োজনীয়তা ঃ

সুন্দর মজবুত সেলাই করার জন্য এক, দুই বা ততোধিক কাপড়কে একসঙ্গে জোড়া দেওয়ার জন্য যে সুতো ব্যবহার করা হয়।

সুতোর রং কাপড়ের রং অনুসারে নিতে হয় যে রকম কাপড় হবে সেই রকম সুতো হওয়া উচিত এবং সুতো মজবুত হওয়া উচিত।

৮নং রিল ঃ ইহা সব থেকে মোটা।,সাধারণত ২০০ গজ বা ১৮৩ মিটারের হয় এই সুতো six ply দ্বারা তৈরী হয়।

১০ নং রিল ঃ এই সুতো পিয়োর সুতির হয় এবং Eight ply এর হয়। এর দৈর্ঘ্য বিভিন্ন ধরণের হয় এই সুতো বোতাম ঘর, হুক লাগানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

৪০ নং রিল ঃ এই সুতো সুতির হয় ইহা four ply এর হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ৪০০ মিটারের হয়। এই সুতো মোটা কাপড় সেলাই এর জন্য ব্যবহার করা হয়।

৫০ নং রিল ঃ এই সুতো টিউবে পাওয়া যায় ইহা সাধারণত পাতলা কাপড়ে সেলাই করা হয়। যেমন- পায়জামা, ব্লাউজ ইত্যাদি ইহা ৫০০ গজ থেকে ৪৫৭ মিটারের হয়ে থাকে এই সুতো Four ply এর হয়। ইহা সব থেকে ভালো সুতো।

৬০ নং রিল ঃ এই সুতো সাধারণত রিল হয় না টিউব হয়। এই সুতো Two ply এর হয়। এই সুতো খুব চকচকে হয়। এই সুতোর দ্বারা ফাইন সুতির কাপড়, সিল্ক ইত্যাদি সেলাই হয়। এই সুতো টেরিকোট সেলাই হয় না।

৬০ থেকে ৮০ নং রিল ঃ এই সুতো রেশমি কাপড় সেলাই এর জন্যে ব্যবহার করা হয়।

৮০ থেকে ১৫০ নং রিল ঃ এই সুতো লাইলন, জর্জেট, সিপন ওরগেনডী এই জাতীয় পাতলা কাপড় সেলাই করা হয়।

১০০, ১২০, ১৩০ নং রিল ঃ বিভিন্ন রকমের হয় এই নাইলনের সুতো। এই সুতোর ভিতর ইলাস্টিক সিটি থাকে তার জন্য এই সুতো সহজে ছেড়ে না এর দ্বারা সুতির কাপড় সেলাই করা উচিত নয়। এর দ্বারা সিন্থেটিক, পোশাক সেলাই করা হয়।

টু স্টিচ রিল ঃ এই সুতো দৈর্ঘ্য ১২ গজ হয়। কোট, ওভারকোট, প্যান্টের বোতাম ঘর করা হয়। এছাড়া আরও অনেক

রকম সুতো আছে যেমন - DMC ইত্যাদি। এর দ্বারা এমব্রয়ডারী করা হয়।

20. প্রকৃত দর্জির কি কি গুণ থাকা দরকার

একজন প্রকৃত দর্জির কাজ করতে গেলে উপস্থিত বুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। অনেক সময় হয়তো দেখা যায় কোন পোশাক করতে যতটুকু কাপড় প্রয়োজন হয় সেই কাপড়ের টুকরো আছে তাতে একটু কম হবে কিন্তু তাই বলে ঐ কাপড়ের টুকরো নষ্ট করা যাবে না। প্রয়োজনে ঐ পোশাকের কোথাও হয়তে জোড়া দিতে হবে এমন যে জোড়াটি মোটেই বোঝা যাবে না বরং ঐ জায়গায় এমন একটা সুন্দর ডিজাইন হবে যাতে পোশাকের সৌন্দর্য্য আরো বেড়ে যাবে।

(২) তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও অঙ্কন বিদ্যা ঃ দর্জির নজর যদি তীক্ষ্ণ না হয় তাহলে সাধারণ ব্যাপারগুলিতে নজর নাও দিতে পারে। এর ফলে দর্জির অনেক কথা শুনতে হয়। এর জন্য তার সুনাম নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে।

(৩) গণিত বিদ্যা ঃ দর্জির গণিত বিদ্যা অতি অবশ্যি প্রয়োজন। কারণ পোষাকের মাপ বার করা ও কতটা কাপড় প্রয়োজন হবে তার জন্য গণিত বিদ্যা আবশ্যক।

(৪) দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ঃ দর্জির সেলাই বা কাটছাট বিষয়ে কোন অবিজ্ঞতা না থাকে তাহলে কখনো গ্রাহকের বক্তব্য ঠিক মতো বুঝতে পারবে না। দর্জি যদি অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হয় তাহলে পোশাক কাটার সময় কম কাপড়ে কাটতে পারবে এবং টুকরো কম পড়বে।

(৫) নিপুণতা ঃ দর্জির হাতের কাজ সবসময় নিপুণ হতে হবে। দর্জির কাজ যদি নিপুণ হয় তবেই সেই দর্জির চাহিদা বেশী হবে। অর্থাৎ সেই দর্জি দোকানে ভিড় বেশি হবে।

(৬) দর্জির সুন্দর ও সৎ ব্যবহার ঃ দর্জির ব্যবহার যদি সুন্দর হয় অর্থাৎ গ্রাহকের সঙ্গে ব্যবহার যদি ভালো করে মিষ্টি কথা বলে তাতেই দর্জির সুনাম হয় এবং গ্রাহকের সেই দর্জির প্রতি নজর পড়ে। দর্জিকে সবসময় সৎ হতে হবে। অর্থাৎ যে পোশাকের জন্য যতটুকু কাপড় প্রয়োজন হবে ততটুকু কাপড় রাখা প্রয়োজন কারণ অহেতুক বেশী কাপড় রেখে গ্রাহকের সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করা উচিত নয়।

(৭) কাপড়ের সঙ্গে সুচ ও সুতোর সম্পর্ক ঃ

ভূমিকা : যখনই কোন কাপড় সেলাই করা হয় তখন কাপড় অনুযায়ী সূচ ও সুতো ব্যবহার করা উচিত। যখনই কোন কাপড় সেলাই করা হয় তখন আগে সূচ ও সুতো নম্বর এবং কিরকম কাপড় হবে তার জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। এই জ্ঞান না হলে অনেক দোষ আসে। যেমন - (১) সুতো বারবার ছিড়ে যায়, (২) মেসিন সেলাই সুন্দর বা পরিস্কার হয় না, (৩) কাপড় কুচকে যায়, (৪) সূচ ভাঙার ভয় থাকে।

সূচের নম্বর	সুতোর নম্বর	সেলাই করার কাপড়
৯ থেকে ১১ নম্বর	১০০ থেকে ১৫০ সিন্থেটিক	সুপার ফাইন, ক্লথ, লাইলন
	সুতির সুতো হলে ৬০ নম্বর	ডেক্রন, সিল্ক, মলমল ইত্যাদি
১৪ নম্বর	৫০ থেকে ১০০ নম্বর	কেমব্রিজ, ভয়েল, ওরার্গান্ড ইত্যাদি

১৬ নম্বর	৪০ থেকে ৬০ নম্বর	মাঝারী মোটা কাপড়, জীন্স, কোট স্যুটিং।
১৮ নম্বর	৩০ থেকে ৮০ নম্বর	জীন্স, মোটা উলেন কাপড় ইত্যাদি
২১ নম্বর	২ থেকে ২০ নম্বর	প্যারাসুট, ক্যামবিস ইত্যাদি।

কাপড়ের প্রকারভেদ ও উৎপত্তি ঃ

কাপড় সাধারণত চারটি উপায়ে উৎপন্ন হয়। যেমন - ১) গাছপালা থেকে (Vegetable) (২) পশু থেকে (Animal), (৩) কৃত্রিম উপায়ে (Artificial), (৪) খনিজ থেকে (Mineral)।

(১) ভেজিটেবল ফ্রেব্রিক ঃ (গাছপালা থেকে) গাছ থেকে যে তুলো হয় তার বীজগুলি পরিস্কার করে মেসিনের দ্বরা সুতো তৈরি করা হয়। সেই সুতো নানা রকম উপায়ে পরিস্কার করে রৌদ্রে শুকিয়ে রং করে মেসিনের সাহায্যে রিল তৈরি করা হয় এবং তার দ্বারা কাপড় তৈরি করা হয়। সুতির কাপড় ধুয়ে পোশাক তৈরি করলে ছোট হওয়ার ভয় থাকে না। সুতির কাপড় গ্রীষ্ম প্রধান দেশের পক্ষে ভালো। পাট এক প্রকার ছাল, একে জলে পঁচিয়ে নানা উপায়ে সুতো বের করতে হয়। এই সুতো খুব শক্ত হয়।

(২) সিল্ক এবং উল ঃ (পশু থেকে) সিল্কের কাপড় তৈরি হয় গুটিপোকার লালা থেকে। গুটিপোকা যে গুটি তৈরি করে সেই গুটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৫ মিনিট সিদ্ধ করে রেশম বের করা হয়। প্রথম চীন দেশে এই সুতো উৎপন্ন হয়। এই সুতোর দ্বারা তৈরি কাপড় গ্রীষ্ম প্রধান দেশের পক্ষে খুবই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান। উল তৈরী হয় ভেড়ার লোম থেকে। উলের পোশাক শীত প্রধান দেশের পক্ষে উপযোগী।

(৩) সিন্থেটিক ফ্রেব্রিক ঃ (কৃত্রিম উপায়ে) কৃত্রিম উপায়ে সাধারণত লাইলন, ভেক্সন টেলেরিং ইত্যাদি কাপড়ে তৈরি হয় এই কাপড় কেমিকেল সংমিশ্রণে তৈরী হয়।

(৪) মিনারেল ফ্রেব্রিক ঃ (খনিজ থেকে) এই কাপড় জরি কাপড় ইকনিজ থেকে তৈরী হয় যেমন - সোনা, রূপা, পিতল ইত্যাদি।

কাপড়ের বিভিন্ন বহর ঃ

ক্রমিক নং	**সুতি কাপড়**	**বহর**
১	লং ক্লথ	৭৬ সেমি - ৯১ সেমি
২	পপলিন	৭১ সেমি - ৯১ সেমি
৩	ড্রিল	৯৬ সেমি - ৭৬ সেমি
৪	প্রিন্টেড পপলিন	৮৯ সেমি - ৯১ সেমি
৫	কেমব্রিজ	৮৯ সেমি - ৯১ সেমি
৬	লোন	৮৯ সেমি - ৯০ সেমি
৭	ক্রেপ	৮৯ সেমি - ৯১ সেমি
৮	ভয়েল	৮৯ সেমি - ১২২ সেমি

৯	আদ্দি	৯০ সেমি - ১২২ সেমি
১০	খদ্দি সার্টিং	৬৯ সেমি - ১০৭ সেমি
১১	খদ্দি সুটিং	৬৯ সেমি - ৯১ সেমি

ক্রমিক নং	**আর্ট সিল্ক**	**বহর**
১	কাপড়	৬৯ সেমি - ৯১ সেমি
২	সার্টিং	১০৭ সেমি - ১২১ সেমি
৩	জর্জেট	১০৭ সেমি - ১২১ সেমি
৪	শাড়ি	১০৭ সেমি - ১২১ সেমি
৫	ব্রোকেট	৬৯ সেমি - ৯১ সেমি

ক্রমিক নং	**পিয়োর সিল্ক**	**বহর**
১	কাপড়	৬৯ সেমি - ৯১ সেমি
২	সিল্ক স্যুটিং	৬৯ সেমি - ৯১ সেমি
৩	শাড়ি	১২৭ সেমি - ১৩১ সেমি
৪	কুর্তা	৯০ সেমি - ১২১
৫	ড্রিল সিল্ক	৬৯ সেমি - ৯১ সেমি

ক্রমিক নং	**উলেন**	**বহর**
১	ব্লেজার	১৩১ সেমি - ১৪৫ সেমি
২	মিলটন	১৩১ সেমি - ১৪৭ সেমি
৩	টেরিউল স্যুটিং	১৩১ সেমি - ১৪৫ সেমি
৪	গের্বাডিন	১৩১ সেমি - ১৪৭ সেমি
৫	কটস উল	৫৯ সেমি - ৯০ সেমি

ক্রমিক নং	**সিন্থেটিক ফ্রেব্রিক**	**বহর**
১	লাইলন	১০৫ সেমি - ১২১ সেমি
২	টেরিন	৮১ সেমি - ৯১ সেমি
৩	রুবিয়া	৮১ সেমি - ৯১ সেমি
৪	টেরিন সুটিং	১৩১ সেমি - ১৪৫ সেমি

৫ সার্টিন ৮৯ সেমি - ৯১ সেমি

কাপড় চিনবার উপায় ঃ

প্রত্যেক কাপড়ের সোজা উল্টো দুই দিক থাকে। কোন পোশাক কাটার আগে সোজা এবং উল্টো দিক দেখে কাটতে হয় এতে পোশাক খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকে না যে কোন পোশাক কাটার আগে সোজা দিক ভিতরে রেখে অঙ্কন করতে হয়। কাপড়ের যেদিক মসৃন নরম সুন্দর সেই দিক সোজা আর যে দিক খসখসে খারাপ বা হাল্কা প্রিন্ট সেই দিক দেখে উল্টে চেনা যায়।

কাপড় শিঙ্ক করবার পদ্ধতি ঃ

প্রথমত কাপড় জলে ভিজিয়ে শিঙ্ক (shrink) করা হয় কারণ যে কোন কাপড়ে পোশাক করার আগে দেখতে হবে যে কাপড়টা কি প্রকার এবং উহাকে শিঙ্ক করতে হবে কিনা।

মোটা কাপড় শিঙ্ক করার নিয়ম ঃ

যে পরিমাণ কাপড় হবে তার ২০ গুণ জলে উপযুক্ত পরিমাণ সাবান গুলে তাতে কাপড় ভিজিয়ে দিতে হবে এবং ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখার পর উহাকে না চিপে জল সমেত ছায়া জায়গায় শুকোতে হবে।

পাতলা কাপড় শিঙ্ক করার নিয়ম ঃ

যত পরিমাণ কাপড় হবে তার ২০ গুণ জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। ৬ থেকে ৭ ঘন্টা জলে ভেজার পর ঐ ভাবে না চিপে জল সমেত ছায়া জায়গায় শুকাতে হবে। কিন্তু কাপড় যাতে ভেজা না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং শুকাবার পর প্রেস করে নিতে হবে।

পিয়োর সিল্ক চিনবার উপায় ঃ

মাইক্রোস্কোপ টেস্ট ঃ অনুবিক্ষণ যন্ত্রে একে ভাঙ্গী কাঁচের মত দেখা যায়।

কেমিকেল টেস্ট ঃ এর উপর কোন অ্যাসিডের প্রভাব পড়ে না। খার, সোডা সাবানের ধোয়া যায়।

বার্নিং টেস্ট ঃ ১) এর আগুনের রং নীল হয়। ২) পাখির পালক পোরার বের হয়।

সিম কি ?

সিমের আসল পরিভাষা হল দুটি কাপড় একসঙ্গে সূচ ও সুতোর দ্বারা সেলাই করা। ইহা সেলাই মেসিন ও হাতে করা যায়। দুটি কাপড়ের বরাবর এক - এর চার ইঞ্চি অথবা তিন-এর চার ইঞ্চি দূরে সেলাই করাকে প্লেন সিম বলে। দুটি কাপড় কমা বাড়া করে সেলাই করে উল্টো করে পেতে নিয়ে সোজা দিকে চাপা সেলাই দেওয়াকে ফ্লেট সিম বলে।

১) প্রেস ও পেন সিম ঃ ইহা প্লেন সিমের মত সেলাই করে বা সেলাই করার পর তাকে প্রেস করাকে প্রেস ও প্লেন সিম বলে অবশ্য শুধু প্রেস করলে হয় না উল্টো দিকে সেলায়ের মাঝখানটা চিরে তবেই প্রেস করতে হবে এটা করার ফলে জায়গাটা পাতলা থাকে।

২) পিংকিং সিম ঃ ইহা প্লেন সিমের মতো সেলাই করে পিংকিং সেয়াসকে সিম কেটে দেওয়াকে পিংকিংসিম বলে। এটি দেখতে সুন্দর হয় এই সেলাই করার ফলেকাপড়ের ধারের সুতো বের হয় না ফলে পোশাক সুন্দর হয়।

৩) ফ্রেন্স সিম ঃ এই সেলাই সাধারণত চোরা সেলাই বা সোজা উল্টো সেলাই বলে সোজা এক-এর চার ইঞ্চি একবার সেলাই দিয়ে আবার সেই কাপড়টাকে উল্টে এক-এর দুই-ইঞ্চি দূর দিয়ে সেই সেলাইকে ফ্রেন্স সিম বলে। এর ফলে কাপড়ের ধার থেকে সুতো বের হয় না। সুতো উঠে না তাছাড়া দেখতে সুন্দর ও টেকসই হয়।

৪) প্লিট সিম ঃ প্লিট সিম কাপড় কমাবার জন্য ও সুন্দর করার জন্য অথবা ডিজাইন করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এক পূর্ণ-এক -এর-দুই ইঞ্চি চওড়া বা দুই অংশ প্লিট থেকে।

৫) সার্ট মেকার সিম ঃ এই সেলাই সার্টের ভিতর লাগানো হয় একে পাকা সেলাই বলে, সার্টের প্রথমে একসঙ্গে রেখে তার পর নিচের ভাগ এক এর চার ইঞ্চি বড় রেখে সেই কাপড় মুড়ে সেলাই করাকে সার্ট মেকার সিম অথবা টেইলার সিম বলে।

৬) রান এবং পেল সিম ঃ প্রথমে নিচের কাপড় বড় রেখে উপরের কাপড় ছোট রেখে মেসিনে সেলাই দিতে হবে। এক এর চার ইঞ্চি দূর দিয়ে তার পর নীচের কাপড় মুড়ে হেম দিতে হবে, সেই সেলাই প্যান্টের পায়ে পরা হয়।

ডার্ট কি?

শরীরে রগঠন অনুযায়ী পোশাক ফিট করার জন্য ডার্টের ব্যবহার করা হয়। এই সেলাই পোশাকের নিচের দিকে থাকে। ডার্ট অনেক রকমের হয়। যেমন নেক ডার্ট, সাই ডার্ট, ওয়েস্ট ডার্ট, ভী ডার্ট, সাইড ডার্ট, ফিস ডার্ট ইত্যাদি।

১) নেক ডার্ট ঃ গলার সেপ বড় হয়ে গেলে তা ঠিক করার জন্য যে ডার্ট দেওয়া হয় তাকে নেক ডার্ট বলে। সাধারণত ব্লাউজে এই নেক ডার্ট দেওয়া হয়।

২) সাই ডার্ট ঃ বগলের সেপ বড় হয়ে গেলে এই ডাটল দিয়ে ফিটিংস আনাকে সাই ডার্ট বলে। সাধারণত ব্লাউজের, কামিজে এই সাই ডার্ট দেওয়া হয়।

৩) ওয়েস্ট ডার্ট ঃ কোমরের সামনে যে ডার্ট দিয়ে ছাতি থেকে কোমরের মাপ কমানো হয় এবং পোশাকের ফিটিং আনা হয় তাকে ওস্টে ডার্ট বলে। সাধারণত ফ্রক, ব্লাউজ, সার্টে ওয়েস্ট ডার্ট দেওয়া হয়।

৪) ভী ডার্ট ঃ ভী াকৃতির ডার্ট দিয়ে ফিটিংস আনাকে ভী ডার্ট বলে। সাধারণত প্যান্টের কোমর থেকে সিটের মধ্যে এই ডার্ট দেওয়া হয় অর্থাৎ কোমরের মাপ বেশি বড় হলে এই ভী ডার্ট দেওযা হয়।

৫) সাইড ডার্ট ঃ পোশাকের দুই পাশে এই ডার্ট দেওয়া হয়। সাধারণত ব্লাউজে, কামিজে, বড়দের ফ্রকে এই সাইড ডার্ট দেওয়া হয়।

৬) ফিস ডার্ট ঃ ফিস অর্থাৎ মাছ যে ডার্ট মাছের আকৃতির মতো দেহের ফিটিং আনা হয় তাকে ফিস ডার্ট বলে।

টাক কি?

টাক সবসময় কাপড়ের সোজা দিকে দেওয়া হয় ইহা কাপড়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করা এবং শেষে ভালো করে বন্ধ করে দিতে হয়। টাক পোশাক সুন্দর করার জন্য দেওয়া হয়। টাক কাপড় কমানোর জন্য দেওয়া হয়। টাক দুই প্রকারের হয় যেমন- ক) পিং টাক খ) ব্রড টাক

পিং টাককে কয়েকভাগে ভাগ করা হয় যেমন - হোরাইজেন্টাল টাক, ভারটিকাল টাক, ক্রস টাক, ডাইমন্ড টাক, রাউন্ড টাক ইত্যাদি। ব্রড টাক সাধারণত ১ পূর্ণ ১/২ ইঞ্চি চওড়া হয় এই টাক মেয়েদের ফ্রকে, কামিজে, ডিজাইনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

১) হোরাইজেন্টাল টাক ঃ যে টাক আড়াআড়ি ভাবে দেওয়া হয় তাকে হোরাইজেন্টাল টাক বলে। সার্টের পকেট এই টাক দিয়ে ডিজাইন করা হয়।

২) ভারটিকাল টাক ঃ যে টাক লম্বাভাবে দেওয়া হয় তাকে ভারটিকাল টাক বলে।

৩) ক্রস টাক ঃ কোণাকোণী তেরচা কাপড়ে যে টাক দেওয়া হয় তাকে ক্রস টাক বলে।

৪) ডায়মণ্ড টাক ঃ ক্রস টাক যেমন একটি কোণ থেকে দেওয়া হয় ডায়মন্ড টাক দুই কোন থেকে শুরু করে শেষ করতে হয়।

৫) রাউন্ড টাক ঃ এই টাক গোল ভাবে দেওয়া হয়। তাই একে রাউণ্ড টাক বলে।

21. প্লিট কি?

ভূমিকা ঃ প্লিট বস্ত্র বা পোশাকে কাপড় যেখানে দরকার সেখানে কম করবার জন্য কাপড় সুন্দর করার জন্য, ডিজাইন করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

সাবধানতা ঃ প্লিট ছোট দিলে একটু দূরে গিয়েই খুলে যায়। চওড়া দিলে বরাবর শেষ পর্যন্ত কুচি হয়ে থাকে এই জন্য চওড়া প্লিট দেওয়া উচিত। প্লিট দেওয়ার সময় কাপড়কে সোজা করে প্লিট মুড়ে কাঁচা সেলাই করে প্লিট দিতে হবে এবং কুঁচির একটু নিচে উপরে ও নিচে পিন লাগাতে হবে এবং ইস্ত্রি করে নিতে হবে। প্লিট সব সময় উপরের ভাগে সেলাই হবে শেষ পর্যন্ত হবে না একটা দুই-পূর্ণ-এক-এর-দুই-ইঞ্চি কুঁচির জন্য সাড়ে সাত ইঞ্চি কাপড়ের প্রয়োজন।

১) সিম্পল প্লিট ঃ ডবল কাপড় দিয়ে যে কোন একদিকে মুড়ে দেওয়াকে সম্পল প্লিট বলে যা উল্টোদিকে মোড়া হয় তাকে রিভার্স প্লিট বলে। যা সামনের দিকে মোড়া হয় তা ফরওয়ার্ড প্লিট বলে।

২) বক্স প্লিট ঃ এই প্লিট প্রথমে কাপড়কে ডবল করে মুড়ে কিছুদূর দিয়ে পুরটা মেশিনে সেলাই দিতে হবে। তারপর কাটিয়ে নিয়ে সেলাই দিতে হবে।

৩) ইনভার্টেড বক্স প্লিট ঃ এটা বক্স প্লিটের মতোই হবে, এটা পুরো সেলাই হবে না শুধু উপরের দিকে সেলাই হবে আর মুখোমুখি দিকে দুটি দুটি কুচি থাকবে মাঝখানটা ফাঁকা থাকবে এই প্লট বুটসার্ট, মিলিট্যারি সার্ট দেওয়া হয়।

৪) ফলস্ প্লিট ঃ উপর থেকে আলাদা করে বক্স তৈরী করে লাগিয়ে দেওয়া ফলস্ প্লিট বলে। যেখানে কাপড় কম থাকে সেখানে এই প্লিট দেওয়া হয়।

৫) নাইফ প্লিট ঃ নাইফের অর্থ ছুরি এই প্লিট ছুরির আকারে হয়। এটা তৈরী করতে গেলে প্রথমে প্লট দিয়ে তার কিছু দূরে ছুরির আকারের সেলাই দিতে হবে। নিচের দিকটা খোলা ছেড়ে দিতে হবে।

৬) পার্মানেন্ট প্লিট ঃ পট্টির মোপড়ে দুটি দিকে সেলাই হবে শুধু থেকে শেষ পর্যন্ত।

হেম এবং এজ ঃ

হেম ঃ কাঁচি দিয়ে কাটার পরে যে কাপড়ের কিনারা হয় তাকে এজ বলে। কাপড় কাটার পর ধারে এক-এর-চার-ইঞ্চি মুড়ে তারপর আবার ডবল মুড়ে সেলাই করাকে হেম বলে। হেম তৈরী করার আগে সাবধানতা - যখন হেম করতে হবে তখন এর এজকে সোজা করে কেটে নিতে হবে তবেই সেই হেম সুন্দর হবে। কিনারা মজবুর ও সুন্দর করার জন্য এবং যাতে সুতো বের না হয় এর জন্য হেম করতে হবে। হেম অনেক রকমের হয় যেমন -

১) নেরো হেম ঃ এ সাধারণত কামিজ, কুর্তা, ব্লাউজ, ফ্রক ইত্যাদিকে করা হয় এই হেম খুব ছোট ছোট হয়, প্রথমে এক-এর-চার-ইঞ্চি মুড়ে তারপর আবার মুড়ে হেম করাকে নেরো হেম বলে।

২) ব্রড হেম ঃ এটা তৈরী করতে গেলে প্রথমে কাপড়ের কিনারার উল্টো দিকে এক-এর-চার-ইঞ্চি মুড়ে তারপর এক-দুই-ইঞ্চি মুড়ে হেম করাকে ব্রড হেম বলে।

৩) রোল্ড হেম ঃ কাপড়ের কিনারাকে প্রথমে বুড়ো আঙুলের দ্বারা গোল করে হেম করাকে রোল্ড হেম বলে।

৪) ব্লাইন্ড হেম ঃ এ রোল্ড হেমের মতই হবে তারপর এমনভাবে হেম করতে হবে যাতে সেলাই দেখা যায় তাকে ব্লাইন্ড হেম বলে।

৫) ফলস্ হেম ঃ যখন কাপড় লম্বায় কম হয়ে যায় আর মোড়ার কাপড় থাকে না তখন ঐ রঙের কাপড় লাগিয়ে আলাদা পট্টি লাগিয়ে হেম করাকে ফলস্ হেম বলে।

৬) সেলজ হেম ঃ এই হেম লেডিস গার্মেন্ট পোশাক সুন্দর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। প্রথমে কাপড়ের এক-এর-চার-ইঞ্চি কাপড় মুড়তে হবে এবং ইস্ত্রি করতে হবে তারপর মজবুত সুতো দিয়ে ইংরাজি বী আকারে রান স্টিচ দিতে হবে তারপর সুতো টেনে দিতে হবে এবং এ আপনা থেকে গোল্ড হয়ে যাবে। তারপর প্রেস করতে হবে এবং নীচে মেসিন দিতে হবে এবং হিয়ের কুচি খাড়াখাড়া থাকবে।

৭) ফেগটিং হেম ঃ এই হেম লেডিস পোশাকে করা হয় যখন ঝুলে হয়ে যায় তখন আরেকটা পট্টি লাগিয়ে হেম মোনের মত সেলাই করাকে ফেগটিং হেম বলে।

স্টিচ কি?

১) রান স্টিচ্ ঃ যে সেলাই সব সময় আগে যায় পিছনে নয় তাকেই বলে রান স্টিচ্। এই সেলাই কুচি করতে ও ব্যবহার করা হয়। রান সেলাই কাপড়কে এক সঙ্গে জুড়তে কাজে লাগে। এই সেলাই দিয়ে কাঁথা স্টিচ করা হয় এই সেলাই খুব তাড়াতাড়ি হয়।

২) বাস্টিং স্টিচ ঃ কাঁচা সেলাই যেকোনো কাপড়ের ওপরের সেলাই করাকে বাস্টিং স্টিচ বলে এক ইঞ্চি বড় বা ছো তার থেকে ছোট প্রতিটি সেলাই সমান হবে ও রানের মত এগিয়ে যাবে এই সেলাই কাপড় জোড়ার কাজে ব্যবহার করা হয়।

৩) অ্যান ইভেন স্টিচ ঃ এই সেলাই অনেক জায়গায় ব্যবহার হয়। এই সেলাই এর ফোর উপরের দিকে ছোট ও উল্টো বড় নেওয়া হয়। কিন্তু উপর নিচে পার্থক্য বোঝা যায় না। এই সেলাই একটা বড় ও একটা ছোট হয়।

৪) ক্রস স্টিচ ঃ এই সেলাই টেলারিং এ খুবই প্রয়োগ করা হয়। এতে সূচ তেরছা করে নিয়ে কাপড়ে সেলাই করা হয়। এ সাধারণত প্যান্টের হিপ বা হাই লাইনে সেলাই করা হয়। কাপড়ের সুতো বের না হয় সেই জন্য করা হয়। মেটি ক্লথ, সেলজ কাপড়ের উপর ঘর গুনে ডিজাইন করা হয় অথবা চটের আসনে এই সেলাই করা হয়।

৫) হেরিং বোন স্টিচ ঃ ৪৫ ডিগ্রি সেলাই ক্রস করে সেলাই করাকে হেরিং বোন স্টিচ বলে। এই সেলাই ডেকারেটিং বা বস্ত্রকে সুন্দর করার জন্য এই সেলাই দেওয়া হয়।

৬) ব্লান কেট স্টিচ ঃ এই সেলাই গরম কাপড়ের ধারে বাধন দেওয়ার জন্য করা হয়। একটা সোজা লাইনের উপর করা হয় এবং সেলাই এর মাথায় চেনের মত দেখা যায়।

৭) ওভার কাস্টিং স্টিচ ঃ এই সেলাই সব কাপড়ে ব্যবহার করা হয় না উলেন কাপড় বা রেশ্মি কাপড়ের উপর বেশি ব্যবহার করা হয় যে কাপড়ের সুতো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় তাতেই বেশি ব্যবহার করা হয়। এই সেলাই এক তার সুতোয় সেলাই করা হয়।

৮) চেন স্টিচ ঃ এই সেলাই চেনের মত গঠন করা হয় সূচের মুখে সুতো দিয়ে লুপ তৈরীকে চেন বলে। এ শুধু ডেকারেটিং এই জন্য ব্যবহার করা হয়।

৯) পেড স্টিচ ঃ এইটি ভী আকারে হয় যেখানে বক্রম থাকে সেখানেই এই সেলাই দিতে হয়।

১০) সাটি স্টিচ ঃ এ এক সাধারণ প্রকারের সেলাই এই সেলাই বস্ত্রকে সুন্দর করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এই সেলাই দুপিঠে এক রকমের হয়।

১১) লুপ স্টিচ ঃ প্রথমে তিন চার বার সুতোর একের উপর এক রেখে তার উপর বোতাম স্টিচ করাকে লুপ স্টিচ বলে।

১২) বেক স্টিচ ঃ একে অনেকেই মেসিন স্টিচ বলে (বাই হোল্ড) একটা ফোর তুলে আবার পিছন থেকে নিতে হয়। এতে উপরটা মেসিনের মত হবে কিন্তু নিচের সেলাই দেড় গুণ হতে হবে।

১৩) বাটন হোল স্টিচ ঃ বাটন হোল মানে বোতামের গর্ত করা স্টিচ। এই স্টিচ অনেক রকমের হয়। এই কাপড়েত্র মধ্যে সূচ দিয়ে গোল অথবা লম্বা কাটা জায়গার মধ্যে সেলাই করতে হয়।

১৪) স্টাব স্টিচ ঃ বোতাম লাগানোর জন্য যে সেলাই দেওয়া হয় তাকে ষ্টাব স্টিচ বলে। প্রথমে সূচ ৪ নং সুতো পরিয়ে বোতাম লাগাতে হবে। এই সেলাই কিছুটা আলগা থাকবে এবং বোতারে নিচের সেলাইকে আলগা করে দিতে হবে। সেই জায়গাটার নাম বাটন ষ্ট্যাণ্ড।

১৫) ফাইন স্টিচ ঃ কোট-প্যান্টে এই সেলাই দেওয়া হয়। সূচের এক তার সুতো পরিয়ে ছোট ছোট সেলাই কোটের কলারে, প্যান্টের ফ্লাইয়ে ও পকেটে এই সেলাই করা হয়। এই সেলাই ব্যাক স্টিচের মত হয় এবং এক-এর চার ইঞ্চি দুরে দুরে হয়। এ কাপড়ের কিনারায় যেখানে খুব উঁচু বা মোটা জায়গায় এই সেলাই দেওয়া হয় এবং খুব মজবুত হয়।

সিজারস এবং সেয়ারসের পার্থক্য কি ?

সিজারাস	সেয়ারস
ছোট কাচিকে সিজার বলে। আঙুল ঢোকাবার জন্য দুটি গর্ত আছে এর দুটি গর্তই সমান এই কাচি ৬ ইঞ্চি থেকে ১০ ইঞ্চি মাপের হয় এই কাঁচি সুতো কাটবার জন্য ব্যবহার করা হয়।	বড় কাচিকে সেয়ারস বলে। ইহার দ্বারা জামা কাপড় কাটা হয়। ইহা সাধারণত ১০ ইঞ্চি, ১২ ইঞ্চি, ১৪ ইঞ্চি মাপের হয়। ইহার যে দুটি আঙ্গুল ঢোকার গর্ত আছে তার একটি গোল ও অপরটি লম্বা আকৃতির মতো ইহার গোল দিকটা একটা আঙ্গুল (বৃদ্ধ) আর লম্বা দিকটা চারটি আঙুল ঢোকাতে হয়।

ডার্নিং এবং মেনডিং এর পার্থক্য

ডার্নিং	মেনডিং
কাপড় থেকে সুতো তুলে যে রিপু করা হয় তাকে ডার্নিং বলে এটা দেখতে একেবারে নিখুঁত হয়।	ম্যাচিং সুতো দিয়ে যে রিপু করা হয় তাকে মেনডিং বলে।

লে আউট এবং লেমার্কস এর পার্থক্য

লে আউট	লে মার্কস
কাগজের উপর ড্রয়িং প্যাটার্ন করে সেই প্যাটার্ন যখন কাপড় বিছিয়ে নিয়ে অর্থাৎ কাগজের পাস দিয়ে কাপড়ের উপর দাগ দেওয়াকে লে আউট বলে।	ম্যাচিং সুতো দিয়ে যে রিপু করা হয় তাকে মেনডিং বলে।

পাফ স্লিভ এবং গেদার স্লিভ এর পার্থক্য

প্লাফ স্লিভ	গেদার স্লিভ
ইহা লম্বা কাপড়ের কাটা হয় শুধু মহরার দিকে কুচি হয়। মহুরির মাপ অনুযায়ী ডার্ট সেলাই দিতে হয়। মহরির মাঝখানে একটা বড় ডার্ট দেওয়া হয় ও দুই পাশে একটা ছোট ডার্ট দেওয়া হয়। ইহা তেরচা কাপড়ে হয়। সাধারণত এই কুঁচি এক জায়গায় অনেক থাকে বলে একে তাদের স্লিভ বলে।	এটা তেরচা কাপড়ের হয় সাধারণত এই কুচি এক জায়গায় অনেক থাকে বলে একে গেদার স্লিভ বলে। মহরা ও মহরী উভয় দিকেই এই কুচি করা হয়। মহরার ডান দিকে কুঁচি দিয়ে মহরীর বাম দিকে কুঁচি হয়। বেশি কুঁচি হওয়ার জন্য সমস্ত হাতটি ফুলে থাকে। সেই জন্য পাফ স্লিভে এক দিকে কুঁচি হয়। আর গেদার স্লিভ দুইদিকে কুঁচি হয়।

বাউন্ড বাটন হোল এবং স্টিচ বাটন হোলের পার্থক্য ?

বাউন্ড বাটন হোল	স্টিচ বাটন হোল
লেডিস কোট কাপড় বসিয়ে যে বোতাম ঘর করা হয় তাকে বাউন্ড বাটন হোল বলে।	বোতাম স্টিচ দিয়ে যে লতা পাতার স্টিচ করা হয় তাকে স্টিচ বটন হোল বলে।

প্লিট এবং টাকস্ এর পার্থক্য

প্লিট	টাকস্
শরীরের গঠন অনুযায়ী ফিটিং আনার জন্য প্লিট দেওয়া হয়। ইহা সাধারণত কাপড়ের উপর ভাগে দেওয়া হয়। নিচের দিকে খোলা থাকে ফ্রক, ম্যাক্সি, প্যান্ট, সার্টে প্লিট দেওয়া হয়। প্লট ছোট হলে কিছু দুরে গিয়ে খুলে যাবার সম্ভাবনা থাকে সেই জন্য ডেড় ইঞ্চি বা দুই ইঞ্চি প্লিট দেওয়া দরকার। এটা বিভিন্ন ধরনের হয়। যেমন - বক্স প্লিট, সিম্পল প্লিট, পার্সাট প্লিট ইত্যাদি।	টাকস সাধারণতঃ সোজা দিকে দিতে হয় এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দিতে হয়, শুরু এবং শেষ ভালো করে বন্ধ করে দিতে হয়। টাকস্ সাধারণত দুই প্রকার হয়। যেমন ১) পিন টাকস্ ২) ব্রট টাকস্। পিন টাকস্ কে আবার কয়েকভাগে ভাগ করা হয়। যেমন - হোরাইজনটাল টাকস, ভারটিকাল টাকস, ডায়মন্ড টাকস, ক্রস টাকস ইত্যাদি।

মেনডিং এবং প্যাচিং এর পার্থক্য

মেনডিং	প্যাচিং
যে কোন সুতি বা গরম জামা ফেসে খোচা লেগে ছিড়ে গেলে তার উপর রিপু করতে হয়। এ মেসিন বা হাতে দুই ভাবেই করা যায়। মেসিন রিপু করার সময় কাপড়টি ফ্রেমে আটকিয়ে প্যাসার ফুট খুলে সামনে ও পিছনে করে মেসিন চালিয়ে রিপু করা হয়, রিপু করার সময় আগে একটা ছোট ছোট রান সেলাই দিতে হয়। এইভাবে কাটা জায়গায় সম্পূর্ণ ভরাট হলে আবার উল্টে থেকে একই ভাবে রান সেলাই দিতে হয় এতে কাটা জায়গাটা ভরাট হয়ে যায়। রিপু করার সময় যে রঙের কাপড় সেই রঙের সুতো ব্যবহার করা উচিত।	গরম বা সুতি কোন জামা কাপড় বা আগুনে পুড়ে যায় সেই জায়গায় তালি দিতে হয়। তালি দেবার সময় কাপড়ের রং অনুযায়ী তালির কাপড় হওয়া উচিত কাপড়ে ছেড়া যতটা থাকবে তার তুলনায় যাতে ছেড়া জায়গাটা যাতে সম্পূর্ণ ভাবে ঢাকা যায়। কাটা জায়গার উপর সোজা করে তালি দেওয়া কাপড়টা বসাতে হবে। এইবার কাপড়টাকে চার ধারে মুড়ে হেম সেলাই দিতে হবে। আবার ভিতর দিক থেকেও হেম সেলাই দিতে হবে, গরম কাপড় হলে হেরিং বোনের সেলাই করতে হবে।

গোল কাটের সায়া ও ছয় কাটের সায়া এর পার্থক্য

গোল কাটের সায়া	ছয় কাটের সায়া
১) গোল কাটের সায়া বৃদ্ধ মহিলারা পরে।	১) ছয় কাটের সায়া সাধারণত অফিস কর্মীরা, স্কুল কলেজের মেয়েরা বেশি পরে।
২) গোল কাটের সায়া সিট এবং ঘের সমান হয়।	২) ছয় কাটের সায়া সিট ছোট এবং ঘের বড় হয়।
৩) গোল কাটের সায়া পরলে শাড়িতে ভাঁজ পড়ে। কোমটা বেশী মোটা লাগে বলে সেপ সুন্দর হয় না।	৩) ছয় কাটের সায়া পরলে মেয়েদের সিট সুন্দর এবং স্মার্ট লাগে।
৪) গোল কাটের সায়া আগে চলতো বর্তমানে চলে না।	৪) ছয় কাটের সায়া বর্তমানে বেশি চলে।
৫) গোল কাটের সায়া কুঁচি থাকে এবং মোটা হয় তার জন্য শুকাতে দেরি হয়।	৫) ছয় কাটের সায়া তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

নারী ও পুরুষের পার্থক্য কী ?

নারী	পুরুষ
১) মেয়েদের নরমাল ছাতি হয় ৩২ ইঞ্চি।	১) ছেলেদের নরমাল ছাতি হয় ৩৬ ইঞ্চি
২) মেয়েদের কোমর এবং সিট ৪ ইঞ্চি তফাৎ হয়।	২) ছেলেদের কোমর এবং সিট ৫ ইঞ্চি তফাৎ হয়।
৩) মেয়েদের ২০ বছর পর লম্বায় বৃদ্ধি হয় না।	৩) ছেলেদের ২৫ বছর পর লম্বায় বৃদ্ধি হয় না।
৪) মেয়েদের নরমাল হাইট ৫ ফুট থেকে সাড়ে পাঁচ ফুট হয়।	৪) ছেলেদের নরমাল হাইট সাড়ে পাঁচ ফুট থেকে ৬ ফুট হয়।
৫) মেয়েদের মাংস পেশী বেশী হয়।	৫) ছেলেদের মাংসপেশী কম হয়।
৬) মেয়েদের শরীর কোমল হয়।	৬) ছেলেদের শরীর শক্ত হয় এবং মজবুত হয়।
৭) মেয়েদের ত্বক নরম হয়।	৭) ছেলেদের ত্বক শক্ত হয়।
৮) মেয়েদের ওজন কম হয়।	৮) ছেলেদের ওজন বেশী হয়।
৯) মেয়েদের কাঁধ ছোট এবং গোল হয়।	৯) ছেলেদের কাঁধ বড় এবং পয়েন্টেড হয়।
১০) মেয়েদের ঘাড়ের উচ্চতা বেশী হয়।	১০) ছেলেদের ঘাড়ের উচ্চতা কম হয়।
১১) মেয়েদের ট্রঙ্ক Four Head হয়।	১১) ছেলেদের ট্রঙ্ক তিন পূর্ণ তিন এর Head চার হয়।
১২) মেয়েদের পায়ের দিক তিন পূর্ণ তিন এক চার Head হয়।	১২) ছেলেদের পায়ের দিক Four Head হয়।
১৩) মেয়েদের উচ্চতা কম হয়।	১৩) ছেলেদের উচ্চতা বেশী হয়।
১৪) মেয়েরা অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমী হয়।	১৪) ছেলেরা অপেক্ষাকৃত বেশী পরিশ্রমী হয়।

মেসিন পার্টস এবং মেসিন অ্যাটাচমেন্ট এর পার্থখ্য

মেসিন পার্টস	মেসিন অ্যাটাচমেন্ট
১) মেসিন পার্টস কথাটার অর্থ হল যন্ত্র।	১) মেসিন অ্যাটাচমেন্ট কথাটির অর্থ হল সহায়ক যন্ত্র।
২) মেসিন পার্টস ছাড়া মেসিন চলে না।	২) মেসিন অ্যাটাচমেন্ট ছাড়াও মেসিন চলে।
৩) মেসিন পার্টস বলতে বুঝি মেসিনের মধ্যে অবস্থিত ববিন সার্টেল ইত্যাদি।	৩) মেসিন অ্যাচাটমেন্ট বলতে বুঝি হেমার ফুট রফেলার বাইন্ডার ফুট লটার ইত্যাদি।
৪) মেসিন পার্টসে কুঁচি করতে বেশী সময় লাগে।	৪) মেসিন অ্যাটাচমেন্ট এর সাহায্যে কুঁচি করতে গেলে কম সময় লাগে।

হেম এবং হেম স্টিচের পার্থক্য

হেম	হেম স্টিচ
১) হেম কাপড়ের চার দিকে মুড়ে উপরের সাথে নিচের কাপড়ের জোড়া দেওয়া হয় হেমের সাহায্যে পাঞ্জাবী, ব্লাউজ, জামার হাতা, প্যান্টের নিচে ইত্যাদি জায়গায় দেওয়া হয়।	১) এই সেলাই সুতো তুলে করতে হয়। সাধারণত বেড কভার, টেবিল ক্লথ, রুমাল ইত্যাদিতে করা হয়।

ড্রাফটিং এবং লে-আউট পার্থক্য কি

ড্রাফটিং	লে আউট
ড্রাফটিং কথাটির অর্থ হল প্যাটার্ন। কোন কাপড়ের উপর সমস্ত প্যাটার্নগুলিকে পেতে চক দিয়ে চারদিকে অঙ্কন করলে যে ছাপ পড়ে তাকে ড্রাফটিং বলে।	কাগজের উপর প্যাটার্ন করে সেই প্যাটার্ন কাপড়ে বিছিয়ে নিয়ে সাইড দিয়ে দাগ দেওয়াকে লে-আউট বলে।

ডাইরেক্ট মেজারিং সিস্টেম এবং বেসিক মেজারিং সিস্টেম এর পার্থক্য

ডাইরেক্ট মেজারিং সিস্টেম	বেসিক মেজারিং সিস্টেম
১) ডাইরেক্ট মেজারিং সিস্টেম কথাটির অর্থ হল সোজাসুজি অর্থাৎ শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের মাপ নিয়ে তার ভাগ না করে সীম অ্যালাউন্স বা বার্তি কাপড় নিয়ে কাপড় কাটাকে বলা হয় ডাইরেক্ট মেজারিং সিস্টেম এ কথাটি ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন - 1) Depth of seye 2) shoulder 3) Across chest 4) Over shoulder	১) বেসিক কথাটির কথাটির অর্থ হল প্রাথমিক। শরীরের অঙ্গের মাপ নিয়ে পোষাক কাটাকেই বেসিক মেজারিং সিস্টেম বলে। যেমন - ছাতি, ঝুল, পুট ইত্যাদি।

লাইনিং এবং ইন্টার লাইনিং এর পার্থক্য

লাইনিং	ইন্টার লাইনিং
লাইনিং বলতে বোঝায় আসল কাপড়ের নিচে যে কাপড় দেওয়া হয় তা হল লাইনিং। যেমন-কোন বেনারসি ব্লাউজের নিচে সেই রঙের অন্য কাপড় দিয়ে সেলাই করা হয় পাতলা কোন ফ্রক করতে গেলেও এই লাইনিং দেওয়া হয় উপর থেকে একে দেখা যায় না।	দুটি কাপড়ের মধ্যে যে যে কাপড় বা বস্তু থাকে তা হল ইন্টার লাইনিং যেমন ছেলেদের কলার কাফে যে বক্রম থাকে তা হল ইন্টার লাইনিংম অর্থাৎ যাকে সামনে ও পিছনে কোন দিক দিয়ে দেখা যায় না।

ইন-লে এবং লে-আউট এর পার্থক্য কী ?

ইন-লে	লে-আউট
পোষাক কাটার সময় যে বার্তি কাপড় রাখা হয় তাকে ইন-লে বলে। অর্থাৎ কোন পোষাক কাটার সময় দর্জির সুবিধার জন্য হাফ ইঞ্চি বা এক ইঞ্চি কাপড় বেশী রেখে কাটাকে ইন-লে বলে। এতে পোষাক ছোট হলে তা বড় করা যায় ঐ অতিরিক্ত কাপড়ের সাহায্যে।	প্যাটার্ন করা কাপড়ের উপর বিছিয়ে যে অঙ্কন করা হয় তাকে লে-আউট বলে। এতে কাপড়ের আড়া খাড়া বোঝা যায়। প্যাটার্ন ভুল থাকলে তা সংশোধন করা যায়। চেক কাপড় সেলানো যায়। পিছলানো কাপড় হলে লে-আউট খুব সুবিধা কারণ পিন দিয়ে কাপড়কে আটকে রেখে কাটা যায়। কাপড়ের উল্টো দিকে লে-আউট করতে হয়।

ভেল্ট আর স্লিট এর পার্থক্য কী ?

ভেল্ট	স্লিট
কোটের পিছনে যে ছেড়া থাকে তাকে ভোল্ট বলে।	ফুল হাতা সার্টের হাতার কাফের উপর যে ছেড়া থাকে তাকে স্লিট বলে।

ইন-লে এবং গ্রেডিং এর পার্থক্য কি ?

ইন-লে	গ্রেডিং
কাপড়ের ভিতরে যে বাড়তি কাপড় রাখা হয় তাকেই ইন-লে বলে। অর্থাৎ কোন কাপড় কাটার সময় দর্জির সুবিধার জন্য হাফ ইঞ্চি অথবা এক ইঞ্চি কাপড় বেশি রেখে কাটাকে ইন-লে বলে।	গ্রেডিং কথাটির অর্থ হল বড়। এখানে গ্রেডিং বলতে বেশি বোঝায় অর্থাৎ কোন পোশাক কাটার সময় সব দিকে ২ ইঞ্চি বেশি কাপড় রাখাকে গ্রেডিং বলে। সাধারণত কারখানায় কম সময়ে গ্রেডিং এর সাহায্যে কাপড় কাটা হয়। এতে কম সময়ে অনেক কাপড় কাটা হয়। এতে কম সময়ে অনেক কাপড় কাটা যায়।

গাইড লাইন এবং গ্রেড লাইন এর পার্থক্য

গাইড লাইন	গ্রেড লাইন
যে রেখা আধারের উপর টানা হয় যা পুরো লম্বা টানা হয় তাকে গাইড লাইন বলে।	লম্বা ও চওড়া দিকে সুতো আলাদা করলে যে লাইন আসে তাকে গ্রেন লাইন বলে।

ফরওয়ার্ড ব্যালেন্স ও ব্যাক ওয়ার্ড ব্যালেন্স পার্থক্য

ফরওয়ার্ড ব্যালেন্স	ব্যাক ওয়ার্ড ব্যালেন্স
সামনে পিছনে সমান থাকাকে ব্যালেন্স বলে সামনের দিকে ঝুঁকে যাওয়াকে যেমন - ৬০ মিলিটারিদের সাধারণত এই ব্যালেন্স দেখা যায়।	পিছনে দিকে ঝুকে যাওয়াকে ব্যাক ওয়ার্ড ব্যালেন্স বলে। যেমন - আর্মি।

ব্যালেন্স মার্ক এবং ব্যালেন্স নচ এর পার্থক্য

ব্যালেন্স মার্ক	ব্যালেন্স নচ
পোষাকের বিভিন্ন অংশ একত্রে ঠিকভাবে সেলাই করতে গেলে ব্যালেন্স মার্ক কাজকে ঠিকভাবে পরিচালনা করে। যেমন-কোট প্যানটে এই চিহ্ন দেওয়া হয়। কাপড় কাটার সময় ব্যালেন্স মার্ক দেওয়া হয়। যে কোন পার্ট যাতে উপরে নিচে না নামে দুটোই যাতে সমান থাকে বা সামনে অথবা পিছনে একই অবস্থা থাকে সেই জন্য ব্যালেন্স মার্ক দেওয়া হয়।	যেখানে অধিক মাত্রা কাজ হয় সেখানে সময় কমের জন্য ব্যালেন্স মার্ক না লাগিয়ে সরাসরি কাঁচির দ্বারা চিহ্ন করে পোশাক তৈরি করা হয় তাকে ব্যালেন্স নচ বলে। এই ভাবে করলে দু পাটই সমান ভাবে থাকে এবং সুন্দর ফিটিংস হয় ও সময় কম লাগে।

স্কেল ড্রয়িং এবং ড্রফটিং এর পার্থক্য

ব্যালেন্স মার্ক	ব্যালেন্স নচ
স্কেলের দ্বারা খাতাতে যে ড্রয়িং করা হয় তাকে স্কেল ড্রয়িং বলে।	কাপড়ের উপরের যে ড্রয়িং করা হয় তাকে ড্রফটিং বলে।

হানি কম্ব এবং স্মোকিং এর পার্থক্য

হানি কম্ব	স্মোকিং
ইহা মেয়েদের জামার কোমরে, বুকে, হাতে দেওয়া হয়। হানি কম্ব যেখানে প্রথমে ৭ ।৮ লাইন রান সেলাই দিয়ে কাপড় টেনে কুচকে নিতে হবে এবার একটি কুটির সঙ্গে আর একটি সেলাই দিতে হবে এরপর উপর থেকে নিচের দিকে এক এর চার ইঞ্চি বা হাফ ইঞ্চি নামিয়ে যে দুটি কুঁচির উপর সেলাই হয়েছে তার দ্বিতীয় কুঁচির সঙ্গে বখেয়া সেলাই দিতে হবে তাকে হানি কম্ব বলে।	স্মোকিং ও একইভাবে কুচি করে তবে এর কুচি একটু ছোট ছোট হবে। তারপর কুঁচির সঙ্গে আর একটি কুঁচি নিয়ে ভাল সেলাই দিতে হবে। বিভিন্ন রং এর সাহায্যে এই সেলাই করা হয়।

হেরিং বোন স্টিচ ও ক্রস স্টিচ এর পার্থক্য

হেরিং বোন স্টিচ	ক্রস স্টিচ
এই স্টিচ পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ফুল লতাপাতা ইত্যাদি দেওয়া হয়। এই সেলাই বিভিন্ন রঙের হয়। এতে সব সময় নিচের থেকে সুতো তুলে ব্যাক্ স্টিচ এর মতো পিছনে সূচ ঢোকাতে হয় এবং এই ফোরের বিপরীত দিকে আর একটি ফোর তুলতে হয়। উল্টো দিকে বখেয়ার মতো সেলাই হয় কিন্তু সোজা দিকে ক্রস স্টিচ এর মতো প্লেন কাপড়ে সেলাই হয়।	ক্রস স্টিচ সাধারণত চট, সেলুলা, কার্পেট, মেটি ক্লথ ইত্যাদিতে সেলাই দেওয়া হয় একটি ফোরের উপর আর একটি ফোর কোণাকোণিভাবে সেলাই দিতে হবে। ইহার দ্বারা আসন, টেবিল ক্লথ, বেড কভার ইত্যাদি সেলাই করা হয়।

মেজারিং সিস্টেম কত প্রকারের হয় ?

মেজারিং সিস্টেমকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায় - ১) বেসিক মেজারিং সিস্টেম, ২) চেস্ট মেজারিং সিস্টেম, ৩) ডাইরেক্ট মেজারিং সিস্টেম, ৪) সোল্ডার মেজারিং সিস্টেম, ৫) কমপাউন্ড মেজারিং সিস্টেম ইত্যাদি।

১) বেসিক মেজারিং সিস্টেম ঃ পোশাক তৈরি করার জন্য যে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মাপ নেওয়া হয় তাকে বেসিক মেজারি সিস্টেম বলে। যেমন - ছাতি, ঝুল, পুট ইত্যাদি।

২) চেস্ট মেজারিং সিস্টেম ঃ শুধুমাত্র ছাতির মাপ নিয়ে অন্যান্য মাপগুলি বের করে নিয়ে যে পোশাক তৈরী করা হয় তাকে চেস্ট মেজারিং সিস্টেম বলে। যেমন ছাতি ৩২ হলো।

৩) ডাইরেক্ট মেজারিং সিস্টেম ঃ শরীরের পুরোপুরি মাপ নিয়ে বাড়তি কাপড় যোগ করে যে পোশাক কাটা হয় তাকে ডাইরেক্ট মেজারিং সিস্টেম বলে। এটা আবার চার প্রকার হয়, যেমন - 1) Depth of seys 2) Front shoulder 3) Across chest 4) Over shoulder সেলাইয়ের জন্য যে বাড়তি কাপড় রাখা হয় তাকে Seom Alauns বলে।

৪) সোল্ডার মেজারিং সিস্টেম ঃ কোট তৈরীর জন্য ফিটিংস আনার জন্য আর অনেক মেনজিং হয়। এই সেলাই চার প্রকারের হয়। যেমন - ১) আপার সোল্ডার ২) মিডিল সোল্ডার ৩) লেয়ার সোল্ডার ৪) নেক অফ ওয়েস্ট সোল্ডার ৫) কমপাউন্ড মেজারিং সিস্টেম ঃ বেসিক এবং ডাইরেক্ট মেজার সিস্টেম একত্রে করে কমপাউন্ড মেজারিং সিস্টেম তৈরী করা যায়।

মাপ নেবার সময় সতর্কতা ঃ

১) গ্রাহক ডান পাশে দাড়াতে হবে। ২) পর পর মাপ নিতে হবে যেমন - চেষ্ট ওয়েস্ট বটম ইত্যাদি অথবা লম্বালম্বি ভাবে মাপ নিতে হবে ঝুল, হাতা, সাইড লেন্থ ইত্যাদি। ৩) প্রত্যেকটি মাপ সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখতে হবে চারটি আঙুল ফিতের মধ্যে ঢুকিয়ে মাপ নেওয়া উচিত। ৪) ঢিলা বা টাইট মাপ নেওয়া উচিত নয়। ৫) সোজা ভাবে গ্রাহককে দাঁড় করিয়ে মাপ নেওয়া উচিত। ৬) কথা বলতে বলতে মাপ নেওয়া উচিত কারণ মাপার সময় শ্বাস প্রশ্বাস বেশি পড়ে না বা একেবারেও শ্বাস আটকিয়ে ও বডি ফুলতে পারে না। ৭) শরীরে ক্ষত থাকলে তা দেখে নিতে হবে যেমন -বো-লেগ, নক-নি ইত্যাদি। ৮) গ্রাহকের নাম, ঠিকানা, লিখে রাখা উটিত। ১০) শ্বাস প্রশ্বাস না লাগে সে বিষয়ে সতর্কথাকা উচিত কারণ অনেকের অনেক রকম রোগ থাকে যা শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

পোশাক কাটার পূর্বে কি কি বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত ?

১) কাপড় সোজা না উল্টো না তা দেখে নিতে হবে। ২) মোটা জাতীয় কাপড় হলে তা ধুয়ে নিতে হবে এবং এমন ভাবে রাখতে হবে যাতে কোনো দাগ না লাগে। ৩) কাটিং টেবিলের উপর যাতে কোন দাগ না থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ৪) কাপড় সমানভাবে ইস্ত্রি করা আছে কিনা তা দেখতে হবে। ৫) কাপড়ের কোন ডিফেক্ট থাকে সেই স্থানে ক্রস চিহ্ন দিতে হবে। ৬) কাপড় আড়া না খাঁড়া তা দেখে নিতে হবে। ৭) যাতে কম কাপড়ে কাটা যায় তা দেখতে হবে। ৮) কাপড় মাপ মত আছে কিনা দেখতে হবে। ৯) যদি সিল্ক পিচ্ছল জাতীয় কাপড় হয় তাহলে পিন দিয়ে আটকে নিতে হবে যাতে কাপড় পিছলে না যায় বা সরে না যায়। ১০) সব সময় কাপড় বড় কাঁচিতে কাটতে হবে।

পেপার প্যাটার্ন আমাদের প্রকৃত বন্ধু কেন

১) নতুন শিক্ষার্থীদের কাছে কাটিং টেলারিং শিক্ষার জন্য পেপার প্যাটার্ন একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষার্থীরা যদি প্রথমেই কাপড়ের উপর ড্রয়িং করে এবং যদি ভুল হয় তা হলে কাপড়টি নষ্ট হয়ে যাবে। সেই কারণে নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য পেপার প্যাটার্নে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক এতে যদি ভুল ও হয় তা পেপারটি নষ্ট হবে কাপড় নষ্ট হবে না ফলে কাগজেই তা সংশোধন করে কাটা যাবে।

২) পিছলানো কাপড় কাটতে গেলে কাপড় কাটা বাঁকা হতে পারে অথবা পিছলে যেতে পারে পিছলানো কাপড়ের উপর পেপার প্যাটার্ন বসিয়ে চারদিকে পিন দিয়ে ভালো করে আটকিয়ে তারপর কাপড় কাটতে হয়।

৩) পেপার প্যাটার্নের সাহায্যে অনেক কাপড় এক সঙ্গে কাটা যায় এবং অল্প সময়ে কোন রেডিমেড পোশাকের দোকানে ৩২, ৩৪, ৩৬ ছাতি মাপের পেপার প্যাটার্ন কেটে রেখে দেওয়া হয় এবং এর সাহায্যে অল্প সময়ে অনেক পোশাককাটা সম্ভব হয়।

৪) অল্প কাপড়ের উপর কাটা যায় পেপার বসিয়ে কোন অংশ কম বা কোন অংশ বেশী কাপড় কাটা যাবে কিনা বা যে অংশ কম পড়বে সেই স্থানে মেকাপ দেওয়া যাবে কিনা ইত্যাদি বোঝা যায় সেই কারণে পেপার প্যাটার্ন আমাদের প্রকৃত বন্ধু।

কত রকমের পেপার প্যাটার্ন করা যায় ঃ

১) নিউজ পেপার, ২) ব্রাউন পেপার, ৩) গ্রাফ পেপার, ৪) কার্ড পেপার, ৫) বাটার বা টিসু পেপার, ৬) টিন সিট পেপার।

প্যাটার্ন কত প্রকারের ঃ

১) টেস্টেড প্যাটার্ন, ২) ব্লক প্যাটার্ন, ৩) ইনডিভিডুয়াল প্যাটার্ন, ৪) গ্রেডেড প্যাটার্ন

মেজারিং টেপ ঃ

পরিভাষা ঃ যে জিনিষ মাপার জন্য কাজে আসে তাকে মেজার বলে। একটা ফিতের লম্বা ৬ ইঞ্চি বা ১৫৩ সেন্টিমিটার থাকে। মাপার ফিতা সাধারণত তিন প্রকারের হয়। ১) ইঞ্চি টেপ, ২) ট্রাউজার টেপ, ৩) সিজিপি টেপ।

১) ইঞ্চি টেপ ঃ এটা লোহা, প্লাসটিক ও ক্যানভাস দিয়ে তৈরী হয়। অবশ্য আগে পিতলের দ্বারাও তৈরী হত বর্তমানে এই ইঞ্চি টেপের এক দিকে তিন ইঞ্চি এবং অপর দিকে হাফ ইঞ্চি পাত থাকে। বাকি অংশটি ক্যানভাস দিয়ে তৈরী হয়। এই টেপ ৬০ ইঞ্চি ৫ ফিট ১৫৩ সেন্টিমিটার লম্বা থাকে। এই টেপের দুদিক দুই রঙের হয়। এই টেপ মাপ নিতে বা ড্রয়িং করতে কাজে আসে।

২) ট্রাউজার টেপ ঃ এই টেপ ফুল প্যান্টের সিদিরির মাপ নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা অর্ধচন্দ্রাকৃতির মত দেখতে হয়। এটা ৪৫ ফুটের বেশি লম্বা হয় না। টেলার্সদের জন্য ৫ ফিট টেপ ব্যবহার করা হয়। কারণ আমাদের শরীরের লম্বা সাড়ে ৫ ফুটের বেশিলম্বা হয় না। ১ ইঞ্চি ৮ সুতো, ১ সেমি ১০ মিমি, ১০০ সেমি ১ মি, ১ মি ৩৯ ইঞ্চি, ৩৪ ইঞ্চি হয়।

৩) সিপিজি টেপ ঃ সিপিজি কথাটির অর্থ হল সি কাটার পি প্র্যাকটিক্যাল জি গাইডের আরেক নাম ডাইরেক্ট মেজারিং টেপ। ডাইরেক্ট মেজারিং সিস্টেমে যারা কাটে তারা এই টেপ ব্যবহার করে। প্লাস্টিকের তিন কোন পাতের উপর তিন দিকে ২৪ ইঞ্চি করে তিনটে ফিতে থাকে এর দ্বারা ৪টি মাপ নেওয়া হয়।

১) ডেন্থ অফ সাই ২) এক্সেল চেস্ট ৩) ফ্রন্ট সোল্ডার ৪) ওভার সোল্ডার এই টেপের দ্বারা শুধু উপরের পোশাকের মাপই নেওয়া হয়।

মেথড মেজারিং ঃ প্রথমে যার মাপ নিতে হবে তার ডান দিকে দাঁড়িয়ে যথাযথ ভাবে মাপ নেওয়ার সময় গ্রাহকের শরীরের কোন অঙ্গো অস্বাভাবিক আছে কিনা তা দেখতে হবে, কোট পরে আছে কিনা তা দেখতে হবে। মাপ খুব ঢিলা বা খুব টাইট নেওয়া উচিত নয়। মাপ সিরিয়াল নিতে হবে। যেমন - চেস্ট, ওয়েস্ট, বটম ইত্যাদি অথবা লম্বালম্বিভাবে মাপ নিতে হবে ঝুল, হাতা, সাইড, লেন্থ ইত্যাদি।

লেন্থ ঃ লম্বা মাপ নেওয়ার সময় গলা থেকে লম্বা মাপ নিতে হবে অর্থাৎ যেটাকে আমরা ঝুল বলি।

ছাতি ঃ ছাতির মাপ নেওয়ার সময় ডান দিকে ফিতার হাপ ইঞ্চি পিতলের দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ছাতির বগলের নিচ দিয়ে সামনে ফিতে এনে চার আঙুল ভিতর দিয়ে রেখে মাপ নিতে হবে। মাপ নেওয়ার সময় হাতে বেশি টাইট না হয় তার দিকে লক্ষ রাখতে হবে। এছাড়া ফিতাতে যেন কোন প্যাঁচ না লাগে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সোল্ডার ঃ ঘাড়ের মাঝখানের মেরুদণ্ড থেকে কাঁধের শেষ পর্যন্ত মাপতে হয় আবার পুরো কাঁধের মাপ নিয়ে হাফ করে দিলেও সোল্ডারের মাপ পাওয়া যায়।

নেচালের ওয়েস্ট ঃ গলার পাশে কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত যে মাপ নেওয়া হয় তাকে নেচারেল ওয়েস্ট বলে।

নেক ঃ কোনটির ভেতর হাতের তর্জনি আঙুল রেখে ফিতার হাফ ইঞ্চি পিতলের দিকে হাত দিয়ে চেপে ধরে ডান হাত ফিতায় ধরে পায়ের শেষ ভাগ পর্যন্ত পাশের ঝুলের মাপ নেওয়া হয়।

ইনসাইড লেগ লেন্থ ঃ কুঁচকির উপরিভাগের ও পিছনের দিক দিয়ে চেপে ধরে পায়ের শেষ ভাগ পর্যন্ত মাপ নেওয়া হয়।

রাউন্ড নি ঃ নি কথাটির অর্থ হল হাটু। নি রাউন্ড কথাটির অর্থ হল হাটুর ঘেরা হাফ ইঞ্চি পিতলের দিক দিয়ে হাটুর ঘেরের মাপ নিতে হয়।

হিপ ও সিট ঃ এই অংশের মাপ নেওয়ার সময় হাফ ইঞ্চি পিতলের দিক দিয়ে গ্রাহকের বাম দিক দিয়ে কোমর থেকে প্রায় ৪ ইঞ্চি নিচে পিছনে ঘুরিয়ে মাপ নিতে হয় যাতে বেশি টাইট না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার।

প্রেসিং টুলস এবং ইকুইপমেন্ট ঃ

টুলস ঃ যে বস্তুর দ্বারা কাজ করা হয় তাকে টুলস্ বলে। যে টুলস্ প্রেস করার কাজে আসে তাকে প্রেসিং টুলস্ বলে। সব প্রকারের আয়রনকেই প্রেসিং টুলস্ বলে। যেমন - সলিড আয়রন, চারকোল আয়রন, স্টিম আয়রন ও ইলেকট্রিক আয়রন ইত্যাদি।

পকেট কত প্রকারের ও কি কি?

ইকুইপমেন্ট ঃ যে বস্তুর সাহায্যে কাজ করা হয় তাকে সহায়ক যন্ত্র বা ইকুইপমেন্ট বলে। প্রেস করার সময় যে জিনিস প্রেস ছাড়া প্রয়োগ করা হয় বা ব্যবহার করা হয় তাকে প্রেসিং ইকুইপমেন্ট বলে। যেমন - প্রেসিং টেবিল, ওয়াটার কাপ, স্পঞ্জ ড্যাম্প ক্লথ, স্লিপ বোর্ড ইত্যাদি।

পকেট প্রধানত তিন প্রকার 1) Slash Pocket 2) Patch Pocket 3) Seat in sean pocket

Slash Pocket কাপড় কেটে আলাদা কাপড় বসিয়ে যে পকেট করা হয় তাকে স্ল্যাস পকেট বলে।

Patch pocket একে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায় যেমন লাইন প্যাচ পকেট, অ্যান লাইন প্যাচ পকেট। এছাড়াও অনেক পকেট আছে। Seat in sean pocket : Seat এর উপর যে পকেট থাকে তাকে Seat কাপড় বলে।

এর উপর যে পকেট থাকে তাকে Seat in sean pocket বলে। এই পকেট প্যান্টে থাকে।

প্যাচ পকেট ঃ শার্ট বুশ শার্ট এর উপরে যে পকেট করা হয় তাকে প্যাচ পকেট বলে।

লাইন প্যাচ পকেট ঃ আসল কাপড়ের উপর যে পকেট থাকে তাকে লাইন প্যাচ পকেট বলে। যেমন শার্ট বুশ শার্টে থাকে।

অ্যান লাইন প্যাচ পকেট ঃ আসল কাপড়ের নিচে যে কাপড়ের পকেট থাকে তাকে অ্যান লাই প্যাচ পকেট বলে। এটা কোটে থাকে। সিঙ্গেল বোন যে পকেরে উপর থেকে মুখোমুখি দুটি পাইপিন দেখা যায় তাকে ডবল বোন পকেট বলে। এটা প্যান্টে দেখা যায়।

ক্রস পকেট ঃ শার্টের উপর যে পকেট ক্রস করে লাগানো হয় তাকে ক্রস পকেট বলে।

ডার্ট পকেট ঃ পকেটের ডার্ট সেলাই দিয়ে আলাদা ভাবে লাগানোকে ডার্ট পকেট বলে। সৌন্দয্য বৃদ্ধি করার জন্য এই পকেট ব্যবহার করা হয়। এই পকেট শার্টে থাকে।

মেসিন অ্যাটাচমেন্ট ঃ মেসিন অ্যাটাচমেন্টগুলি হল - টাক মেকার, বাইন্ডার, কুইল্টার, রাফ্লার বাটন হোল, মেকার বাটন ফিটিংস অ্যাটাচমেন্ট এমব্রয়ডারি প্লেট।

হেমার ঃ একে হেম করার যন্ত্র বলে, শার্ট, পাঞ্জাবী ছাড়াও অন্যান্য পোশাকের হেম করবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এতে ব্রড হেম নেরো হেম করা যায়।

রাফ্লার ঃ একে কুচি করার যন্ত্র বলে। এতে খুব সহজে সমানভাবে এবং তাড়াতাড়ি কুচি করা যায়।

টাক মেকার ঃ এ টাক তৈরী করার কাজে আসে এ সমান দূরত্ব ও চওড়ায় সমান ভাবে টাক দেওয়ার সাহায্য করে কে টাকার বা টাক মেটার বলে। এতে একটি পাত্তি লাগানো থাকে যার উপর রং করা থাকে বা নিশানা করা থাকে। টাক যতটা মোটা রাখা হবে ততটা পাত্তি ফিট করতে হবে। এতে কাপড়ের এক সমান টাক দেওয়া যায়।

বাইন্ডার ঃ কাপড়ের কিনারাকে বান্ডিল করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়।

কুইল্টার ঃ কোটের বক্রমে এই সেলাই দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যায়। এটা প্যাড সিস্টেমে ব্যবহার করা যায়। ইটা দ্বারা সেলাই করলে ছোট বড় হয় না সেলাই একই থাকে। বাটন ফিটিংস অ্যাটাচমেন্ট ঃ এটা বোতাম লাগানোর যন্ত্র যার সাহায্যে অতি দ্রুত বোতাম লাগানো যায়।

পিনকার ঃ এটা পিংকিং করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাটন হোল মেকার ভিন্ন ভিন্ন সাইজের ঘর তৈরী করতে এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটা মেসিনের ফিড ডগের দাঁত ঢাকার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা দাঁতে লাগালে দাঁত কাজ করতে পারে না এবং খুব তাড়াতাড়ি এমব্রয়ডারি করা যায়।

ভারতবর্ষে মেয়েদের বিভিন্ন ধরণের পোশাক ঃ

ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরণের পোশাক পরিধান করতে দেখা যায়। এক এক রাজ্যে এক এক ধরণের পোশাক পরিধান করতে দেখা যায়।

বাঙালী ঃ বাঙালী মেয়েদের পোশাক অন্যান্য মেয়েদের থেকে আলাদা। ছোট ছোট বাঙালী মেয়েরা বিভিন্ন ধরণের ফ্রক, স্কাট, ব্লাউজ, শাড়ি, সায়া পরিধান করে।

পাঞ্জাবী ঃ পাঞ্জাবী মেয়েরা সবাই সালোয়ার কামিজ ওড়না পরিধান করে।

মুসলিম ঃ মুসলিম মেয়েরা বোরখা সালোয়ার কামিজ ওড়না পরিধান করে।

মারাঠি ঃ ছোট ছোট মেয়েরা ফ্রক পরে, বড় ও বিবাহিত মেয়েরা পুরুষের মত কাছা দিয়ে শাড়ি পরে।

মণিপুরি ঃ মণিপুরি মেয়েরা ঘাগরা, ব্লাউজ ও ওড়না পরিধান করে।

গুজরাঠি ঃ ছোট মেয়েরা ফ্রক আর বড় মেয়েরা জামা এবং কাঁধ আঁচল দিয়ে শাড়ী ও ঘাগরা পরে।

কাশ্মীরি ঃ কাশ্মীরি মেয়েরা সাধারণত চুড়িদার, সালোয়ার কামিজ ও ওড়া পরিধান করে।

অন্ধ্রপ্রদেশ ঃ এই রাজ্যের মেয়েরা কাছা দিয়ে শাড়ি পরে।

De-form figers : কুরূপ গঠনকৃতি ঃ যে শরীরের ক্ষুদ থাকে এই ফিগার নর্মালও নয় আবার অ্যাব নর্মালের মত নয়। অ্যাব নর্মাল ঃ এদের শরীরের কিছু বিশেষ প্রকারের দোষ আছে যা জন্ম থেকে আবার নৈশারিক কারণে হয়।

De-form figers চার প্রকারের হয়, যেমন 1) Bow legs 2) Knock knee 3) Hump Back 4) Pesion chest.

বো লেগ ঃ এদের উপরের বডির কোন দোষ থাকে না শুধু পায়ের দিকে দোষ থাকে। এদের সাইড লেগ লেন্থের মাপ কম হয়। হাঁটুর কাছে একটি ফাঁক থাকে।

নক নি ঃ নর্মাল অপেক্ষা ইন সাইড লেগ লেন্থ এর মাপ বড় হবে। হাটার সময় হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকে যায়। কিন্তু পায়ের দিকে অনেক ফাঁক থাকে।

হাম ঃ এদের পিঠে কুঁজ হয়, বুক বডির একটু ভিতরের বা দিকে ঢোকা হয় কখনো কখনো এই কুঁজ পাশের দিকে হয়, তবে নর্মাল কোমরের মাপ বড় হয় এবং Across Back বড় হবে। Front এর Shoulder কম হবে এবং উচ্চতা কম হবে।

পেসিওন চেস্ট ঃ এই ফিগারের ব্যক্তির ছাতি বাহিরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসে, এই জন্য এর মাপ অনেকটা পায়রার বুকের মতো হয়। এদের ফ্রন্ট এর লম্বা বড় এবং পিছনের দৈর্ঘ্য কম হয়। Across chest বড় হয় Across Back ছোট হবে। এই ফিগার জন্ম থেকেই হয়।

Elgth Head theory :মানুষ যখন সভ্যতার আলোয় উত্তীর্ণ হল তখন পোশাক তৈরী করতে কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হত না। বৈজ্ঞানিক প্রথায় পোশাক তৈরীর উপায় প্রথম আবিস্কার করেন মিস্টার বেম্পন। তিনি ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বরস্ক একটি মানব দেহকে আটটি অংশে বিভক্ত করে। প্রত্যেক অংশ কেস মূল থেকে চিবুক পর্যন্ত সমান ভাগে ভাগ করে ছিলেন। এই চার্ট বেম্পন করেছিলেন বলে তাকে ফাদার অফ সাইন্টিক ফাদার বলে।

Elgth Head theory : এর ভাগ : টপ টু চেন, টেন টু চেস্ট, চেস্ট টু ওয়েস্ট, ওয়েস্ট টু সিট, সিট টু সিট, সিট টু নি, বি নি টু কাফ, কাফ টু টো।

জয়েন্টসের প্রকারভেদ ঃ জয়েন্টস সাধারণত তিন প্রকারের হয় - 1) Hinge joints 2) Ball and sockets joints 3) Guiding joints.

Hinge joints : এই জয়েন্টস্ সাধারণত হাতে কনুই ও পায়ের হাটুতে দেখা যায় এই ক্ষেত্রে হাত ও হাটু অর্ধ পরিধিতে ঘোরানো যায়।

Ball and sockets joints : পুরো ঘোরানো যায় শরীরের যে অংশ তাকে বলে বল এন্ড সকেট জয়েন্টস। যেমন - আরস থোল ও কব্জি।

পাঞ্জাবীর মাপ বার করার নিয়ম ঃ

ছাতি থেকে ২ ইঞ্চি বড় বা ছাতির ঝুল থেকে ছাতি হতে ২ ইঞ্চি কম পুট হতে হবে। ছাতির এক এর চার ইঞ্চি পুট হবে এবং এক পূর্ণ এক এর চার ইঞ্চি ছাতি +৫ ইঞ্চি বা ৬ ইঞ্চি গলা লম্বা হবে। তবে ১৮ থেকে ২৬ ইঞ্চি ছাতির পর্যন্ত যোগ হবে- এক এর চার ইঞ্চি ছাতি + ৬ ইঞ্চি। গলার অর্ধেক মহরি হবে। হাত ২৫ ইঞ্চি বেশী লম্বা হয় না। সাড়ে নয় ইঞ্চি বেশী পুট হয় না। ১৫ ইঞ্চি বেশী গলা হয় না। ১৮ ইঞ্চি থেকে ২২ ইঞ্চি ছাতি পর্যন্ত ছাতিতে ৬ ইঞ্চি যোগ করতে হবে।

কামিজের মাপ বার করার নিয়ম ঃ

ছাতি থেকে ৪ ইঞ্চি বা ৬ ইঞ্চি বড় ঝুল হবে। ছাতির অর্ধেক পুট হবে। পুটের মাপ বাদ দিলেই হাফ হাতার মাপ বাদ দিলেই হাফ হাতার মাপ বাহির হবে। ছাতির অর্থেক +২ ইঞ্চি বা পুরো পুট সে স্তর পুট মাপ ছাতির এক চার ইঞ্চি থেকে ১ ইঞ্চি পুট। ছাতি থেকে ২ ইঞ্চি কম ফুল হাতা। হাতার ঝুলকে চার ভাগে ভাগ করে এক ভাগ বাদ দিলে যা থাকে সেটাই কোয়াটার হাতা।

আয়রন কত প্রকার ও কি কি ঃ

ইলেকট্রিক আয়রণ, চারকোল আয়রণ, সলিড আয়রণ, অটোমেটিক আয়রণ, টেলারিং আয়রণ। টেলারিং এর কাছে ইস্ত্রি বিশেষ প্রয়োজনী বস্তু। এমন কিছু কাপড় আছে যেমন - সিল্ক, গরম কাপড় ইত্যাদি। যাহা কাটার পর ইস্ত্রি করে নিতে হয়। টেলার গণ মোটামুটি ভাবে প্রায় সকল প্রকার পোশাক কাজের শুরুতে ও শেষে ইস্ত্রি করে দেন। সুতি কাপড় বা খাদি কাপড় কাটার আগে জলে ভিজিয়ে সিল্ক করে নিতে হবে। তা না হলে পোশাক তৈরীর পর ধুলে ছোট হয়ে যায়। কাপড় সিঙ্ক করার পর কাপড়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান ভাবে টান করার জন্য ইস্ত্রি করতে হয়। কাপড় কোচকানোর সাথে অঙ্কন করে কাটা ও সেলাই ঠিকমতো করা যায় না। পোশাক তৈরি হয়ে যাবার পর ইস্ত্রি করতে হয়। ইস্ত্রির সাজ সরঞ্জাম নিম্নলিখিত উপকরণগুলি ইস্ত্রি করার প্রয়োজন। ১) ইলেকট্রিক বা যে কোন ইস্ত্রি। ২) কয়লা বা কাঠ কয়লা ৩) ভিজা কাপড় বা জলের পাত্র ৪) ইস্ত্রির কাপড় ৫) বোর্ড, ৬) এক টুকরো স্পঞ্জ ৭) রবার সিট ৮) প্রেসিং টেবিল ৯) প্রেসিং স্ট্যান্ড

প্রেস বা ইস্ত্রি করার পদ্ধতি

সাধারণত দুই পদ্ধতিতে ইস্ত্রি করা হয়। যেমন - শুকনো ও ভিজা ইস্ত্রি।

শুকনো ইস্ত্রি ঃ সুতো বা সিল্কের হালকা কাপড় উল্টো দিকে পেতে শুকনো ইস্ত্রি করতে হবে। কাপড়ের সোজা দিক ভিজা কাপড় করে নিংড়ে তার পর করতে হবে।

অঙ্গুলি ত্রাণ কি?

এটা টেলারের কাছে খুবই প্রয়োজনীয় বস্তু। এটা না থাকলে কোন টেলারের পক্ষে সূচ চালানো সম্ভব নয়। কারণ শক্ত বা মোটা সূচ চালানো যায় না। সূচের গোড়ার দিক হাতে ঢুকে যেতে পারে। সুতরাং কোন দুর্ঘটনা থেকে অঙ্গুলি ত্রাণের সাহায্যে রক্ষা পাওয়া যায়। এটা চার প্রকারের হয়। যেমন - ১) সেলুলয়েড ২) অ্যালুমিনিয়াম ৩) পিতল ৪) তামাঙ

রিমোভিং এবং পেস্ট ঃ তেল, ঘি মাখন ইত্যাদি জিনিসের দাগ তুলতে হলে প্রথমে ফ্রেঞ্চ চক পাউডার দিয়ে ছড়িতে দিতে হবে তারপর ব্রাশ দিয়ে ঘষলে দাগ উঠে যাবে, তারপর গরম জলে ভিজিয়ে সাবান দিয়ে ঘষলে দাগ একেবারে পরিস্কার হয়ে যাবে। এছাড়া দাগের উপর ব্লটিং পেপার চাপা দিয়ে ইস্ত্রি করলে দাগ উঠে যায়।

মরিচার দাগ ঃ কোন পোশাকে লোহার মরচে পড়া দাগ ধরলে দাগের উপর গরম জল ঢালতে হবে।

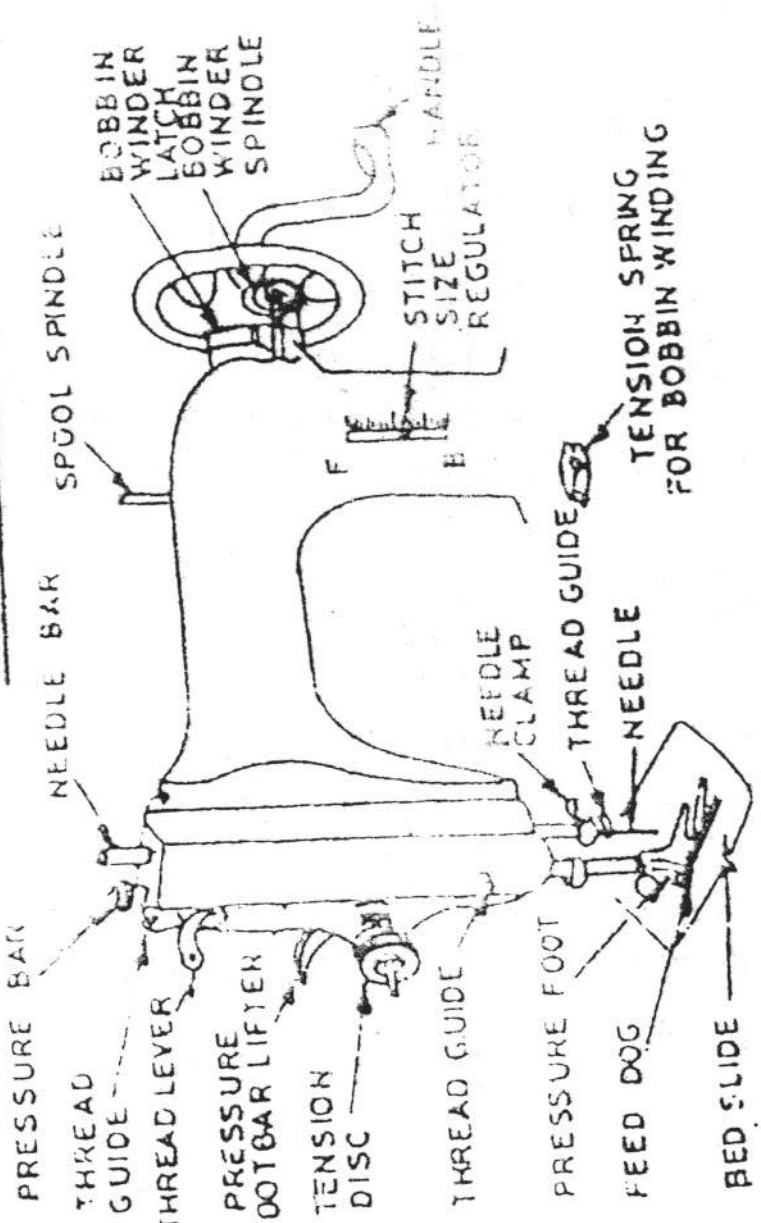
THE SEWING MACHINE
NEEDLE BAR
SPOOL SPINDLE
BOBBIN WINDER LATCH
BOBBIN WINDER SPINDLE
STITCH SIZE REGULATOR
TENSION SPRING FOR BOBBIN WINDING
THREAD GUIDE
NEEDLE CLAMP
NEEDLE
PRESSURE BAR
THREAD GUIDE
THREAD LEVER
PRESSURE FOOTBAR LIFTER
TENSION DISC
THREAD GUIDE
PRESSURE FOOT
FEED DOG
BED SLIDE

SEAMS

PLAIN SEAMS

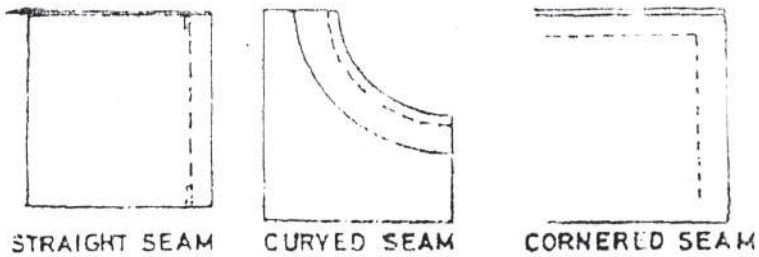

BLUNTING THE CORNER

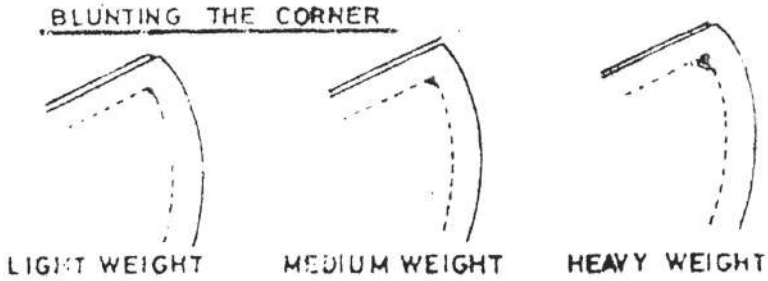

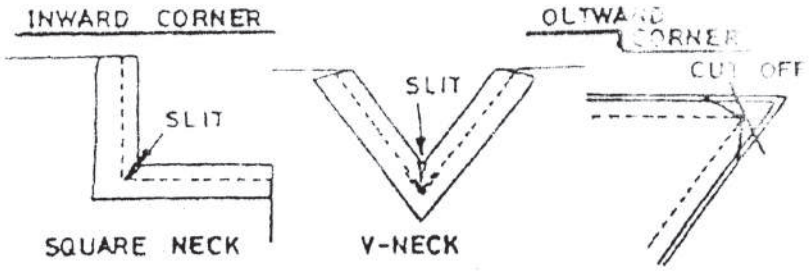

PLAIN SEAM FINISHES

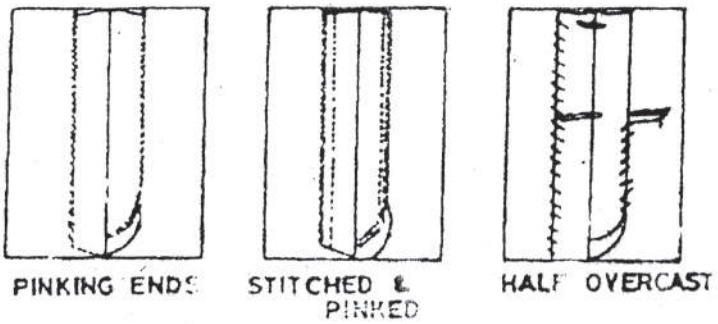

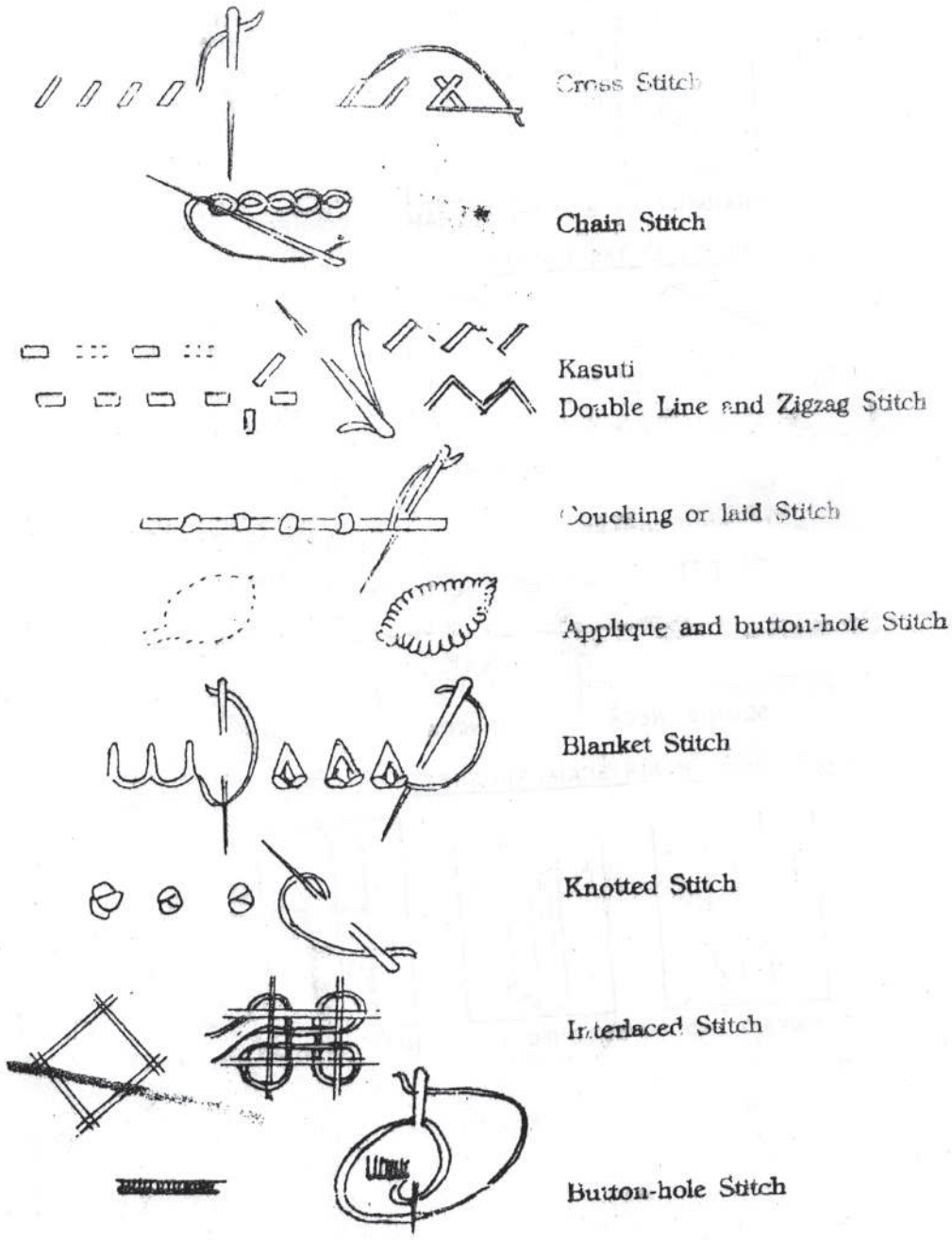
Cross Stitch
Chain Stitch
Kasuti
Double Line and Zigzag Stitch
Couching or laid Stitch
Applique and button-hole Stitch
Blanket Stitch
Knotted Stitch
Interlaced Stitch
Button-hole Stitch

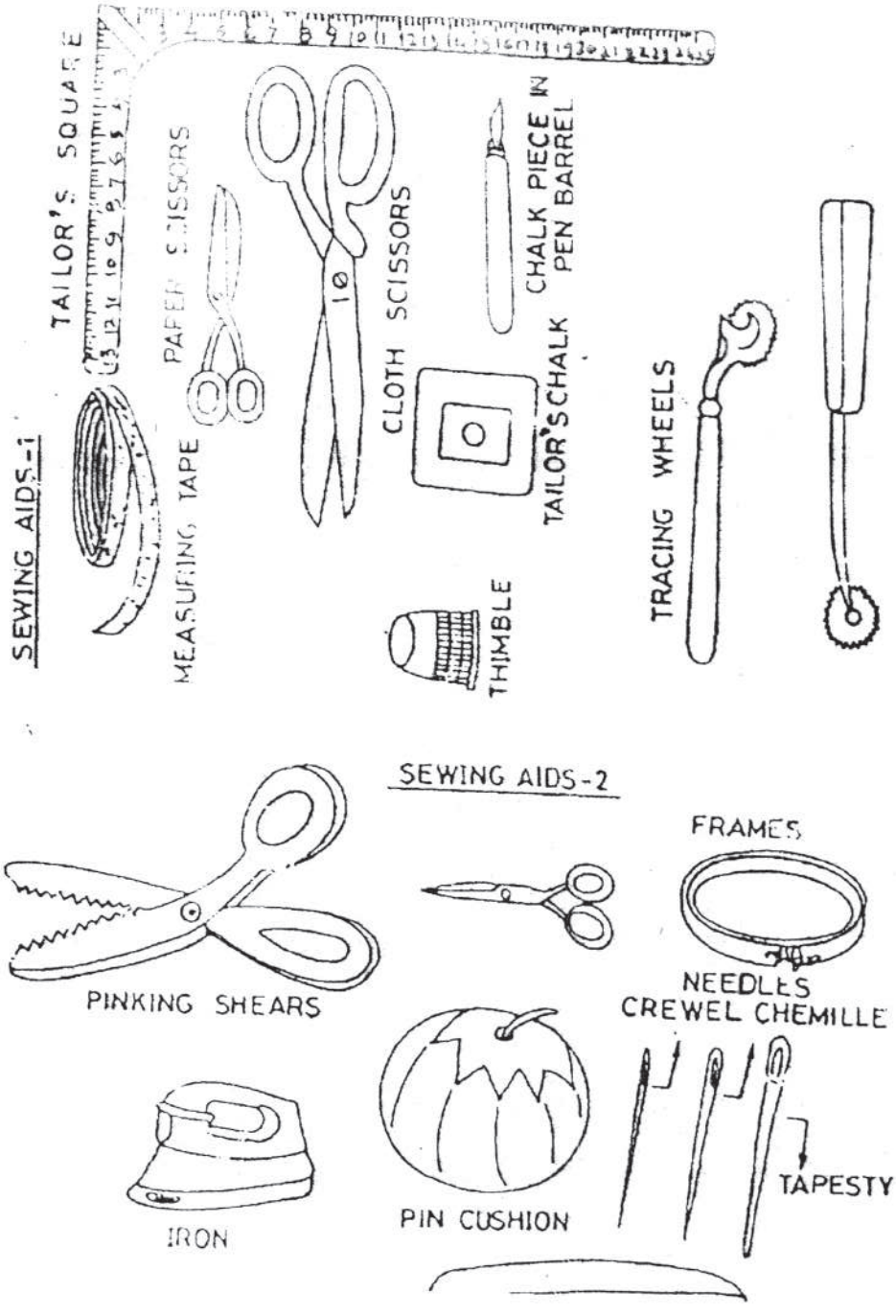
SEWING AIDS-1
TAILOR'S SQUARE
PAPER SCISSORS
MEASURING TAPE
CLOTH SCISSORS
CHALK PIECE IN PEN BARREL
TAILOR'S CHALK
THIMBLE
TRACING WHEELS
SEWING AIDS-2
PINKING SHEARS
FRAMES
NEEDLES
CREWEL CHEMILLE
TAPESTY
PIN CUSHION
IRON

STITCHES

Running Stitch

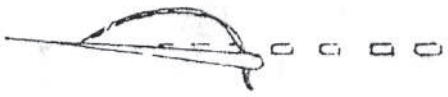

Back Stitch

Stem Stitch

Satin Stitch

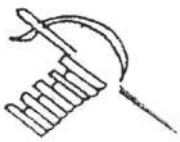

Long & Short Satin Stitch

Quilting Stitch

Kathiawad Stitch, Phulkari Stitch

Herring-bone Stitch